এখানে তুমি সংখ্যালঘু

প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১৮

প্রকাশক : গুরুচন্ডালির পক্ষে প্রতিভা সরকার।
৯/২ বলরাম বোস ঘাট রোড, কলকাতা ২৫।

মুদ্রণ : বর্ণনা ১৪/১০ এ বিজয়গড়, কলকাতা ৭০০০৩২।

প্রচ্ছদ : সায়ন কর ভৌমিক।
ভিতরের ছবি : ব্রতীন সরকার, ঋতুপর্ণ বসু।

সম্পাদনা ও অন্যান্য : অভিজিৎ মজুমদার, ঋতেন মিত্র, দময়ন্তী, বিপ্লব রহমান, প্রতিভা সরকার, মধুবন্তী ভুঁই, অরুণিমা সোম, সোমনাথ রায়, জারিফা জাহান, শৌভিক খান, দেবোত্তম চক্রবর্তী, অমলেন্দু সাহু, জয়ন্তী অধিকারী, ঈপ্সিতা পালভৌমিক পিনাকী মিত্র, সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়।

অক্ষরবিন্যাস : অগ্নীশ্বর চক্রবর্তী।

দাম : ১১০ টাকা।

সংখ্যালঘুর নিজস্ব বয়ানের খোঁজে, এই সংখ্যায় আমরা ঘুরে বেড়িয়েছি বাংলাদেশ থেকে বালুচ। আসাম থেকে মুর্শিদাবাদ। দেখেছি মানুষের চেহারা, যাপনভঙ্গী। সেই অভিযাত্রার ধারাবিবরণীর কিয়দংশ প্রকাশিত হল এই সংখ্যায়, যার বহুলাংশই সংখ্যালঘু মানুষের নিজস্ব কণ্ঠস্বর, নিজের বয়ান।

অবশ্যই সংখ্যালঘুত্বের সমস্ত মাত্রা এই সংখ্যায় ছুঁয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। কিছু কেন্দ্রচ্যুতি সহ ধর্মীয় পরিচিতিকে ঘিরেই এর কক্ষপথ। সঙ্গে ছুঁয়ে যাওয়া হয়েছে যৌন সংখ্যালঘুত্বের কিছু অভিজ্ঞানকে, ধর্মীয় পরিচিতির সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে যা তৈরি করেছে জটিল এবং অদ্ভুত এক বাস্তবতা। এই বহুস্তরীয় বয়ান, সত্যিই আমাদের দেখায়, সংখ্যালঘুত্ব কেবলমাত্র ধর্মীয় নয় একেবারেই। সংখ্যালঘুত্ব বহুবর্ণের, বহুমাত্রার। কেউ যৌন পরিচয়ের কারণে, কেউ ভাষাগত কারণে, কেউ জাতিপরিচয়ে সংখ্যালঘু। স্বাধীনচেতা মেয়েটি হয়তো তার ভাবনায়, ইতিহাস পড়া ছেলেটি হয়তো তার ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার আত্মীয়কুলে সংখ্যালঘু। বস্তুত কাঁটাতার থাক বা না থাক, আমরা সকলেই, বোধহয় কোথাও না কোথাও সংখ্যালঘু। তাই সংখ্যালঘুত্বের প্রতিটি বয়ান, সম্ভবত আমাদেরও।

সূচিপত্র :

এপার নামা

আত্মপরিচয় বৃত্তান্ত	জিনাত রেহেনা ইসলাম	৯
ফলসাকিসিম	জারিফা জাহান	১২
নট ইন আওয়ার নেম	প্রতিভা সরকার	১৪
ঠাঁইনাড়া	ষষ্ঠ পাণ্ডব	১৬
কাফিরনামা...	রাণা আলম	২২
বৃত্তের মধ্যে বৃত্ত	রফিক	২৮
স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক	৩০
মন্দিরে মিলায় ধর্ম	সুমন মান্না	৩৫
ক্রমবর্ধমান বিভাজন ও বর্তমান ভারত	সেখ সাহেবুল হক	৪১

ওপার নামা

জগতের সকল প্রাণী সুখি হোক	কাবেরী গায়েন	৪৯
লজ্জার ২৫ বছর	মহম্মদ সাদেকুজ্জামান শরীফ	৫৪
ঈদের রঙ	রুখসানা কাজল	৫৭
পাহাড়ে বেদনাবিধুর ঈদ	পল্লব চাকমা	৫৯
ভাতের থালা	সমর মাইকেল সরেন	৬০
বাংলাদেশে সমকামিদের আত্মপ্রকাশ: অধিকার বনাম সহিংসতা	সাখাওয়াত হোসেন রাজীব	৬২

সংখ্যালঘু : প্রবন্ধ

রাষ্ট্রই যখন নাগরিকদের বিরোধী	ওয়াক্কাস মীর	৬৯
পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমরা কেমন আছেন?	সৌভিক ঘোষাল	৭১
মালোপাড়ার বাংলাদেশ	ফিরোজ আহমেদ	৭৩
হুমায়ুনপুর	স্বাতী মৈত্র	৭৯
নেলীর তিরিশ বছরে	দেবর্ষি দাস	৮৪

ভারতে আদিবাসী-সম্পর্ক	কুমার রাণা	৮৮
অপরের দর্শন —অন্যজনের নির্মাণ	জয়া মিত্র ও অভিষেক সরকার	৯২

সংখ্যালঘুর গল্প

মিহিকার জন্মদিন	মলয় রায়চৌধুরী	৯৭
বসন্ত উৎসব	শাক্যজিৎ ভট্টাচার্য	১০২
মণীশ রায়ের ভূত জোৎস্নায় ছাদের রেলিংয়ে শুয়ে আকাশের দিকে চেয়ে খুশিতে পা নাচায়...	সুষুপ্ত পাঠক	১০৮
আমি বাংলাদেশে কুলদা রায়। আর ভারতে কলিমুদ্দিন শেখ।	কুলদা রায়	১১২

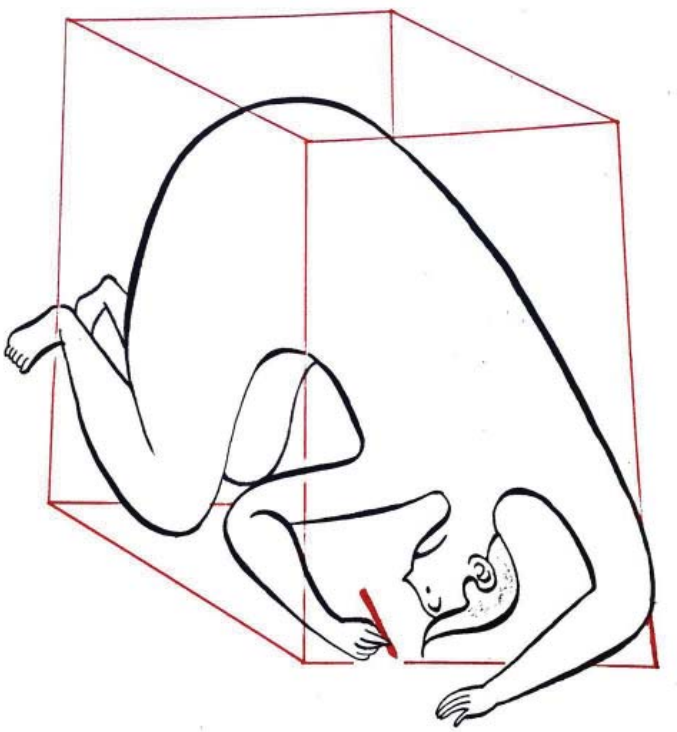

এপার নামা

কাঁটাতার দুদিক থেকেই দেখতে একই রকম। কিন্তু তারও এপার ওপার হয়। এই জ্যান্ত ধারাবিবরণীগুলি কাঁটাতারের এপারের। ভূখন্ড একটাই বলে তাদের কেউ কেউ ওপারেও কিছুটা চলে গেছে, সীমান্তরক্ষীদের নজর এড়িয়ে।

আত্মপরিচয় বৃত্তান্ত

জিনাত রেহেনা ইসলাম

মানুষ অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুর হাত না ধরলে নাকি যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায় না। কেননা মৃত্যুই মানুষের সবরকম অনুভবের অন্তিম সীমানা। আবার ঝলসানোর পীড়ন সয়ে নিতে পারলেও ক্ষতের দাগ মেটে না আজীবন। বিকৃতির অবয়ব আর নতুন চামড়ার মুখোশে ঢাকে না বৃত্তান্ত। চেতনার গাঢ়ত্ব বা বোধের ক্ষত এমনই। জন্মদাগের মত পিছু ছাড়ে না। আমরা শিখেছিলাম এভাবেই মৃত্যুর হাত ধরতে। মন মরে গিয়েছিল, তীব্র বেদনার অনুভবও একসময় অসাড় হয়ে এসেছিল কিন্তু আমরা ভুলেছিলাম ক্ষত। আমরা সেই মানুষ যাদের কাটার বাচ্চা, ন্যাড়া, বেইমানের জাত, গরু খাওয়া পার্টি এমন অসংখ্য বিশেষণে ভূষিত করে মানুষ ক্ষান্ত হয়নি। অভিজ্ঞতার ঝাঁপি বিবিধ সম্ভারে ছিল ঠাসা।

১৯৭৭ সাল। এলাকার নাম অবিভক্ত দিনাজপুর। দাদার বন্ধু তপন দাদাকে টিফিনের বিরতিতে নিয়ে গেল তার বাড়ি। সে দাদার যে পরিচয়

দিয়েছিল সেদিন, তা সে নিজে ভুলে গেলেও আমাদের মনে থেকে গিয়েছিল আজীবন। দাদার সেই বন্ধু তার মাকে জানিয়েছিল এই ভাষায়, "মা, একজন মুসলমান ধরে এনেছি। একে ছেড়ো না!" দাদা খুব ভাবলেশহীন হয়ে বাড়ি ফিরে জানিয়েছিল সে ঘটনার কথা। মা খুব শঙ্কিত হয়েছিলেন। একটা অজানা ভয়ে আমি দাদার সেই বন্ধুকে দেখে পর্দার আড়ালে মুখ লুকিয়েছি অনেক বার। বুঝেছিলাম আমাদের মত প্রাণীদের ধরে নিয়ে গেলে তার পরিণাম হয়তো খুব ভয়ানক হয়। জীবনে প্রথম এক বিরল প্রজাতির প্রাণী হিসেবে নিজেদের নিয়ে ভয় পাওয়ার শুরু হয় এমনি করে।

পাশেই পুলিশ কোয়ার্টার্স। সেখানে খেলা যেত কিন্তু জল চাওয়া যেত না কারও বাড়ি থেকে। জানতাম মিলবে না জল। কিন্তু এ নিয়ে কোন খেদ জমে নি মনে। এটা নিয়ম বলেই জানতে শুরু করেছিলাম ও মানতে শিখেছিলাম। মাকে মা বলে ডাকলেও বাবাকে রাস্তাঘাটে আব্বু না বলার নিয়ম মা বানিয়ে দিয়েছিল। মা নিজে অমুসলিমদের কাছের মানুষ প্রমাণের জন্য মাথায় সিঙ্গার কোম্পানির লাল রং সিঁথিতে সিঁদুরের মতো লাগানোর কৌশল রপ্ত করেছিলেন। বাবা কিছুতেই পাঞ্জাবি বা পাজামা পরতেন না। আমরা অমুসলিমদের যাবতীয় ছদ্মবেশ দারুণভাবে রপ্ত করেছিলাম। তবু আমরা কিছুতেই তাদের কাছের হয়ে উঠতে পারিনি।

১৯৮০ সাল। মুর্শিদাবাদের বহরমপুর সদর শহরে বাবার নতুন পোস্টিং। প্রথমদিন চেয়ার পেলেন না জেলার শিক্ষা দপ্তরের সাব-ইন্সপেক্টর। বেঞ্চে বসে দিন পার করলেন। বিশেষ এলাকা ছাড়া বাড়ি ভাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। সারাদিন পরে বিধ্বস্ত হয়ে বাবা বাড়ি ফিরলেন। বাবার এক পরিচিত সহকর্মীর বাড়ি তখন আমাদের আশ্রয়। মায়ের সাথে সাথে আমাদের চোখ দিয়ে ঝরতে থাকে অঝোরে জল। আমরা চারটি প্রাণী একটা বদ্ধ ঘরে কেঁদে চলেছি কেননা আমরা মানুষ নই, মুসলিম। বাবা বলছেন, একটি বিশেষ পাড়ায় ঘর পাওয়া ও একটি বিশেষ স্কুলে আমাকে ভর্তি করানো বাবার পক্ষে অসম্ভব। সব অসম্ভবকে আমরা তখন ললাট লিখন বলে মানতে শিখেছি। এই অসহায়ত্ব জয়ের কোন মন্ত্রই আমাদের জানা ছিল না।

এবার বাড়ি বদল। হিন্দুঘেরা এক মুসলিম বাড়ি যার নাম মিক্সড মহল্লা। আমাদের গায়ে ছোঁয়া লাগলেই কাপড় ছাড়তে হয় এলাকায়। টিভি দেখতে হয় দূরে বসে, ফাটা কাপে চা মেলে। আমাদের অওকাত এটুকুই তা নিয়ে আমাদের আর কোনও সংশয় ছিল না। আমাদের বাকি সবার সাথে বসা খুব বেমানান। স্কুলে অনেকেই আমার টিফিন খেত না, আমার পাত্রেরও একটা আলাদা কোনও শ্রেণিছিল জানতাম। কোনোদিন খেলার ক্লাসে ড্রেস আনতে ভুলে গেলে আমারটা কখনও কেউ নিত না বা আমি কারওটা পেতাম না। পোশাকের একটা শ্রেণিছিল দেখেছিলাম। স্কুলে নিজের জাত লুকাতে কি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি কিন্তু নামের পাশে বসা পদবি বিশ্বাসঘাতকতা চালিয়ে গেছে। নজরুল ইসলাম আসলে আমার কে তা নিয়ে মীমাংসা হয়নি।

কলেজে এসে এক নতুন বিপত্তি। লাকি গার্ল বা প্রেম সবেতেই আবার জাত ব্যাগড়া দিতে থাকে। কিন্তু মন ও শরীরে যে একজন মুসলিম অন্য সবার মত নর্মাল মানুষ হয়

সেটা কাকে বোঝাবো!

আমরা যত বেড়ে উঠি মায়ের সংগ্রাম কিছুটা কমতে থাকে। নিজের বাড়ি হয়ে গেল আমাদের। মা সিঙ্গার পরা ছাড়লেন। বাবার অনেক ব্রাহ্মণ বন্ধুবলয় নির্মাণ হল। আমরা নিজেদের খুঁজে ফিরতে থাকলাম নানাভাবে।

বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের হোস্টেলে আবার সেই ক্ষতে নুনের অভিজ্ঞতা। সরস্বতী ঠাকুর নির্বাচনের তালিকায় আমি বাদ কারণ আমি অবাঙালি। দিনান্তে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফেরার পর কলকাতার পথে পথে পেইং গেস্ট থাকার সন্ধানে ঘুরতে থাকলাম। যেখানেই যাই নাম শুনে বলে সিট নেই। একবুক খাঁ খাঁ দুপুরের অনুভব নিয়ে মহানগরীর রাজপথ থেকে গলি পরিক্রমা চলল টানা তিন মাস। অবশেষে মাথা গোজার ঠাঁই হয় বেলঘরিয়ায়। ব্রোকার মারফত ঘর। কিন্তু মাসের শেষে টাকা দিতে গিয়ে কাগজে সই করে বিভ্রাট। সেই ধরা পড়ে যাওয়া আর কি! নামের শেষে ইসলাম শব্দটা শেষ করতেই টানাপোড়েন শুরু। রেহেনা অবধি সংশয় নেই, হয়তো খ্রিস্টান, সুতরাং চলতে পারে। নিজের নামে কত শত মানুষকে বিড়ম্বনায় ফেলেছি ভাবলে নিজের প্রতিই করুণা হয়।

দাদা বহু নামকরা কোম্পানিতে চাকরি পেতে রিফিউজড হয়েছে। "ইসলাম হো!!" একথা শুনতে হয়েছে প্রত্যাখ্যাত হবার আগে। দাদা বাবাকে মন খারাপ করে ফোন করেছে বহুবার এই ভারবাহী পদবীর জন্য।

যারা বিশ্বাস করেন এগুলি মিথ, তাদের এমন জীবন্ত দলিলের সামনে দাঁড়িয়ে অসহায় বোধ করতে দেখেছি চোখের সামনে। সেটা অস্থিরতা নয়, এড়িয়ে যাওয়া। কিন্তু আমাদের অস্থির হওয়া বারণ, আর এড়িয়ে যাওয়ার ভান করলেও মনের সাথ পাওয়া কঠিন ছিল।

২০০২ সাল। শহর রঘুনাথগঞ্জ। কর্মস্থল আমার। বাড়ি ভাড়া পেলাম না স্কুলের চত্বরে। জঙ্গিপুর কলেজের এক বিশিষ্ট প্রাক্তন অধ্যাপক আমায় তাঁর বাড়িতে ভাড়া না দেবার জন্য বাড়িটা তার নয় বলে আমায় জানালেন। মানুষের বিশ্বাস ও ধর্মবোধ মানুষকে কীভাবে কূপমণ্ডুক করে তার এই চূড়ান্ত উদাহরণ আমার অভিজ্ঞতার ভার বাড়াল নতুন করে।

এখনও পথে চলতে চলতে কানে আসে, জানিস এই ম্যাম মুসলিম! কখনও অভিভাবক, কখনও ছাত্র, কখনও সহকর্মী। কিছুতেই আর ফারাক লাগে না কোনও!

২০১৫ সাল। পেলাম না পছন্দের ফ্ল্যাট বহরমপুর শহরে। চেক দিলাম নিজের নামে। আধঘণ্টায় তা ফিরে এল। আগে দু'বার প্রত্যাখ্যাত। এক জায়গায় বলা হল সেখানে জাগ্রত কালী আছে। আরেক জায়গায় বলা হল যে জমি দান করেছিলেন তাঁর শর্ত মেনেই প্রোমোটাররা ফ্ল্যাট দিতে পারছে না। প্রশ্ন করেছিলাম, কেন মুসলিমদের কি ৪ টে হাত আর ১০টা মাথা আছে? জবাব মেলেনি। উত্তর হয়তো এর চেয়েও মর্মান্তিক যা মুখে আনা যায় না!

২০১৬ সাল। আমার ভাই-এর স্ত্রীর শহরের এক কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের চাকরি হলনা। ইন্টারভিউতে প্রথম হয়েও বাতিল হল সে। প্রচণ্ড সংগ্রাম করে তাকে ফেরানো গেলেও রিনিউয়াল আর হল না। অপরাধ নামের পাশে এক ঘাতক পদবী। এভাবেই দেখেছি জয়েন করতে দেওয়া হয়নি প্রধান শিক্ষক পদে শিক্ষককে। শিক্ষাদপ্তরের অলিতে গলিতে কড়া নেড়ে হতাশ সেই শিক্ষককে বেছে নিতে হয়েছে আলাদা স্কুল। এমন দৃষ্টান্ত নেহাত কম নয়,কিন্তু একে ব্যতিক্রম ভেবে ভুলে যাওয়ার পুরনো অভ্যাস আমাদের রপ্ত।

চাণক্য একসময় বলেছিলেন, মানুষের একটি দোষ বহু গুণকেও গ্রাস করে। আবার অন্য জায়গায় বলেছেন, ধর্মের চেয়ে ব্যবহার বড়। আমাদের জীবনে প্রথমটির ব্যাপক বিস্তার এবং আরোপিত দোষটি আমাদের জন্মসূত্রে অর্জিত। দ্বিতীয়টিকে আমরা বর্ণে বর্ণে মেনেও পরাস্ত। ব্যবহার আমাদের পরিচয়কে আড়াল করতে ব্যর্থ হয়েছে। অবহেলা আর অসহায়ত্বের বর্ষণে আমরা যখন ভিজেছি, তখন ভরসা দিতে এগিয়ে এসেছে কয়েকজন কিন্তু যখন তুলে ধরেছি বঞ্চনার কথা, তখন হাজার হাত উঠেছে তাকে মিথ্যা বা প্ররোচনা বলে দাগিয়ে দিতে।

অনেককে বলতে শুনি আজও যে তাঁর পূর্বপুরুষরা মুসলিমের হাতে ছোঁয়া জল খেত না কিন্তু সে মুসলিমকে বিছানায় বসতে দেয়। একে উত্তরণ নাকি পরিবর্তন কী বলা যায় জানিনা কিন্তু এক নিঃসীম অন্ধকারে নিজেকে হাতড়ে বেড়াই, যখন আমায় বলা হয় অবাঙালি আর আমার আসল দেশ পাকিস্তান।

আমার ইনবক্সে অখ্যাত ও বিখ্যাতদের মেসেজ আসে, এবারের বাংলাদেশ বইমেলায় আপনার সাথে দেখা হবে

তো? এই প্রজন্মের এক নামকরা সাহিত্যিক যিনি একসময় সোশ্যাল নেটওয়ার্কে তাঁর ফ্রেন্ডলিস্টে আমায় নিতে অস্বীকার করেছিলেন, তিনিও বাংলাদেশের কোথায় আমার বাড়ি জিজ্ঞাসা করতে ভোলেন না!

এখন ২০১৭ সাল। জানিনা আমার পরিচয় আর কবে ঠিকঠাক হয়ে উঠবে!

বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, ২০১৭।

ফলসাকিসিম

জারিফা জাহান

গাঢ় কালচেবেগুনি গোল গোল ফল। গাছে দিব্যি ঝুলে আছে থোকায় থোকায়। এদিকে নিচে আমি জুলুজুলু চোখে চকচকে লোভ দিচ্ছি, হাভাতে, হাত পাচ্ছিনা, এমন ধুকপুকে সোহাগী জারুন অথচ এই বুঝি কোন এক অলিখিত গল্পে উপসংহার লেখা হবে চোরা মুসবিদায়, ওমনি টুপটাপ নিটোল কালোঝাঁক মগডাল থেকে ঠ্যাং নামিয়ে উড়ে আসবে খুশিবিস্তারে...'ফলসা' নামের অনুমোদনে। বড় প্রিয় সে নাম। তুরীয় আকর্ষণ। ইদানিং তাকে খুঁজি, মা'কে লুকিয়ে চুরি করা আমূলস্প্রে'র মত স্মৃতিস্বাদে লেগে থাকা সে ঘোরতর প্রাংশুকে। অথচ সে অনামী। প্রচারমাধ্যমে ডানা মেলার আগেই ঝুপ করে জবজবে অন্ধকার নেমে গেছে সে পালকে। তাই ব্রাত্য।

আমিও এমন ফলসা হলাম, একদিন, অজান্তে। তখন ক্লাস সিক্স। প্রথম দিন। নতুন স্কুলে প্রথম পরীক্ষা আর রেজাল্ট এর দীর্ঘ গোপন আঁতাত বইদর্শনের ঘষাকাঁচ সুলভ প্রিঅ্যাম্বেলে নখ রেখেছি সবে। হঠাৎ চারিদিকে বেশ একটা ফিসফাস ব্যাপার। আমিও উৎসুক। কিন্তু যেই কানযুগল, সারি সারি কুচি শব্দের নৈবেদ্য গ্রহণে রাজি, ওমনি সব চুপচাপ। মেঝেতে পিঁপড়ে শুঁড় দোলালেও বুঝি তার শব্দ শোনা যায়। বেশ মাথা চুলকে, পেন্সিল চিবিয়ে ফিসফাস কত্তাদের দিকে করুণ তাকাচ্ছি তো আবার যে কে সেই। অগত্যা এ বালা-মুসিবতের শাপ-শাপান্ত করে মন দিয়ে শেষ পৃষ্ঠায় কাটাকুটিতে রাবীন্দ্রিক ছবি আঁকায় মন দিই।

দিন দুয়েক এমন চলার পর এক বন্ধুর আচমকা ঘোষণা - "টিচার্স রুমে তোকে নিয়ে কথা বলছে। আমরা আসার সময় শুনেছি। এই তোদের হঠাৎ করে এমন পাত্তা দিচ্ছে স্কুলটা। ভালো সাজার জন্য।" আমি থ'। কথার ভূমিকা, সূচনা, প্রসঙ্গ সবই মাথার উপরে রাইট অ্যাঙ্গেলে বেবাক হাঁ, যাকে বলে 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়ম'।

বন্ধুটি আবার বোঝানোর দায়িত্ব নিয়ে বলে, "তোদেরকে প্রচার দেওয়ার জন্যই তো তোকে এবার ফার্স্ট করেছে। নইলে এতদিনে এ স্কুলে তো কেউ হয়নি। আমার মা বলেছে। বাকিরাও বলছে। জিজ্ঞেস করে দ্যাখ।"

এবার আমার মোটামাথায় হাফ ঢোকা 'তোদের' এর সংজ্ঞা জানতে চাওয়ার আগেই সে বন্ধুটি বেশ জোর গলায় বলে, "তোরা যারা সবেতেই পেয়াঁজ-রসুন খাস!"

সেদিন প্রথম বুঝি, পুজো আর ঈদের বাইরে ধর্মের এমন কুলীন-নাকউঁচু-লঘু-গুরুর ষষ্ঠ বিভাজন আছে। সেই প্রথম মনে হয়েছিল ফলসা আর আম এর মত 'আমরা-ওরা'ও কেমন যেন ঘরপালানো ছেলের মনে লুকিয়ে বিকেলের আকাশ দেখে কোন কোন দিন, মাদুর পেতে তাকায় শূন্যে: একটা চিলের গা ছুঁয়ে থাকা গোলাকার পথে বোনা মুক্তিনিশান; তারপর এক পা দু' পা করে সিঁড়ি ভেঙে নেমে আসে চুপচাপ, লক্ষ্মীর ঘট নেড়ে খোঁজে সিকিপয়সা আর হঠাৎ হঠাৎ পালায় মুক্তিখোঁজে।

এরপর স্কুল ছেড়ে কলেজ থেকে চাকরি - মাঝেমধ্যে কেউ কেউ হারিয়ে পাওয়া জিনিসের মত মনে করিয়েছে ফলসাকিসিম হয়তোবা, সতর্কে-অসতর্কে।

"তোমাকে দেখে বাঙালি তো মনে হয়না" (মুখে মাছ-ছাপ যে কেন নেই!) "তুমি মুসলিম তো বাঙালি কী করে?!" (বোঝো, ভাষা-ধর্ম ঘেঁটে এক্কেরে বিজেপির আইটি সেল) "তুমি বিরিয়ানি খাওয়াবে কবে?!"(স্টেপল ফুড বিরিয়ানি নাকি! আগে অমলেটটাই বানাতে পারি কিনা দ্যাখ! ওভার-কনফিডেন্সে দেখছি ৫৬ ইঞ্চি) "এথনিক ডে'তে বোরখা পরবি নাকি?"(আজ্ঞে, জানেনই তো বোরখা ফলসাদের 'জাতীয় পোশাক') এগুলো অবিশ্যি ঝোপ-ঝাড় থেকে আঁশ-ফলের বাজারে খুঁজে দশ টাকা শ' দশার মহার্ঘ্য উত্তরণ। শুনে বুঝে আত্তীকরণ। তবে এসব হাতে গোনা 'বন্ধু' আমায় ফলসা ঠাউরালেও বাকিদের সাথে দিব্যি মিক্সডফ্রুট আড্ডা হয় দেদার।

ছেলেবেলার সে ফলসা গাছের মত এখনও মায়া আঁকড়ে জেগে থাকে কিছু বনেদীবাড়ি। মাথা উচুঁ করা নাজনীন,

মোহময়ী ইতিহাসের পরতে পরতে তার মুহব্বত। যবনিকা পড়ে গিয়েও কোন এক ফাঁকে ধরা দেওয়া ক্ষীণ আয়ু। গাছ নেই, ফুল-পাতা শূন্য তবু শেকড়ের কোনো এক ভাঙা মূলটপের মত লেজুড় সে 'বড়বাড়ি'র ইতিহাস। যে জমিদার জমানায় কেউ বিলেত ফেরত কেউবা ডাক্তার-প্রফেসর, সে জমানা ক্রমে বেগানা হতে হতে ধুলো বালি, বালি ধুলো। জমিটুকু সম্বল করে বংশপরম্পরায় বনেদিয়ানা দেখাতে দেখাতে বিস্মৃত হয়েছে শিক্ষা-সাবেকিয়ানা। মেয়েরা হাঁড়ির তলানিটুকু খেতে খেতে বড় হয়েছে অভ্যেসে, গড়পাঠ শেষে তারপর ঢুকে গেছে বিয়ে প্রতিষ্ঠানে। সাবেক ইতিহাসের গায়ে মরচে আরেকটু ঘন হয়ে গেলে তারা ধীরে ধীরে খোঁজ নিয়েছে 'পেশা'র। এ যেন অশীতিপর বৃদ্ধা, রাস্তাটুকু পার হতে উন্মুখ, অথচ অকৃত্রিম দীর্ঘ সময় ধরে ঘুরপাক খেয়ে চলেছে ফাঁকা পলিথিন, শ্লথ ভঙ্গুর পলে।

যে ফলসা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকতাম ভবিষ্যতের সম্ভাবনাগুলোকে খুশি মাখিয়ে, কেউ বুঝি খুব শক্তিমান, গাছটা ধরে বেশ ঝাঁকাল, কেউ যদি ডালে উঠল...আরও কত কী, সে গাছের আশেপাশে অনেকেই জড়ো হতো ছেলেমেয়ে, নানা সাইজের। তাদের কয়েকজনের মুখ চিনি, কয়েকজনের চিনিনা; শুধু জানি, ওরা সবাই আমার মত ফলসাবাঁধনে সমবেত। যে মাসি মায়ের সাথে কাজে হাত লাগায়, রোজ সকালে তিন বাড়ি বাসনমাজা, ঘর মোছার পর একগা ব্যথা নিয়ে ঘুম ভাঙে যার, সে আর তার চার ছেলেমেয়েও তো ফলসা খেতে উঁকি মারে বনে-বাদাড়ে, যাতায়াতের পথে। হ্যাঁ, এ ঘোর কলিকালেও চার ছেলেমেয়ে। বোধ হয় ভেতর ভেতর একটা ভয় বেঁচে-বর্তে খাটে হেলান দিয়ে শোয় আর বেশ হুকুম করে জানান দেয়, মেয়ে হলে যদি গাছ ঝাঁকাতে না পারে, যদি গাছে উঠতে না পারে আর যদিওবা উঠল গায়ের জোরে, ওমন 'অলক্ষুণে' মেয়ের একমাত্র জীবনের উদ্দেশ্য বিয়ের তোড়জোড়ে জল ঢোকার পাইপের মুখ যে কেটে দেওয়া হবে ন্যুব্জমনে, অতএব যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ, গাছ ধরে টান থুড়ি ছেলে আনান। আমি সে মাসিকে বলে'কয়ে মেজ আর ছোট মেয়ে দুটো'কে নিয়ে এলাম নিজের পড়ার টেবিলে। বেশ কিছুদিন লজেন্স-চকোলেট খাইয়ে যদিওবা বসল,পরীক্ষা যেদিন নেব বললাম তারপর থেকে তাদের সাক্ষাৎ, ঈশ্বরদর্শন সমান। মাসিকে খুঁচিয়ে জানতে পারলাম যে মক্তবে (পাড়া গাঁয়ের ইসলামিক টোল, যেখানে কোরআন এর আগে প্রাথমিক শিক্ষাস্বরূপ আরবী অক্ষর, আমপারা পড়ানো হয়) গেলে মাঝেমাঝে কোনো বাড়িতে খতম (কোরআন পড়ে শেষ করা) পড়াতে ডাকে, তখন লাড্ডু মিষ্টি পাওয়া যায়, কপাল ভালো হলে বিরিয়ানিও জোটে আর এমনি খালা ডাকলে পড়িয়ে উল্টে পরীক্ষা নেয় তো যাব কেন! স্কুলে গেলে মাস্টারও বকে। অতএব ঠেলেঠুলে যা হলো বিদ্যে, তাকে তেলাকচু জঙ্গলের সারগাদায় ফেলে উপসংহারে বিয়ের পিঁড়ি ধরে টানাটানি। আম এর লোভ দেখালাম তবু সাহস করে ফলসা ছেড়ে কিছুতেই এগোলো না মেয়েদু'টো।

তবে বাড়ির উল্টোদিকেই যে কাকুকে ভ্যান চালাতে দেখেছি গত কুড়ি বছর, সে তার মেয়েকে দিব্যি ফলসা, আম সবই ঘুরে দেখিয়েছে। সদ্য অঙ্কে মাস্টার্স শেষ করে চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে সিঁড়ি ভাঙা ধাপে।

ফলসা কুড়োনো শেষ হলে কোঁচড়ে পুরে নিতাম জন্মান্তরখুশি। সে সামলে ক্ষুদি ক্ষুদি পায়ে ফিরতাম বাড়ির পথে, খিজির নির্দেশক। বারান্দায় গোল হয়ে পা'দুটোকে সামনে ছড়িয়ে কোঁচড় থেকে বের হতো, একে একে, বহু মেহনতি রতন। দীর্ঘ বাক্যের মত রচিত, অক্লান্ত, অথচ দাঁড়ি-কমাহীন সে পরিশ্রমের প্রতি পরতে পরতে তারা আমার ইন্দ্রিয়-আবেগের মর্ম স্বরূপিণী। রোদের সুতো তাদের গায়ে লুকোচুরি খেলত, অনিয়মে, বেঁকেচুরে আর চকচকে রেখায় কখনো কখনো ঠিকরে পড়ত রূপের খোলস। তখন অপলক চেয়ে দেখা সে সৌন্দর্যরেখা, মেদবর্জিত রুবারু। তাকে ভয়ে, বুকে শিরশিরানি চেপে চকের শব্দে বন্ধ করতে হয়না চোখ, আচমকা আড়ালে, লুকোতে হয়না মুখ, পর্দার ঠোঙায়। সে দিব্যি রাজি পাড়ি দিতে, নামী-অনামী বিদ্রোহে মাথা কুটে অপারগ। আমার সেসব ফলসাকিসিম তখন স্বপ্নিল.... সংহিতা....মাশরুরা।

বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা, ২০০০-২০০৪

নট ইন আওয়ার নেম

প্রতিভা সরকার

অল্পের জন্য দু'দুবার মব লিঞ্চিং বা গণধোলাইয়ের হাত থেকে বেঁচেছি। মানে দেখার হাত থেকে। একটি গতকাল ট্রেনের কামরায়, আর একটি দূর শৈশবে।

আমার মফস্বলে মদনমোহন বাড়ির সামনে এক উদোম পাগলি আপনমনে থাকতো। নাম মনে আছে পানিয়াল পাগলি। কাউকে দেখলে আধলা ইঁট নিয়ে তেড়ে যেত। সঙ্গে অকথ্য গালাগাল। একবার সেই ইঁট কারো কপাল ফাটালে পানিয়ালকে ঘিরে ধরে শুরু হল কিলচড়লাথি। এত কষ্ট তা দেখা যে ছোট্ট আমি বাবার হাত টেনে টেনে ঝুলছিলাম,

-বাবা, ওদের থামতে বল না।

এগিয়ে যাচ্ছিলাম, ও কাকু, কাকু, ও তো পাগলি, কিছু বোঝে না।

পাগলিদেরও যে রেহাই মেলে না সেটা ভিডিও ভাইরাল না হলে এখনো বিশ্বাস করতাম না হয়তো। যাইহোক জনতা জনার্দনের জঙ্গি মনস্তত্ত্ব তখনও এতো জাস্তব হয়নি, নাকি পাড়ার মুরুব্বিদের হস্তক্ষেপেই, ঠিক মনে নেই, ভিড়টা দ্রুত পাতলা হতে শুরু করল।

বাবা আমায় সরিয়ে নিয়ে যাবার আগে একবার পানিয়ালকে দেখেছিলাম,পা ছড়িয়ে থেবড়ে আছে মাটিতে। পুরো মুখ ফোলা আর লাল। ডান হাতটা মোচড়ানো কিনা কে জানে, তবে খসা আঁচলের ওপর বেজায় বেকায়দায় পড়ে ছিল সেটা।

সদ্য রেহাইটা সব খাঁজখোঁজ নিয়ে টাটকা গেঁথে আছে মনের ভেতর, যেন শূকরীমাংসে ঢোকানো গরম শিকের ছ্যাঁতছোঁত আওয়াজের আক্রোশ।

পরশু থেকে ট্রেনে ছিলাম। আমি আর আমার সঙ্গিনী বছর পনের ষোলোর এক মেয়ে। রাত আটটা নাগাদ একজন উঠলেন অন্ধ্রপ্রদেশের কোন স্টেশন থেকে। অনেক বাক্সপ্যাঁটরা আর অল্পবয়সী চিবুকে লম্বা কালো দাড়ি। ফোনে খুব কথা বলছিলেন, তাই জেনে গেলাম উনি কোন মাদ্রাসাশিক্ষক। ধর্মপ্রাণ। কোন কারণে কাজের জায়গায় অশান্তি হওয়ায় ঘরে ফিরে যাচ্ছেন। বিহারের কাটিহারে।

ওখানকার আটজন সহযাত্রীর বাকিরা পুরুষ। কোন ধর্মের আমি জানি না। শুধু যিনি পরিত্রাতা রূপে আবির্ভূত হবেন তার পাঁচ আঙুলে পাঁচটা আংটি আছে দেখেছিলাম। দুটো ছেলে, ত্রিশের এপারে, নিজেদের মধ্যে হিন্দিতে কথা বলছিল, শুনে মনে হচ্ছিল শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষাফেরত। প্রত্যেককেই তো ঠিকঠাক লেগেছিল, ভদ্র, সাহায্য করায় আগ্রহী।

এইখানে একটু নিজের কথাও বলি। ফেসবুকে আমার জাগতিক কিছু পাবার নেই। যারা মেসেঞ্জারে জিগায় তাদের জানাই বই লিখিনি, কখনও লিখবো কিনা সন্দেহ। সমাজকল্যাণের টুকটাকের সুবাদে আদালতেও ডাক পাই বটে, তবে একেবারেই বলার মতো নয়। ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে শর্তই আছে সেসব কেউ জানবে না। আমার বন্ধুতালিকা থেকে তারা মিটিমিটি হাসি ছুঁড়ছেন হয়ত, তা হাসুন, কিন্তু তারাও জানেন আমি এক্কেবারে নামহীন, মানে যশহীন, রূপহীন, সাদামাটা এক মহিলা,যার লড়াইগুলি একেবারেই নিজস্ব, ফলাও করে বলবার মতো নয় একেবারেই। লক্ষের মধ্যে একজন বললেও বেশি বলা হবে।

একথাগুলো বলা দরকার ছিলো, কারণ তা না হলে এখন যা বলবো তাতে রজ্জুতে সর্পভ্রম হতে পারে।

গোল বাঁধলো যখন এই শিক্ষক এক বিশাল হাতব্যাগ থেকে ততোধিক বিশাল এক এলুমিনিয়াম ফয়েল বার করে খেতে বসলেন।

তার আগে অবশ্য আমাদের অনেক আলাপ হয়ে গেছে। ফোনে নামাজের আজান আসছে, আর এতো ঘুপচিতে উনি নামাজ পড়তে পারছেন না, এই নিয়ে দুঃখ করলে আমি স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গি তে বলেছি, ঠিক আছে, মনে মনে পড়ে ফেলুন না।

মা আর ঠাকুরঘরে যেতে পারেনা বলে দুঃখ করলে আমি তাকেও এইরকমই বলি।

অন্তত সাতবার সহযাত্রীটি আমায় জিগিয়েছেন ট্রেনটা

কত লেট করবে। কারণ হাওড়া থেকে শেয়ালদা গিয়ে তবে ওকে হাটেবাজারে এক্সপ্রেস ধরতে হবে। আমায় গ্রাম্য সরল ভঙ্গি তে বোঝাচ্ছিলেন কেন এসি কামরাই ভালো। গরম নেই, ভিড় না, সিট নিয়ে দখলদারিও না। আরামসে চলে যানা।

আমারও মজা লাগছিল ওর কথা শুনতে। কারণ ধার্মিকে আমার কোন এলার্জি নেই, যতক্ষণ না ধার্মিক হয়ে উঠছে সন্ত্রাসী আর গণহত্যাকারী। অতি ধার্মিক এবং বকধার্মিকের সঙ্গ পরিহার করি বটে তবে সেটা মতের অমিল এবং ঝগড়ার ভয়ে। এই বিশাল দেশের কোণে কোণে ঘুরে দেখেছি ধর্মের অমোচনীয় ছাপ। সত্তর শতাংশ বা তারও বেশি মানুষকে ত্যাজ্য ভাবার দুঃসাহস আমার নেই। ফলে ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার এই বিশ্বাসেই স্থির আছি। আর সমান নিস্পৃহ নজরে দেখি সব জাতের ধার্মিকদের। একজন টিকিওয়ালা, কাষায়বস্ত্র পরিধান করে উঠলেও আমি এইভাবেই তার সঙ্গে গল্প করতাম।

তো গোল বাঁধলো ঐ এলুমিনিয়াম ফয়েলের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই। চারপাশ ভরে গেল গোলাপজলের সুবাসে আর ভাই আমার খেতে শুরু করলেন। এরপর পেটমোটা ব্যাগটি থেকে ঘন জাফরানরঙা ছোট ছোট মাংসের টুকরো ছড়িয়ে দিতেই আবার গন্ধের হুল্লোড়।

অল্পবয়সী ছেলেদুটো নড়েচড়ে বসল, চোখ হয়ে গেল ছুরির মতো ধারালো,

- ক্যায়া খা রহা হ্যায় আপ ?

শিক্ষকটির মুখে ফুটে উঠল একটা বোকা, ভ্যাবলা হাসি। সত্যি তো, আমার টিফিন বক্সে উঁকি মেরে কেউ যদি ধমকায়, কী খাচ্ছেন, আমি কি ভোম্বল হয়ে যাবো না ! আরো দু'জন আতিশয্যে উঠে পড়েছেন। এরা বাঙালী। চোখ হাসিতে ঝিকমিক, রগচটাদের প্রশ্রয় দিয়ে বললেন,

— গোস্ত খাচ্ছে দাদা। কোন সন্দেহ নেই তায়। আরে পাবলিকমে কিঁউ খাতা হ্যায় রে ?

এই ছেলেদুটোর আরো বন্ধুবান্ধব আছে ভেতরে। ওদের মুখের শক্ত রেখা আমাকে মনে করিয়ে দিল পানিয়াল পাগলির কথা। মাংসে লেগে ফিরে আসা দুমদাম প্রহারের আওয়াজ।

কী করছি নিজে বোঝবার আগেই একটুকরো মাংস উঠে এলো আমার কাঁপা হাতে। কোন স্বাদ পাইনি, তবু দাঁতে কেটে কড়া গলায় বললাম,

— চিকেন, অনলি চিকেন।

এবার এগিয়ে এলেন সেই আংটিধারী ব্যবসায়ী,

— আরে কে কী খাবে তোমাদের কৈফিয়ত দিতে হবে! দেখছ তো ভদ্রমহিলা টেস্ট করে বললেন মুরগি। বস সব নিজের জায়গায়।

বিশাল ছ' ফুটের ওপর দেহটা একটা আড়াল হয়ে দাঁড়ালো শিক্ষক আর ছেলেদুটোর মাঝখানে।

সারারাত ঘুম এলো না। নড়াচড়ায় বুঝলাম শিক্ষকও ঘুমোননি। এই গ্রামীণ মানুষটি কাগজ পড়েন কিনা জানি না। নেট ব্যবহার করেন না। জানেনও না বোধহয় যে রাষ্ট্রের নজর এখন তার খাবার প্লেটে। অজান্তেই তিনি এখন গণধোলাইয়ের আদর্শ শিকার। ছেলেগুলো ভোররাতে নেমে গেল উড়িষ্যায়। পরদিন দুপুরে উনি শুকনো মুখে খেলেন কেবল গোলাপ-গন্ধী রাইস। সেই জাফরানি মাংসখন্ডগুলিশুদ্ধ ব্যাগটাকেই বিসর্জন দিয়ে এলেন টয়লেটের সামনের ডাস্টবিনে।

আড়াইঘন্টা লেটে ট্রেন এলো হাওড়াতে। সন্ধে সাড়ে ছটা। দৃশ্যত বিহবল মানুষটাকে বললাম,

— চলুন, শেয়ালদার পাশ দিয়েই যাব আমি।

ভরসা করে এলেন। নামবার সময় হাজার সুক্রিয়া আর হলুদ আলোয় চোখের কোণ যেন চিকচিক।

ওঁর অনুমতি নিইনি বলে ইচ্ছে করেই মাথাকাটা ছবি দিলাম।

এবার একটু হুঁশিয়ারি। ছোট্ট —

নট ইন আওয়ার নেম। নেভার।

ব্যাঙ্গালোর থেকে হাওড়াগামী যশোবন্তপুরম এক্সপ্রেস, ২০১৭।

ঠাঁইনাড়া

ষষ্ঠ পাণ্ডব

মুন্সীডাঙার সর্দারপাড়ার কথা আলীর খুব বেশি কিছু মনে পড়ে না। একটা উঠোনের তিনপাশ জুড়ে থাকা অনেকগুলো ঘর, পূবের মান্নাফ কাকার ঘর থেকে সেলাই মেশিনের ঘড়ঘড় শব্দ, মুরগি নিয়ে পালিয়ে যাওয়া শেয়ালকে গোরস্থান পর্যন্ত তাড়া করা, ভোরবেলা সর্দারপাড়া ছোট মসজিদের বারান্দায় লস্কর মুনশীর বেত উঁচিয়ে 'আলীফ যবর আ, নুন্ যবর না আনা, ক্বাফ-মীম পেশ ক্বুম আনাক্বুম' পড়ানো, পাশের হিন্দুপাড়ার স্কুলে সবাই মিলে চেঁচিয়ে 'বড় গাছ/ ভাল জল/ লাল ফুল/ ছোট পাতা' পড়া ছাড়া আর তেমন কিছু মনে পড়ে না। বাবা যখন মারা যান তখন তার বয়স মাত্র দুই মাস। বাবার কোন ছবি সে কখনো দেখেনি। বছর পাঁচেকের বড় ভাই নবী তাদের থেকে একটু দূরে দূরে থাকতে পছন্দ করতো, তাই আলীর পৃথিবী মূলত তার মা'কে ঘিরে। অভাব বাড়লে একটা সময় নবীকে তাদের বড় খালা (মাসি) কোবেরা বেগমের কাছে বাকসারায় চলে যেতে হয়। তারপর থেকে দুই ভাইয়ে দেখা হতো কালেভদ্রে। বড় খালু (মেসো) শেখ শামসুদ্দীন আহমদও চাইতেন না ঘরের কাজ নষ্ট করে নবী ঘন ঘন মুন্সীডাঙা যাক। খালু আপিসে চাকরী করে, সুতরাং নবীর মতো একটা ছোকরা ঘরে না থাকলে তার ক্ষেত-খামার দেখবে কে!

সকালে ঘুম ভেঙে মা'কে কখনো বিছানায় দেখতে পাওয়া যেতো না, যেমন রাতে শোবার সময়ও তাকে কাছে পাওয়া যেতো না। আসলে মায়ের অত সময় ছিলো না আলীকে কোন আহ্লাদ দেখানোর। ফজরের সময় উঠে সারা বাড়ি র সবার নাশ্তা বানানো, যারা আপিসে যাবে তাদের দুপুরের টিফিন বানিয়ে টিফিন ক্যারিয়ারে ভরে দেয়া, ক্রমাগত স্তূপ হয়ে ওঠা থালাবাসন ধোয়া, কাপড় কাচা, দুপুরের রান্নার জোগাড় করা, লাকড়ী শুকোনো, ঘুঁটের মুঠি দেয়া, কোন কোন দিন ঘর আর উঠোন লেপা, ধান ওঠার সময় কাঠের গুড়িতে আছড়িয়ে ধান মাড়াই, সেদ্ধ করা, শুকানো, ঝাড়া, ঢেঁকিতে ধান ভানা, তুষ-কুড়া আলাদা করা, চাল বাছা, মুনিশদের খাবার দেয়া – সময় কোথায় মায়ের! এতো কিছুর পরেও বুয়া (ঠাকুরমা), ইয়ার নবী কাকা বা হারুন কাকার বউ, মাকসুরন বেটি (পিসি) কথায় কথায় খোঁটা দিত এই বলে যে, মা কোন কাজ করে না, সারা দিন শুধু শুয়ে-বসে কাটায়। অকালে ছেলেকে খাওয়ার জন্য বুয়া মা'কে অভিশাপ দিতো, কখনো কখনো আলীকেও। দুই ছেলে নিয়ে 'ভাতারখাকি মাগী' তার ঘাড়ে চাপায় তার আফসোসের সীমা ছিল না। দুপুরে বা রাতে খাবার সময় বুয়া মা'কে পাতে নুন বা কাঁচালঙ্কা নিতে দিতো না; কারণ এতে বেশি ভাত খাওয়া হবে। রান্নার সময় মা কখনো সুযোগ পেলে কোন শাকের পাতায় নুন মুড়ে খোঁপায় লুকিয়ে রাখতো। কোন কোন দিন বুয়া আবার সেটা ধরে ফেলতে পারলে ব্যাপারটা গালাগালি, অভিশাপের বাইরে খুন্তি বা চ্যালাকাঠের বাড়ি পর্যন্ত যেতো।

কোন কোন দিন গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেলে বোঝা যেতো পাশে শোয়া মা কাঁদছেন। মা কি পুরনো পেটের ব্যথাটার জন্য কাঁদছেন নাকি বুয়ার চামচ-খুন্তি-উকড়িমালা'র পিটুনি খেয়ে কাঁদছেন সেটা বোঝা যেতো না। মা কাঁদলে আলীর মন খারাপ হতো কিন্তু সেই মন খারাপের কথা কাউকে বলা যেতো না। একবার মান্নাফ কাকার মেয়ে মাবুদা আর ফাহমিদার সাথে খেলার সময় মুখ ফসকে বলে ফেলেছিল যে আগের রাতে মা খুব কাঁদছিল। ও বাবা! ঘন্টা যেতে না যেতে দু'বোনের কেউ একজন বুয়াকে সেই কথা জানিয়ে দেয়। আরকি! বুয়া তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে মাকে এমন গালমন্দ করলো যে আলীর নিজের ওপর নিজের খুব রাগ হলো, কেন সে বোকামী করে মাবুদা-ফাহমিদাকে এইসব কথা বলতে গেল! সেই থেকে আলী এমনসব ব্যাপারে একেবারে চুপ।

আলী দেখেছে দিনে তিনবেলা খাবার ছাড়া অন্য কোন খাবার সহসা জুটতো না। স্কুলের কাছে বা বাঁকড়া বাজারে ফেরিওয়ালারা লেবেনচুষ, হাওয়াই মেঠাই, আচার, হজমী এমন কত কি বিক্রি করে! তার সাথের অনেক ছেলে তো বটেই মান্নাফ কাকার ছেলেমেয়েরাও ওসব প্রতিদিন খেতো। ওসব কিনতে তো পয়সা লাগে! আলী পয়সা পাবে কোথা থেকে? মায়ের কাছে পয়সা চাওয়ার কোন মানে নেই, আলী জানে মায়ের কাছেও কোন পয়সা থাকে না। বাড়ি

র আশপাশের শরিকানা জংলা জায়গায় থাকা পেয়ারা, কুল, বৈঁচি, আঁশফল, জামরুল, নোনা, ডুমুর, ফলসা গাছে ফল ফললে দুপুরে এক ফাঁকে গাছে চড়ে সেগুলোর স্বাদ নেয়া যেতো। তবে কাকীদের কেউ দেখে ফেললে আর নিস্তার নেই —আলী যে কত বড় চোর, হাভাতে, নোলাঝোলা, সেটা পাড়া মাথায় তুলে বলে বেড়াতো। এতে মায়ের হাতে চড়চাপর খাওয়াটা অবধারিত হয়ে যেতো। আলীর তখন খুব ঘেন্না লাগতো, ভাবতো এমন ছোট মনের মানুষদের সাথে আর থাকবে না।

স্কুলে একদিন সুরেনের পাশে বসতে গেলে হঠাৎ সে বলে বসে, "অ্যাই লেড়ে, দূরে সরে বোস্"। 'লেড়ে' মানে কী? খোদ সুরেনকেই জিজ্ঞেস করতে জানা গেল "মুচলমানদেরকে লেড়ে বলতে হয়" আর তাদের সাথে ছোঁয়াছুঁয়ি বারণ। ছোঁয়াছুঁয়ি বারণের ব্যাপারটা আলী জানে। সে দেখেছে কোন কারণে হিন্দুদের বাড়ি গেলে তাকে বা তার ভাইদেরকে ভেতরে ঢুকতে দেয়া হয় না, উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। শুধু বাড়ি নয়, বাজারে গণেশ ময়রার দোকানেও কোন মুসলমানকে ঢুকতে দেয়া হয় না। বাইরে দাঁড়িয়ে শালপাতার ঠোঙায় করে মিষ্টি খেতে হয় বা মাটির হাঁড়িতে করে মিষ্টি নিয়ে যেতে হয়। স্কুলে মুসলমানদের জন্য জলের ঘটিও আলাদা, কিন্তু তাতে ক্লাসে পাশাপাশি বসতে বারণ ছিল না। এখন পাশে বসতে বারণ করলো কে, আর 'লেড়ে' বলে গালি দিতে বললো কে? জানা গেলো সুরেনদের বাড়ি র বড়রা এসব কথা বলেছে। তারা আরও বলেছে, সায়েবদের সাথে জাপানীদের যে যুদ্ধ চলছে সেটা শেষ হলেই গান্ধী দেশ আজাদ করে ফেলবে। তখন সব লেড়েকে ঘটিবাটিসুদ্ধ দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়া হবে। আলী জানে না যুদ্ধ কোথায় হচ্ছে, তা কবে শেষ হবে আর দেশ আজাদ হওয়া মানে কী। সে আরও জানে না ঘটিবাটিসুদ্ধ দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলে সে কোথায় যাবে! কখনো তার মনে হয় দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলে মন্দ হয় না। তাহলে এই প্রতিদিনকার অভাব আর গালমন্দ সহ্য করতে হবে না। আবার মনে হয়, তাড়িয়ে দিলে কোন্ দেশে যাবে? সে তো আর কোন দেশ চেনে না।

যুদ্ধ শেষ হবার ঢের আগে একদিন আলী আর তার মাকে মুন্সীডাঙার সর্দারপাড়া ছেড়ে চলে যেতে হয়। সেটা ঘটে বুয়া মারা যাবার পর পর। গ্রামে ওলাওঠা শুরু হয়েছিল। প্রথমে অন্য গ্রামে দুয়েক জন মারা যাবার খবর পাওয়া যায়। এরপর দেখা গেলো প্রতিদিনই কেউ না কেউ মারা যাচ্ছে। যেদিন সকালে বুয়া ভেদবমি করা শুরু করলো সেদিন বাড়ি র সবাই ভয় পেয়ে গেলো। আলী সারা দিন ভয়ে চৌকির এক কোণে গুটিসুটি মেরে শুয়ে ছিলো। সন্ধ্যায় মাগরেবের ওয়াক্ত পার হতে না হতে উঠোনের উলটো দিকে বুয়ার ঘর থেকে যখন মা আর মাকসুরন বেটি'র সম্মিলিত কান্নার রোল উঠলো তখন আর কাউকে বলে দিতে হলো না যে বুয়া আর নেই! বুয়াকে আলী ঠিক পছন্দ করতো না। সেটা যতোটা না তার সাথে দুর্ব্যবহারের জন্য তার চেয়ে ঢের বেশি মাকে গালমন্দ বা মারের জন্য। মায়েরও বুয়াকে বিশেষ ভালো লাগার কথা না। কিন্তু আলী অবাক হয়ে দেখলো বুয়া মারা যাওয়ায় মা বুকফাটা মাতম জুড়ে দিয়েছে। মায়ের মাতমের কারণটা বোঝা গেলো বুয়ার চল্লিশার পরদিন যখন সব কাকা-কাকী আর বেটি-ফুফা এক বৈঠকে বসে ঠিক করলো বাড়ি ভাগাভাগি হবে, এবং কার ভাগে কী পড়বে। বাড়ি ভাগ হওয়া মানে হাঁড়িও আলাদা হওয়া। মান্নাফ কাকা ঠিক করলেন তিনি সপরিবারে বাড়ি ছেড়ে ডোমজুর বাজারের কাছের মুসলমানপাড়ায় চলে যাবেন। এখানে থাকলে নাকি তার কাপড়ের ব্যবসায় খুব অসুবিধা হয়। আসলে উনি অনেক দিন ধরেই বাড়ি ছাড়ার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু বুয়া বেঁচে থাকায় সেটা সম্ভব হয়নি। ইয়ার নবী কাকা আর হারুন কাকা বাড়ি না ছাড়লেও তাদের হাঁড়ি আলাদা হলো, এবং সেই আলাদা হাঁড়িতে তাদের কেউই আলী বা তার মাকে নিতে রাজী হলেন না। আলীদের ভাগে পড়লো মূল বাড়ি র বাইরে ছোট ডোবার পাশের জংলা জমিটা। সেখানে ঘর তোলা বা প্রতিদিনের আহার জোটানো মায়ের পক্ষে সম্ভব ছিলো না, সুতরাং তাদের পক্ষে পদ্মপুকুরে নানা'র (দাদু) বাড়ি তে চলে যাওয়া ছাড়া আর উপায় থাকলো না।

নানাদের বাড়ি পদ্মপুকুর রেলকলোনী ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা ভেতরে। নানা বেঁচে থাকলেও নানী (দিদিমা) মারা গেছেন আলীর জন্মের আগে। বাড়ি তে দুই মামা-মামী আর তাদের ছেলেমেয়েরা আছে। পদ্মপুকুর রেলস্টেশনের কাছের বাজারে নানা শেখ ইদ্রিস আলীর কাপড়ের দোকান আছে —নাম 'শেখ ক্লথ মার্চেন্ট'। সেই দোকানে মিলের ধুতি-লুঙ্গি-শাড়ি, জলগামছা, কাটা কাপড় বিক্রি হয়। নানা'র পুঁজিপাটা কম, দোকানে ক্রেতা আরও কম। যুদ্ধ আর অভাবের কারণে কাপড়ের সাপ্লাই আর বেচাবিক্রি আরও কম। বড় মামা শেখ ময়ুখ আলী কাজ করেন চেঙ্গাইলের ল্যাডলো জুট মিলের ওয়ার্পিং সেকশনে আর ছোট মামা শেখ সেকান্দার আলী কাজ

করেন লিলুয়ার রেল ওয়ার্কশপে স্যান্ড কাস্টিং সেকশনে। ছোট মামা বাড়ি তে থেকে প্রতিদিন লিলুয়া যাতায়াত করলেও বড় মামা চেঙ্গাইলে মেসে থাকেন, প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় বাড়ি আসেন আর সোমবার খুব ভোরে উঠে চলে যান। বড় মামার ঘরে এক মেয়ে আমিনা আর এক ছেলে আশরাফ দুজনেই আলীর চেয়ে বয়সে বড়। ছোট মামার দুই মেয়ে বিবি আর বানু দুজনেই বয়সে তারচেয়ে ছোট। আলী আর তার মা আসায় বাড়ি তে যে ঠিকে ঝি ছিল তাকে ছাড়িয়ে দেয়া হলো, আর আলীকে পদ্মপুকুর হাই স্কুলে চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি করে দেয়া হলো।

আলী যখন পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে তখন সে প্রথম বারের মতো কলকাতা যায়। সেবার হুগলী নদীর উপর বিশাল লোহার ব্রীজ হয়েছে। আজব সে ব্রীজ! তার তলায় থাম নেই, উপর দিয়ে বাস-ট্রাম-ট্যাক্সি চলে, লোকে পায়ে হেঁটে যায়, আর নিচ দিয়ে লঞ্চ-স্টীমার যায়। আলীদের বাড়ির সবাই গোটা ব্রীজ হেঁটে হেঁটে পার হয়। ওপাড়ে গিয়ে আরও হেঁটে ময়দান, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, হাইকোর্ট সব ঘুরে দেখেছিলো। নিউ এম্পায়ার থিয়েটারের সামনে দাঁড়িয়ে দেয়ালের ছবি দেখেছিলো। মামীদের খুব ইচ্ছে ছিল থিয়েটার দেখার, কিন্তু এতগুলো মানুষের টিকিট কেনা সম্ভব ছিলো না। এই দিন আলী জীবনে প্রথম বারের মতো দোকানে বসে কাবাব-রুটি আর কুলফি খেয়েছিলো। অমন খুশবুদার আর মাখনের মতো মোলায়েম কুলফি আলী আর কোনদিন খায়নি। দোকানে আরেকটা খাবার দেখেছিল, তার নাম 'ফালুদা'। নানা রকমের ফল, বাদাম, সিরাপ, ক্ষীর, বরফ দিয়ে বানানো। কি লোভনীয় দেখতে, আর কি তার খুশবাই! কিন্তু মামাকে ফালুদার কথা বলতে সাহস হয়নি। এত ভালো খাবারের দাম নিশ্চয়ই বেশি। আলী যখন বড় হবে, অনেক টাকা কামাবে তখন সে প্রতিদিন কুলফি আর ফালুদা খাবে।

নানা বাড়ি তে আলী যে খুব আরামে ছিল তা নয়। মা'কে যেমন দিনরাত খাটতে হতো তেমন তাকেও ছোট মামাতো বোনগুলোকে রাখা থেকে শুরু করে ঘরের নানা কাজ করতে হতো, নানাকে দোকানে দুপুরের খাবার দিয়ে আসতে হতো, দোকানে ফুটফরমাশ খাটতে হতো। বুয়া, বেটি, কাকীদের মতো এখানেও মামীদের কাছ থেকে নানা রকমের খোঁটা শুনতে হতো। তবে সে খোঁটা চলতো নানা যখন বাড়ি তে থাকতেন না তখন। তবু নানাবাড়ি তে সে আর তার মা দুজনেই ভালো ছিলো বলে মনে হয়। এই ভালো থাকার দিন শেষ হয়ে গেলো খুব হঠাৎ করে। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর আজাদী নিয়ে দেশ উত্তপ্ত হতে থাকে। এই প্রথম আলী 'পাকিস্তান' শব্দটা শুনলো, কিন্তু সেটা যে কী ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না। কলকাতায় ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে নিয়ে যে বীভৎস হত্যাকাণ্ড আর নৃশংস সব ঘটনা ঘটলো তাতে গোটা বাংলা থমকে গেলো। হিন্দু আর মুসলিমদের মধ্যে সন্দেহ আর অবিশ্বাস ক্রমে বাড়তে থাকলো। গতকাল পর্যন্ত যারা আপনজন ছিল আজ তারাই 'আমরা আর ওরা'তে ভাগ হয়ে গেলো।

ল্যাডলো জুট মিলের শ্রমিকদের একাংশ ছিলো পূর্ববঙ্গ থেকে আসা মুসলিমরা। মিলের কাছের মেসগুলোতে তারা থাকতো। মেসগুলোতে যে তাসের আসর বসতো সেখানে মেসের বাসিন্দারা তো বটেই, মিলের অন্য শ্রমিক-কর্মচারীরাও বসতো। সেখানে ধর্ম বিভাজন কোন ব্যাপার ছিল না। তাসের যে আসরগুলোতে হারজিতের সাথে টাকাপয়সার ব্যাপার জড়িত থাকতো সেগুলোতে প্রায়ই ঝগড়া বাঁধতো। সেই ঝগড়া উঁচু গলায় কথা থেকে গালাগালি ছাড়িয়ে কখনো হাতাহাতিতেও গড়াতো। তবে ওই পর্যন্তই – হাতাহাতি কখনো বড় ধরনের মারামারিতে পরিণত হয়নি। ময়ুখ আলী কখনো সখনো তাসের আসরে বসলেও কখনো জুয়া খেলেননি। একে তো জুয়া খেলতে তার ভালো লাগেনা, তারওপর নষ্ট করার মতো পয়সা তার ছিলোনা। মিলের যে সেকশনে তার কাজ সেখানে বাড়তি কোন আয়ের সুযোগ নেই। যুদ্ধের বাজারে পাটের ব্যাগের চাহিদা বেড়েছে বটে তবে ওভারটাইম খাটলেও বাড়তি মজুরী ঠিকমতো মেলে না। তাই যুদ্ধের মহার্ঘ্য বাজারে বেতনের টাকায় সংসার চালানো মুশকিল। এক রাতে মেসের জুয়ার আসরের ঝগড়া হঠাৎ খারাপ রকমের মারামারিতে রূপ নিলো। সেই মারামারি আবার কী করে যেন পূর্ববঙ্গীয় মুসলিম আর পশ্চিমবঙ্গীয় হিন্দুদের মারামারিতে পরিণত হলো। কোথা থেকে লাঠি, সড়কি, কোরবানীর সময়কার লম্বা ছুরি, কসাইয়ের দোকানের চাপাতি এগুলো বের হতে থাকলো। শেষ পর্যন্ত সাধারণ একটা ঝগড়া খুনোখুনিতে পর্যবসিত হলো। ময়ুখ আলী নিশ্চিতভাবেই জুয়ার আসরে ছিলেন না। তিনি আসলে ঝগড়া বাঁধার সময় মেসেই ছিলেন না। সেদিন মিলেই কিছু বাড়তি কাজ ছিলো, তাই মারামারির খবর তিনি পাননি। কাজ সেরে মেসে ফেরার পথে তিনি পশ্চিমবঙ্গীয় হিন্দুদের দলটার সামনে পড়ে যান। ময়ুখ আলীকে মেস এলাকার সবাই চেনে। তিনি পূর্ববঙ্গীয় নন বটে, কিন্তু মুসলিম

তো! অতএব মুহূর্তে একটা ছোরা আমূল তার বুক-পেটের সংযোগস্থলে ঢুকে গেলো। পুলিশ তার লাশ নিয়ে যায়নি, তাই লাশ নিয়ে কাউকে কোন হুজ্জত করতে হয়নি। পরদিন গরুর গাড়ীতে করে তার লাশ যখন পদ্মপুকুরে পৌঁছায় তখন সারা শরীর থেকে রক্ত ঝরে তার মুখ কাগজের মতো সাদা হয়ে গিয়েছিলো। সেই প্রথম আলী কোন নিহত মানুষের লাশ দেখতে পায়। আলী জানতো না সেটা ছিলো শুরু মাত্র।

বড় মামা খুন হবার মাসখানেক পরের কথা। একদিন বাজারের ইজারাদার বীরেন সাঁপুই নানাকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি দোকান বিক্রি করবেন কিনা। নানা'র তো আকাশ থেকে পড়ার দশা। হঠাৎ দোকান বিক্রির কথা আসে কোথা থেকে! বীরেন যা বললেন তা হচ্ছে, যেহেতু দিনকাল ভালো না, এবং যেহেতু ইদ্রিস আলীর বড় ছেলেটা অকালে মরলো, অতএব তার মতো বিপত্নীক বৃদ্ধ মানুষের উচিত দোকানপাট বেচে দিয়ে কলকাতায় বা ঢাকায় চলে যাওয়া। চাইলে সে বোম্বাই থেকে জাহাজে করে মক্কায় গিয়ে হজ্ব করতে পারে এবং আরব দেশে থেকে যেতে পারে। পরিস্থিতি বিবেচনা করে নানা ক্রোধ দমন করে শুধু জানালেন, তিনি দোকান বিক্রি করতে আগ্রহী না, তিনি মারা যাবার পর যদি তার ছোট ছেলে দোকান না চালায় তাহলে তার এতিম ছোট নাতি (আলী) দোকান চালাবে। এর কয়েকদিনের মধ্যে উখো দিয়ে ঘষে দোকানের দরোজার কড়া কেটে বড় রকমের চুরি হয়। নানা এমনটা আঁচ করেছিলেন। তিনি কাউকে কিছু বললেন না। কেউ কেউ তাঁকে পুলিশের কাছে যেতে বলেছিলেন, কিন্তু নানা জানতেন পুলিশের কাছে গিয়ে নালিশ করলে চোরাই মাল উদ্ধার হবে না। এর সপ্তাহ দুই-তিন পরে এক রাতে নানা দোকান থেকে বাড়ি ফিরলেন না। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পরও যখন তিনি বাড়ি ফিরলেন না তখন হ্যারিকেন আর লাঠি নিয়ে ছোট মামা আর আলী তার সন্ধানে বের হয়। গোটা বাজারে তখন কেবল একটা পানবিড়ির দোকান খোলা। নানার দোকানে দেখা গেলো বাইরে থেকে দরোজায় তালা মারা। বোঝা গেলো নানা দোকান বন্ধ করে বের হয়েছেন, কিন্তু তিনি কোথায় যেতে পারেন তা ভেবে কূল পাওয়া গেলো না। বাড়ি র কারো কারো মনে হলো তিনি হয়তো আজানগাছীর পীর সাহেবের দরগাহে গেছেন। তিন দিন পার হলেও নানা বাড়ি ফিরলেন না। এদিকে কে যেন খবর দিলো নানার দোকান থেকে নাকি খুব পচা দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। ছোট মামা, মামাতো ভাই আশরাফ আর আলী বাজারে ছুটে গিয়ে দেখে বীরেন সাঁপুই পুলিশ নিয়ে এসেছেন। পুলিশ দোকানের দরোজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে দেখে একটা বড় চটের বস্তা রাখা, দুর্গন্ধ সেখান থেকে আসছে। শুধু আলী কেন, গোটা বাজারসুদ্ধ মানুষ বুঝে গিয়েছিল বস্তার ভেতরে কী আছে। আলী মনেপ্রাণে চাইছিল তার ধারণাটা যেন সত্য না হয়, কিন্তু সেটা তো আর হয় না! পুলিশ বস্তা খুলে ভেতর থেকে শেখ ইদ্রিস আলীর খণ্ড খণ্ড লাশ উদ্ধার করে। খুন, লাশ কাটা, বস্তায় ঢোকানো সব দোকানের ভেতরেই হয়েছিল। তার সব স্পষ্ট আলামত চারপাশে ছড়ানো। যারা এসেছিল তারা চুরি বা ডাকাতি করতে আসেনি। ক্যাশ বাক্সে রাখা সামান্য টাকা আর তাকে রাখা নতুন কাপড়ের ছোট চালানটি তারা ছুঁয়ে দেখেনি। খুন করে, লাশ কেটে, বস্তায় ঢুকিয়ে নানার কোমরে রাখা চাবি দিয়ে দরোজা বাইরে থেকে তালা মেরে চলে গেছে। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে বাজারের কোন দোকানদার বা দোকান কর্মচারী কোন কিছু দেখার বা শোনার কথা স্বীকার করলেন না। পুলিশ লাশ নিয়ে চলে যাবার সময় দোকান সীল মেরে রেখে যায়। এরপর 'শেখ ক্লথ মার্চেন্ট' আর কোনদিন আবার চালু হয়নি। দোকানটা একসময় বীরেন সাঁপুইয়ের হয়ে যায়।

নানা'র খুন হওয়াটা সামলে উঠতে না উঠতে একদিন সনাতন হালদার বাড়ি এলেন। সনাতন পাড়ার মাতব্বর গোছের লোক। যুদ্ধের বাজারে নানা রকমের সাপ্লাইয়ের কাজ করে বেশ দু'পয়সা করেছেন। কিছু দিন হল হিন্দু মহাসভার লোকাল কমিটিতে যোগ দিয়ে নেতা হবার চেষ্টা করছেন। একথা সেকথা বলার পর সনাতন আসল কথা পাড়লেন। বললেন, "ও সেকান্দার, পাড়ার ছেলেরা ধরেছে তোমার বার্বাড়ি র ঘরটা ক্লাবঘর বানাবে। তোমাদের বাড়ি র লোকজন তো এখন কম, একটা ঘর তো তুমি ছাড়তেই পারো"।

এমন দাবিতে ছোট মামা হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, "এটা কী বলছেন দাদা! আমার বাড়ি তে ক্লাবঘর কেন? বাজারে করতে বলুন"।

"আহা! এটা তো ক্যারম, দাবা, লুডু খেলার ক্লাব না। এখানে ছেলেরা একটু ভক্তি গান গাইবে, ব্যায়াম করবে। বাজারে অত জায়গা কোথায়! আর একটু নিরিবিলি না হলে কি আর ভক্তি গান আর ব্যায়াম হয়"?

"তাই বলে আমার বাড়ি তে কেন? আপনি নেতা মানুষ, আপনার বাড়ি তে করুন"।

"আরে আমার বাড়ি তো হাটবাজার হয়ে গেছে। দিনমান লোকজন আসছে যাচ্ছে। সেখানে আর নিরিবিলি কই"!

"আমি কী করে বাড়ি তে ক্লাবঘর বসতে দিই, বাড়ি ভর্তি মেয়েছেলে"!

"আরে সেজন্যই তো বলছি। তুমি দিনমান কারখানায় থাকো, এদিকে বাড়ি তে তোমার বউ, ময়ুখের বিধবা বউ, তোমার বিধবা বোন, সব জোয়ান মেয়েছেলে। আবার ময়ুখের মেয়েটাকেও সেদিন দেখলাম গায়েগতরে বেশ ডাগর হয়ে গেছে। এতগুলো মেয়েছেলে দেখেশুনে না রাখলে হয়! এমনিতেই জানো দিনকাল ভালো না। তারওপর তোমার পরিবারের উপর দিয়ে একটার পর একটা বিপদ যাচ্ছে"।

সনাতনের হুমকিটা বুঝতে ছোট মামার কোন অসুবিধা হয়নি। "আচ্ছা ভেবে দেখি" বলে সেদিন সনাতনকে বিদায় করলেও তিনি বুঝতে পারেন এটা বিপদের শুরু মাত্র।

বিপদটা যে বহুমাত্রিক সেটা কয়েক দিনের মধ্যে বাড়ি র সবাই নানাভাবে টের পেতে শুরু করে। প্রায়ই দেখা যায় সাইকেলে করে একজন যুবক আরেকজনকে তাড়া করে ভেতর বাড়ি তে ঢুকে পড়ছে। ভেতরের উঠোনে কয়েকবার চক্কর দিয়ে যাবার সময় দড়িতে শুকোতে দেয়া কাপড় টেনে ফেলে দেয়া, রোদে দেয়া আচার বা মশলা ছড়িয়ে ফেলার সাথে উঠোনে মেয়েদের কাউকে পেলে তাকে ধাক্কা মারার ঘটনাও ঘটতে থাকলো। একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে একদল ছেলে আলীকে ঘিরে ফেলে। নানারকমের টিটকিরি দেবার সাথে সাথে হঠাৎ তাদের একজন আলীর ধুতির কোঁচা ধরে টান মেরে বলে, "অ্যাই সালা কাটুয়া! তোর কাটাটা দেখা তো দিকি। আর লুঙ্গি না পরে ধুতি পরেছিস্ ক্যানো"! আলী কিছু না বলে একহাতে ধুতি চেপে ধরে দৌড়ে বাড়ি চলে আসে। বাড়ি ফিরেও সে কাউকে কিছু বলে না। যেদিন একদল লোক তাদের বার্বাড়ি র ঘর থেকে তাদের জিনিসপত্র উঠোনে ছড়িয়ে ফেলে বাইরে 'পদ্মপুকুর যুব সমিতি'র সাইনবোর্ড লাগিয়ে দিলো সেদিন বাড়ির সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেলো যে পদ্মপুকুর থেকে পালানোর সময় হয়ে গেছে।

পদ্মপুকুরের বাড়ি বিক্রি করাটা খুব সহজ ছিলো না। নানা হঠাৎ করে মারা যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই কোন উইল ছিলো না। নানা মারা যাবার পর ওয়ারিশানদের মধ্যে নামজারী করার বা বাড়ি মিউটেশন করার কথা কেউ ভাবেনি। কিন্তু বেচার সময় দেখা গেলো এসব না করা হলে বাড়ি বেচা কঠিন। তার ওপর বাড়ি বেচার কথা যখন সনাতন হালদারের কানে গেলো তখন বিষয়টা আরও কঠিন হয়ে গেলো। সনাতন নিজে বাড়ি টা পেতে আগ্রহী, কিনতে নয়। সুতরাং অন্যরা যারা কেনার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছিল তারা একটু একটু করে পিছু হঠা শুরু করলো। শ্যামল ব্যানার্জী রাজনীতি করেন না তবে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা সব দলের নেতাদের সাথে তার দহরম মহরম আছে। তার মূল ব্যবসা জমি কেনাবেচা, জমির দালালী এবং সুদে টাকা খাটানো। শ্যামল স্থানীয় মানুষ নন, তিনি আসলে কোথাকার মানুষ সেটাও কেউ খুব নিশ্চিত না। এমনকি তার আসল নাম শ্যামল ব্যানার্জী কিনা সেটা কেউ হলফ করে বলতে পারবে না। তবে এগুলো কোন সমস্যা না, শ্যামল ক্ষমতাবান মানুষ, এই এলাকার অন্য ক্ষমতাবান মানুষেরাও শ্যামলকে সমঝে চলেন। শ্যামল বিপদগ্রস্ত মানুষের জমি, ভেজাল লাগানো জমি কিনতে ভালোবাসেন। এতে সস্তায় কেনা যায়, পরে ভালো দামে বেচা যায়। এই পর্যায়ে সাপের হাত থেকে বাঁচার জন্য ছোট মামা কুমীরের শরণাপন্ন হলেন, তিনি বাড়ি বেচতে শ্যামলের দ্বারস্থ হলেন।

নানাবাড়ি বিক্রি হবার ব্যাপারটা চূড়ান্ত হতে বড় মামী তার দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে মির্জাপুরে তার বাপের বাড়ি তে গিয়ে উঠলেন। বড় মামী বা তার ছেলেমেয়ের সাথে আলীর খুব সদ্ভাব ছিল তা নয়, তবে বিরোধও ছিল না। পাঁচ-ছয় বছর এক বাড়ি তে থাকলে, বয়সে কাছাকাছি হলে একরকম সম্পর্ক তো তৈরি হবেই। তাই যেদিন ওরা চলে গেলেন সেদিন আলীর মনে হয়েছিল তার চোখের সামনের পৃথিবীর এক খাবলা কেউ তুলে নিয়ে গেল।

ছোট মামীর বাপের বাড়ি বকুলতলায়। ঠিক হলো বকুলতলায় মামীদের বাড়ি র কাছে একটা ছোট বাসা ভাড়া নেয়া হবে। সেখানে আলী আর তার মা উঠবেন। ছোট মামা, মামী, তাদের দুই মেয়ে আপাতত মামীর বাপের বাড়ি উঠবেন। পরে বাড়ি বিক্রির টাকা পাওয়া গেলে বকুলতলায় জমি কিনে বাড়ি তুলে সবাই একসাথে উঠবেন। এইসব কথাবার্তা যখন চলছে তখন মা কিছু বুঝতে পেরেছিলেন কিনা আলী নিশ্চিত না, তবে সে নিজে বুঝতে পারেনি আসলে পরিবারটা এখানেই ভেঙে যাচ্ছে। বকুলতলায় জমি কিনে ছোট মামার আর কখনো বাড়ি করা হয়নি, কিন্তু সেসব তো আরও পরের কথা।

বকুলতলায় যে বাসায় আলী আর তা মা উঠলো অমন বাসা আলী আগে কখনো দেখেনি। খুব সরু একটা গলি যেখান দিয়ে দুজন মানুষ গায়ে গা না লাগিয়ে চলা কঠিন অমন একটা গলির দুপাশে টানা দুই সারি একচালা টিনের

চাল দিয়ে বাঁশের বেড়ার গায়ে গায়ে লাগানো ঘর, কাঁচা মাটির মেঝে। কাঠের দুই পাল্লার দরোজা খুললে ভেতরে একটাই ঘর। সে ঘরের পেছনে একটা ছোট বারান্দামত জায়গা, সেখানে কাঠের উনুনে রান্নার ব্যবস্থা। গলির শেষ মাথায় একটা কুয়ো — তার জল দিয়ে স্নানাহারশৌচ সব কিছু সারতে হয়। কুয়োতলার পরে গলির কুড়িটা পরিবারের জন্য দুটো কাঁচা পায়খানা — একটা পুরুষদের, আরেকটা মেয়েদের। এসব দেখে মা গুম হয়ে যান, আলীরও দম বন্ধ লাগে। ওরা গ্রামের মানুষ। গ্রামের ঘরদোর যেমন হোক, সব ছিলো খোলামেলা — এমন সরু ঘিঞ্জি নয়। এখানে একটা গাছ নেই, কোন ঝোপঝাড় নেই, কোন পুকুর নেই। এখানে পাখি মানে কাক আর চড়াই। আর আছে কয়েকটা হাড় জিরজিরে বেড়াল আর ছালওঠা কুকুর।

আলীকে কাছের থানামাকুয়া হাইস্কুলে ভর্তি করে দেয়া হয়, তবে সে শুধু নিয়মরক্ষার্থে। দুবেলা আহার জোটানো যখন কঠিন হয়ে পড়লো তখন আলীকে স্কুলের কাছে একটা দর্জি দোকানে দেয়া হলো খলিফার কাছে কাজ শিখতে আর দোকানের টুকটাক কাজ করতে। দোকানে সেলাই মেশিনের ঘড়ঘড় শব্দে আলীর সর্দারপাড়ার বাড়ি তে মান্নাফ কাকার ঘর থেকে ভেসে আসা সেলাই মেশিনের শব্দের কথা মনে পড়ে। আলীর মনে হয় গত কয়েক বছরে সে আর তার মা নিজেদের ঠাঁই থেকে নড়ে ক্রমে দক্ষিণপূবে প্রথমে পদ্মপুকুর, তারপরে বকুলতলায় ঠাঁই পেলো। এই ঠাঁই যে সাময়িক সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না। খাস জমি দখল করে তোলা ঘর থেকে যে কোন সময় উচ্ছেদ হয়ে যেতে হতে পারে। তারওপর জোর আলাপ চলছে খুব শীঘ্রি দেশে আজাদী এসে যাবে, সায়েবরা বিলেতে ফেরত যাবে, আর মুসলমানদেরকে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়া হবে। সুরেন যে বলেছিল ঘটিবাটিসুদ্ধ দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে শেষমেশ সেটাই সত্যি হতে যাচ্ছে।

এর কয়েক বছর পরে একদিন সত্যি সত্যি আলী আর তার মাকে দুটো পুঁটলি সম্বল করে আরও পূবে চলে যেতে হয়েছিলো। ট্রেনে করে কলকাতা থেকে গোয়ালন্দ, সেখান থেকে স্টীমারে করে নারায়ণগঞ্জ, আবার সেখান থেকে ট্রেনে করে ঢাকার ফুলবাড়ি য়া স্টেশনে — এক অজানা দেশ পাকিস্তানে, যেখানে তার ঊর্ধ্বতন চৌদ্দ পুরুষের কেউ কখনো যায়নি। আলীর পুঁটলিতে কয়েকটা কাপড় আর দরকারি কিছু জিনিসের সাথে দুটো অদরকারি জিনিস ছিলো — একটা আশুতোষ দেবের 'ইংলিশ-বাংলা অভিধান', আর একটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সঞ্চয়িতা'।

পাকিস্তানে আলী আর তার মায়ের কী হলো, আর তার ভাই নবীই বা কোথায় গেলো সেসব আরেক গল্প। ওসব অন্য কোন দিনের জন্য তোলা থাক।

১৯৩৪ থেকে ১৯৪৬, স্থান : হাওড়া জেলা

কাফিরনামা...

রাণা আলম

বিদ্বেষের ঘরবসতি

সোসাল সাইটে এক অনুজপ্রতিম আমায় একটি পোস্টে ট্যাগ করেছিলেন। তল্লাস করতে গিয়ে দেখি সেটায় 'গরুখোর হিন্দু'দের সাথে অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে 'শুয়োরখোর মুসলমান' দের আওয়াজ দিতে বলা হয়েছে। সেই সুবাদেই আমায় ট্যাগিত করা হয়েছে আর কি। শুয়োর কিভাবে রান্না করলে কতটা সুস্বাদু হতে পারে তা নিয়ে সেমিনারের আগ্রহী শ্রোতা আমি নিশ্চিত,তবে এই খাদ্যগ্রহণের অভ্যেস আমার সেকুলারত্বের ইঙ্গিতবাহী পাইলট কার হয়ে দাঁড়িয়েছে, এইটে ধারণায় আসেনি।

তার চেয়েও বড় আগমার্কা ছাপ হল ওই 'শুয়োরখোর মুসলমান' বা 'গরুখোর হিন্দু'। এতকাল যাবত মানুষ বলে চেনাতে চেয়ে যদি নিজেদের এইসব ট্যাগে চিনতে হয় তাহলে বেশ ভজকট লাগে বইকি।

অ্যাদ্দূর লেখার পর মনে হল যে তাহলে কি আমি আমার পরিবারসূত্রে পাওয়া ধর্মীয় পরিচয়টা কে কোনোভাবে নেগেটিভ দ্যোতক মনে করছি? আমার কাছে যদি ধর্ম বিষয়টা গুরুত্বহীন হয় তাহলে কে কি ধর্মীয় পরিচয়ে আমাকে চিনতে চাইছে তাতে আমার এত মাথাব্যথা ক্যানো? নাকি দুনিয়াজোড়া মুসলিম পরিচয়ের সাথে যেভাবে সন্ত্রাসবাদী ছাপ্পা জুড়ে যাচ্ছে তাতেই শংকিত হয়ে সেই পরিচয়ের সাথে নিজেকে জড়াতে চাইছিনা।

প্রশ্নগুলো গোলমেলে। কিছুদিন আগে সোসাল সাইটে এক পরিচিতা লিখেছিলেন যে যেহেতু ইসলাম ধর্মালম্বীরা দুনিয়াতে টেররিজম চালাচ্ছে সেহেতু ভারতে তাদের মতন মানুষেরা, অর্থাৎ কিছু সংখ্যক হিন্দুরা মুসলিমদের প্রতি ঘৃণা এবং অবিশ্বাস পোষণ করতে বাধ্য হচ্ছেন।নইলে তো তারা অ্যাদ্দিন মুসলিম বেরাদরদের বুকের ভিতরই বসিয়ে রেখেছিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

মনোবিদ মোহিত রণদীপ পদবী না থাকার জন্য যাদবপুরে ঘর পান নি। এই অধমের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটেছে। বার কয়েক পছন্দ হওয়ার পরও শেষমুহূর্তে সংশ্লিষ্ট বাড়িওলারা যখন পিছিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন বাধ্য হয়েই ব্রোকারদের জিজ্ঞেস করি যে এরম সিরিয়াল রিজেকশনের কারণ কি। বাকিরা এড়িয়ে গেলেও এক ব্রোকার স্পষ্টতই জানালেন যে আমার আরবি নাম টাই এক্ষেত্রে মূল দায়ী। অর্থাৎ, আমি, মাহফুজ আলম, আমার নামের কারণে বাড়িভাড়া পেতে পারিনা।

ভেবে দেখলাম যে আমার ইয়ার দোস্ত বেরাদর কেউ নির্ঘাত আইসিসে নাম টাম লিখিয়েছে। কিংবা ওপার বাংলায় যখন হিন্দুদের বাড়ি পোড়ানো হয়, তখন আমিও সেখানে হাত লাগিয়েছিলাম নিশ্চিত, নিদেনপক্ষে ভব্যিষতে জঙ্গী হবো এরমটা শ্রীভৃগু কয়েছেন, নইলে আমি ব্রাত্য হচ্ছি ক্যানো।

এবং সমীকরণটা সত্যিই বড্ড সোজা। তালিবানরা নাইন-ইলেভেন ঘটালে গোটা দুনিয়ার তাবৎ মুসলমান কে তার দায় নিতে হয়।কিন্তু কাঠের সিন্দুকে গোপন মারণাস্ত্র খোঁজার ছলে কোনো দেশকে শ্মশান করে ফেললেও প্রথম বিশ্বের দেশগুলির আবার পরে একটা ফর্মাল ভুল স্বীকার করলেই সব মিটে যায়।

অতএব, আমি আমার ধর্মীয় পরিচয়েই দুনিয়াতে ইসলামি জঙ্গীরা যে যেখানে যা কিছু কুকীর্তি করছে তার দায়ভার বহন করতে বাধ্য। ২০০২ সালেই একটি সমৃদ্ধ জেলাশহরে আমার সহ-গবেষক জিয়াউল হককে তার বন্ধুর মেসের বাড়িওলা মুসলিম বলে বের করে দিয়েছিলেন। ১৯৮০ এর শেষদিকে আমার এক পরিচিতা সর্বোচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম হবার দরুণ স্কুলের চাকরিতে যাতে না নেওয়া হয় তার জন্য সেক্রেটারির কাছে দরবার করেছিলেন সেখানকার কিছু সংখ্যাগুরু শিক্ষিকা।সনির্বন্ধ অনুরোধ ছিল যে দেখবেন কোনো মুসলমান যাতে না ঢোকে। ষাটের দশকে বাসে আমার এক চাচাকে সিট থেকে তুলে বলা হয়েছিল পাকিস্তান চলে যেতে।

একটা সাধারণ সমীকরণ দেওয়া হয় যে দেশভাগের ফলে ওপার থেকে ভিটেমাটি ছেড়ে অত্যাচারিত হয়ে যেহেতু চলে আসতে হয়েছে সেহেতু এই মুসলিম বিদ্বেষ। সত্যিই

কি তাই? সাতপুরুষের ঘটি, জীবনে পদ্মার ধারে যান নি, এমন মানুষজনও তো কম নেই যারা এই ঘৃণা আর বিদ্বেষের উত্তরাধিকার বহন করেন না।

তাহলে কি এই ঘৃণার সবসময়ই কি সঙ্গত কারণ থাকে? নাকি, শতাব্দীর পর শতাব্দী এভাবেই নিকটতম প্রতিবেশীকে বিন্দুমাত্র না জেনে ঘৃণা করে যাওয়া যায়?

হয়ত যায়, নয়ত দুই বাংলায় এই ঘৃণাজীবিরা এত মাথা তুলছে কি করে?

সহি শরিয়ত এবং নব্যছাগ তত্ত্ব

এই বাজারে মুসলমানত্ব নিয়ে লিখলে নব্য ছাগ সন্তানদের 'সহি মুসলমান' থিওরি নিয়েও দু-চার কথা বলা দরকার। নইলে পীর সায়েব গোঁসা হবেন।

প্রিন্স আনোয়ার শা রোডের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় গাড়ি থেকেই একটা পোস্টার নজরে এলো। লেখা রয়েছে ভারতের মুসলমানেরা সবরকম অত্যাচার সয়ে যাবে কিন্তু শরিয়তের উপর হাত দিলে সহ্য করবেনা। ইত্যাদি ইত্যাদি।

শরিয়ত কি সেটা নিয়ে যারা চেল্লান তাদেরও সব্বার ধারণা স্পষ্ট আছে কিনা তা নিয়ে বিস্তর কোশ্চেন আছে। এই নব্য ছাগসন্তানেরা চান যে মেয়েরা বোরখা পরুক,পর্দা করুক, তিন তালাক মেনে নিক, বহু বিবাহ মেনে নিক ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু শরিয়ত মানলে চুরি করলে হাত কাটা উচিত, ব্যাঙ্কে জমানো টাকায় সুদ নেওয়া উচিত না ইত্যাদি নানাবিধ হারাম কাজের হুকুমনামা রয়েছে। সেগুলো মানার ব্যাপারে ব্যগ্রতা দেখা যায় না বিশেষ।

শরিয়তের যাবতীয় গুরুত্ব ওই মেয়েদের উপর দখলদারি ফলানোর জন্য। এই তিন তালাকের চক্করে অসংখ্য মুসলিম মহিলা ভুগছেন। তা নিয়ে পার্সোনাল ল বোর্ডের মাথা ব্যথা দেখা যায় নি অ্যাদ্দিন। যেমনি অত্যাচারিত মহিলারা কোর্টে গেলেন অম্নি মোল্লাসায়েবদের মনে হল যে হেঁদুদের দেশে আমাগো পাক ধম্মোডা এবারে গেল আরকি।

অমনি তারা শরিয়ত কত ভালো তার ব্যখ্যানে নেমে পড়লেন। এই বিবাহ বিচ্ছিন্না অসহায় মুসলিম মহিলাদের জন্য তাদের হৃদয় কতটা কাতর সেটা সেইটে বোঝাবার জন্য মিটিং মিছিল শুরু হয়েছে। তিন তালাকের অপব্যবহারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এও অমৃতভাষণ শোনালেন। কিন্তু আজ অব্দি ঠিক কতজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছেন সেইটে জানাতে পারলেন না।

মোল্লাসায়েবদের কীর্তিনামা এখানেই শেষ নয়। প্যালেস্তাইনে মুসলমানেদের উপর ইজরায়েল অত্যাচার করলে তারা কলকাতায় মিছিল করেন। পাশের দেশ বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুরা অত্যাচারিত হলে দার-উল ড্যাশের অজুহাতে মুখ বন্ধ রাখেন।এমনকি মায়ানমার থেকে তাড়া খাওয়া রোহিঙ্গা মুসলমানেদের বাংলাদেশ ফের তাড়ালেও তারা কিস্যু দেখতে পান না। ধন্যি দৃষ্টিশক্তি বটে।

প্রত্যন্ত গ্রামের ইস্কুলে মাস্টারি করেছি বছর পাঁচেক।সেখানে রাজবংশী আর মুসলমানেদের বাস। বেশিরভাগের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ। তেরো-চৌদ্দতেই মেয়েদের বিয়ে হয় আর বারো-তেরো তেই ছেলেরা লেবার খাটতে যায়।ক্লাস সিক্সের মেয়ে, তার নাম ধরা যাক জেসমিনা, সে স্কুলে আসেনা নিয়মিত। মাস্টার মশাই বকাঝকা করছেন। মেয়েটি দাঁড়িয়ে চুপচাপ কেঁদে যাচ্ছে। তার অভিভাবক কে ডাকা হল। মা এলেন।

জানলাম তিনি পাঁচ সন্তানের জননী।তার স্বামী তাকে তালাক দিয়ে গ্রামেই আরেকটা বিয়ে করে দিব্যি আছেন।আগের স্ত্রী দূরে থাক, সন্তানদের দায়িত্ব অবধি নেন না। এই অসহায় মহিলা স্বামীর বিরুদ্ধে খোরপোষের মামলা লড়ছেন। বিঁড়ি বেঁধে সংসার চালান। সে কাজে তার ক্লাস সিক্সের মেয়েকেও হাত লাগাতে হয়।তাই সে স্কুলে আসতে পারেনা। মামলা লড়ার জন্য প্রাক্তন স্বামীর লোকেরা তাকে রাস্তায় ফেলে পিটিয়েছে।

এই অসহায় মহিলা কে তার ধর্ম, ধর্মের মুরুব্বী আর তার ঈশ্বর-কেউই কোনো সাহায্য করেনি।স্বামী তালাক দিয়ে আরেকটা বিয়ে করে। বাপের বাড়ি সম্পন্ন হলে মেয়েটার তাও একটা সহায় থাকে। বাপের বাড়ি গরিব হলে সেই মেয়ের কি হয় সেই খোঁজ ইসলাম ধর্মের মুরুব্বীরা নেন না। আজ যখন মুসলিম মেয়েরা তিন তালাকের বিরুদ্ধে কোর্টে গিয়েছেন, এ কুপ্রথা রদ করার জন্য আওয়াজ তুলছেন, তখন মুরুব্বীদের মাথায় হাত পড়েছে।

ইসস! মাইয়া মানুষেরা অধিকার চাইছে? অ্যাত্তো বড় ব্লাসফেমি কি সহ্য করা যায়?সুপ্রিম কোর্ট মাঝখানে না থাকলে তারা অ্যাদ্দিনে আরেক খানা ফতোয়াবাজিই করে ফেলতেন। নেহাত ভারত একটি 'কাফির' দ্যাশ। তাই জিন্নাসায়েবের

কথানুসারে যস্মিন দ্যাশে যস্মিন কদাচার ইত্যাদি ইত্যাদি।

মামলার ফল কি হবে বোঝা যাচ্ছেনা এখনও। তবে মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড নামের যে আজব চিজটি রয়েছেন তার মুরুব্বীরা বিপাকে পড়ে এখন বলছেন যে যে তালাক দেবে তাকে সামাজিক বয়কট করা হবে। কাজিরা তালাক আটকাবেন ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব 'বেহদ বকোয়াস' শুনলে বীরভূম সীমান্তের সেই প্রান্তিক গ্রামের পাঁচ সন্তানসহ তালাকপ্রাপ্তা সেই অসহায় মহিলার কথা মনে পড়ে আমার।

শিক্ষিত মুসলিমদের মধ্যে থেকেও এখন তিন তালাকের বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠছে, এইটাই সবচেয়ে ভালো লক্ষণ।

টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম, থুড়ি প্রাক্তন ইমাম, বরকতি সায়েব প্রায় ধোলাই খেয়ে যাচ্ছিলেন কিছু মুসলিম যুবকের কাছে। তাপ্পর তার সাধের লালবাতি আর মসজিদের ইমামত্ব, দুইই আপাতত খোয়া গেছে।নিজেকে মুসলিমদের মসীহা ভেবে শাসকদলের প্রতি আনুগত্য প্র্যাকটিস করা বরকতি সায়েব এর শিক্ষে হল কিনা জানিনা, তবে এখান থেকে আলোর দিশা তো দেখা যাচ্ছে বটেই।

বছরের পর বছর ধরে কতকগুলো ধর্মোন্মাদ নিজেদের যাবতীয় মুসলিমের মুখপত্র ধরে নিয়ে কাকে ভোট দেওয়া উচিত, কী করা উচিত, কাকে বয়কট করা উচিত তাই নিয়ে ফতোয়াবাজি চালিয়ে গেছে।সময় এসেছে এদের ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বোঝানো যে তারা আর যাই হোক ভারতের মুসলিমদের 'মসীহা' নয়।

বরকতির বিরুদ্ধে প্রথাগতভাবে শিক্ষিত, অশিক্ষিত সব শ্রেণির মুসলিমরা মুখ খুলেছেন।তাদের প্রতি অভিবাদন থাকুক।তার সাথে থাকছে কিঞ্চিৎ আশংকাও। বরকতি সরেছেন। সেই জায়গায় যেন অন্য 'বরকতি' না এসে বসে।

বছর খানেক আগে, জনৈক 'সহি'পন্থী আমায় হেসেই বলেছিলেন,

"নামাজ পড়েন না, রোজা রাখেন না। আবার ইফতারেও দিব্যি খেতে বসেন, বিজয়ার মিষ্টি খেতেও হিন্দুদের বাড়ি যান। আপনি ভাই মুসলমানেদের মধ্যে পাক্কা বেনোজল"।

বোঝাবে কে যে যদ্দিন ইফতারে হালিম আর সিমাই হবে তদ্দিন ইফতারে না বসাটা চরম ব্লাসফেমি। খোদাতলার এতটা বিরুদ্ধে আমি কখনই যেতে পারবোনা। এবং পুজোর সময় দশমীর মধ্যে একদিন অম্লানদের বাড়িতে আমার জন্য খাসির মাংস রান্না হয়। সেইটে না খেলে আমার তো নরকেও স্থান হবেনা। এতবড় মহাপাতক কি আমি হতে পারি। আর আমার বিরুদ্ধেই যত কথা? কোরবাণির সময় গুচ্ছের সংখ্যাগুরু মহাপাতক এসে 'ভাই, কোরবাণিতে খাওয়াবি না?' বলে গরু আর খাসিটা প্রায় শেষ করে দিয়ে যায়, তার বেলা?

কিন্তু আমার সহি ভাই বেরাদর রা না চাইলেও যুগধর্মের চাপে আমি সেই বেনোজল হয়েই রয়ে যাচ্ছি।

সোসাল সাইটে এসে মুসলিমদের একটি প্রজাতির সাথে আমার পরিচিতি হয়। এরা বেশিরভাগই উচ্চশিক্ষিত এবং প্রতিষ্ঠিত। প্রচন্ডরকম আরএসএস বিরোধী। যখন বানরসেনাদের বিরুদ্ধে লিখতাম, এনারা ফ্রেন্ড রিকোয়েস্টের বন্যা বইয়ে দিতেন।সমস্যাটা শুরু হল যখন এনারা আবিষ্কার করলেন যে ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিজম এর বিরুদ্ধেও আমি লিখে থাকি। অকথ্য গালাগাল, ব্যক্তি আক্রমণ কিছুই বাদ যায় নি। খুঁজেপেতে দেখেছিলুম যে এরা অর্গানাইজড। মূলত শাসকদলের ছত্রছায়ায় থাকেন। ব্যক্তিগত অভিমত হচ্ছে যে এরা খুব ক্ষতিকারক ভাইরাস।

অবশ্য, এই প্রজাতিদের সংখ্যাগুরুর মধ্যেও দেখা যায় প্রবলভাবে। তারা ইস্লামিক ফান্ডামেন্টালিজম এর বিরুদ্ধে সোচ্চার কিন্তু আরএসএস তাদের কাছে একটি উপকারী সংগঠন মাত্র।

সংখ্যাগুরুর আরশি

জেনারেল বিপিন রাওয়াত কে অধ্যাপক পার্থ চ্যাটার্জি জালিয়ানওয়ালাবাগের কুখ্যাত জেনারেল ডায়ারের সাথে তুলনা করেছেন বলে বানর সন্তানদের বিস্তর গোঁসা হতে দেখছি।'জাস্টিসিয়া' ভাস্কর্যটি যখন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টে আবার পুনঃস্থাপিত হল তখনও এভাবেই কিছু ছাগ সন্তানদের গোঁসা হতে দেখেছিলাম।সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে বিপিন রাওয়াত জানিয়েছেন যে এ বিষয়ে তিনি কোনো প্রতিক্রিয়া দেবেন না। তার মতে মানুষই শ্রেষ্ঠ বিচারক। এবং একটি বাক্য যোগ করেছেন যেটি কোট করছি- "সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তই সঠিক বলে গণ্য হবে।"(*এই সময়* । ৯ জুন, ২০১৭)

শেষের বাক্যটি ভাবাচ্ছে। সংখ্যাগরিষ্ঠই কি তাহলে শেষকথা?

বাংলাদেশে হেফাজত দেশ থেকে সমস্তরকম মূর্তি

অপসারণের দাবি তুলেছে। আশংকার বিষয় হল হয়ত দেখা যাবে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই তাইই চান। তা চাইলেই কি সেটা বৈধ হয়ে দাঁড়াবে?

আরেকটা বিষয় হল এই যে সংখ্যাগরিষ্ঠের চাওয়াটাই হয়ত আপাত বৈধতা পায় এবং স্বাভাবিক বলে গণ্য হয়।

আমার শহর বহরমপুরে মোহন মোড়ে একটা হনুমান মন্দির গজিয়ে উঠেছে। এবং সেটা রাস্তা দখল করে স্থায়ী কাঠামো গড়েই। এই শহরের সর্বজন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক দার্শনিক রেজাউল করিম (কথিত আছে যে গার্লস কলেজে সরস্বতী পূজোর পর অনুষ্ঠিত ব্রাহ্মণ ভোজনে এনাকে সর্বাগ্রে বসানো হত) এর মূর্তিটা প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে মন্দিরের আড়ালে। পৌরসভার হেলদোল নেই। সব্বাই এটাকে স্বাভাবিক বলেই ধরে নিচ্ছে। জাস্ট ভাবছিলাম ওখানে একটা মসজিদ গড়ে উঠলে কি রিঅ্যাকশন হত?

সংখ্যালঘুকে কি তাহলে সংখ্যাগুরুর স্বার্থ মেনে চলতে হয়? প্রশ্নটা গোলমেলে। আমার শহরেই থাকেন জিনাত রেহেনা ইসলাম। কবি। পেশায় শিক্ষিকা। ঘোর নাস্তিক। কিন্তু তিনি চাইলেই তো আর হচ্ছেনা। তিনিও মাঝেমধ্যে ভুলে যান যে তার একটি আরবি নাম আছে। তাই তিনি খোদ বহরমপুরেই সতীমার গলিতে ফ্ল্যাট কিনতে পান না। স্থানীয় বিধায়কের কাছে গেলে তিনি জানান যে ওখানে জাগ্রত মন্দির আছে, তাই কোনো মুসলমান কে ফ্ল্যাট বিক্রি করা যাবেনা।

এ প্রসঙ্গে মনে পড়লো, মুসলমানেরও পরিচয়সূচক ছাপ্পা থাকে। বহু জায়গায় শুনেছি, 'তুই মুসলমান, কিন্তু তোকে তো আমাদের মতই মনে হয়'।

মুসলমানেরা তাহলে ক্যামন হয়? মুসলমান মানেই কি জোব্বা, মাথায় টুপি আর দাড়ি? ঈদের বিজ্ঞাপনে বিপণীগুলি যে কুর্তা-পাজামা আর বোরখাপরা মুসলিম দম্পতির ছবি দিয়ে টাইপকাস্ট করে যায়, তার সাথে কতটা মিল আছে বাংলার মুসলমানেদের?

বাংলার মুসলমান মানেই কি তালিবানি ফতোয়াবাজে বিশ্বাসী ধর্মান্ধ একটি প্রজাতি? তারা কি সকাল বিকেল গোস্ত-রুটি খায়? চারটে করে বিবি পোষে এবং গুচ্ছের বাচ্চা পয়দা করে?

আমার পরম সুহৃদ অম্লান জানিয়েছিলেন যে সংখ্যাগরুর একটা অংশ মুসলিমদের সম্পর্কে ঘৃণা পোষণ করে। সে ঘৃণার কারণ বা যথার্থতা নিয়েও তারাও ওয়াকিবহাল নয় হয়ত কিন্তু তাতে ঘৃণার ভাগটা কম পড়েনা।

আমার প্রথম চাকরি একটি বহুজাতিক সংস্থায়। সেখানে আমার এক সহকর্মী কথায় কথায় একদিন বললেন,

"তোদের বাড়িতে কি রোজই বিরিয়ানী মাংস হয়?"

বাংলার মুসলমানও ডাল-ভাত খায়। দুদিন পরপর বিরিয়ানী খেলে তাকেও হজমের অসুধ খেতে হয়। স্বভাবতই সে মঙ্গল গ্রহ থেকে আসেনি, এইটাই অনেকে বোঝেন না বা বুঝে উঠতে চান না।

একটা কথা বরাবরই শুনে আসছি যে মুসলমানেরা নাকি গরু ছাগলের মতন বাচ্চা বিয়োয়। গুজরাত গণহত্যার পর রিফিউজি ক্যাম্প গুলোকে বাচ্চা বিয়োনোর কারখানা বলেছিলেন এক ৫৬ ইঞ্চি ছাতির নেতা। আরেক ধর্মীয় নেত্রী তো কুকুরের সাথে তুলনা করেছিলেন।

২০১১ এর সেন্সাস অনুযায়ী মুসলিমদের জন্মহার ৪.৯% কমেছে যেটা ভারতের ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সবথেকে বেশি (*http://indianexpress.com/article/opinion/columns/myth-of-muslim-growth/*)।সাচার কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতের মুসলিমদের একটা বড় অংশই অশিক্ষা আর দারিদ্র্যের মধ্যে ডুবে আছে। পরের কোনো কিস্তিতে এ সংক্রান্ত তথ্য দেবার ইচ্ছে রইলো।পরিবার পরিকল্পনা না থাকার কারণ কি ধর্ম নাকি দারিদ্র্য-অশিক্ষা এবং সচেতনতার অভাব?

আদ্যন্ত চাষীবাড়ির সন্তান আমার আব্বারা পাঁচ ভাইবোন। আব্বা লেখাপড়া শিখেছেন। প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। আমরা দুই ভাই। আমার দু নম্বর চাকরি'তে এক সহকর্মী ছিলেন ভজন রজক। নদীয়ার এক গ্রামে বাড়ি। তারা পাঁচ ভাইবোন। ভজন লড়াই করে উঠে এসে আজ প্রতিষ্ঠিত। তার কিন্তু একটাই সন্তান।

এখনকার সময়ে কটা শিক্ষিত সচেতন মুসলিম পরিবারে তিন-চারটে সন্তান দেখা যায়? তাহলে দারিদ্র্য-অশিক্ষা জনিত অসচেতনতার কুফলকে ধর্মের ট্যাগে দাগিয়ে দেওয়ার রাজনীতিটা কার স্বার্থে করা হয়?

কোনো সভ্যশিক্ষিত দেশেই তিন তালাক বা বহুবিবাহের মতন প্রথা থাকা উচিত নয়।আর সিলভার লাইনিং টা হচ্ছে যে এর বিরুদ্ধে মুসলিমদের মধ্যে থেকেই আওয়াজটা উঠছে।

ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি অথবা রাজনীতির ভোটব্যাঙ্ক

কিছুদিন আগের কথা, জনৈক গোমাতার সন্তান দেখলাম পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে মমতাজ বেগম বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ তিনি নাকি খালি মুসলমানেদেরই দ্যাখেন।তাই বাংলার সব মুসলমান তাকেই ভোট দ্যায়। এর আগে বলা হত বাংলার মুসলমানেরা খালি সিপিএম কে ভোট দ্যায়। তারও আগে মুসলমানেরা শুধু কংগ্রেস কেই ভোট দিত।

অথবা অধিকাংশ মুসলমান মিলে যেহেতু এককাট্টা হয়ে ভোট দ্যায়, তাই তারা তথাকথিত ভোটব্যাঙ্ক। সহজ সমীকরণ। অংক শেষ।

তাই কি? আমার বাড়ি মুর্শিদাবাদ। বিদ্বেষের বিষ ছড়ানোর অন্যতম কারিগর শ্রী রন্তিদেব ধারাবাহিক কলামে যে জেলার মুসলমানেরা হিন্দুদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার নামিয়ে মোগলিস্তান গড়ার চেষ্টায় রত আছে বলে প্রচার করছিলেন এককালে সেই জেলার লোক।

মুর্শিদাবাদে ৬৭% মুসলিম। এখানে অ্যাদ্দিন লড়াইটা হত সিপিএম কংগ্রেসের মধ্যে। এবং সেটা হাড্ডাহাড্ডি। এখন মাথা গলিয়েছে তৃণমূল।মুসলিম ভোট যদি একচেটিয়া হয়ে একটি দলই পেত, তাহলে বাকি দলগুলি লড়াইতেই আসতো না। শেষ বিধানসভা ভোটেও সিপিএম,কংগ্রেস, তৃণমূল তিনটি দলই আসন পেয়েছে (ঘোড়া কেনাবেচা বাদে, অবশ্যি ঘোড়ারাও অ্যাতো নিল্লর্জভাবে বিকোতো কিনা সন্দেহ)।

প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি সবাই যদি মুসলিম ভোট পেয়ে থাকে তাহলে 'মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক' কথাটা আসে কোত্থেকে?

মুসলিমরা মূলতঃ বিজেপিকে ভোট দেয়না বলেই কি এই ভোটব্যাঙ্কের ধারণার উৎপত্তি? জামাত বা মুসলিম লীগের মতই বিজেপি একটি নির্দিষ্ট ধর্মকে এনডোর্স করে। সেই ধর্মের ভিত্তিতে তারা বিভেদ আর বিদ্বেষের বিষ ছড়ায়।জামাত কে যে যুক্তিতে ভোট দেওয়া উচিত নয়, সেই একই যুক্তিতে কোনো শিক্ষিত সচেতন মানুষেরই বিজেপিকে ভোট দেওয়া উচিত নয়।

আরেকটা প্রচলিত ধারণা হচ্ছে যে অমুক ইমাম বা তমুক পীরজাদা বাংলার মুসলিম ভোট নিয়ন্ত্রণ করেন।হামেশাই দেখা যায় যে অমুক ইমাম বা তমুক পীরজাদা রাজনৈতিক দলের নেতানেত্রীর পাশে বসে বাণী দিচ্ছেন যে এই পলিটিক্যাল খচ্চরটাই বাংলার মুসলমানদের ভরসা এবং বাংলার মুসলমানেদের একেই ভোট দেওয়া উচিত।

বাস্তবে এনাদের ভোটের চালচিত্রে কোনো প্রভাব নেই। কাজের সুবাদে খুব প্রান্তিক গ্রামে গিয়েও দেখেছি অশিক্ষিত দরিদ্র মুসলমান হাতে বা কাস্তেতে বা ঘাসফুলে ভোট দ্যায়, দলের পক্ষ নিয়ে জ্ঞাতিগুষ্ঠির সাথে মারপিট করে জেলে যায় কিন্তু অমুক ইমাম বা তমুক পীরজাদার কথায় নাচেনা।

এও শোনা যায় যে মুসলমানেরা নাকি ধর্ম দেখে ভোট দ্যায়। তথাকথিত মুসলিম ব্রাদারহুডের নামে। অ্যামনটা দাবি করছিনা যে ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে ধর্মীয় সুড়সুড়িটা ম্যাটার করেনা। নিশ্চয়ই করে। কয়েকটা লোকসভা আগে মুর্শিদাবাদেই বাম ক্যান্ডিডেট মইনুল হাসানের লেখা বই এর একটি নির্দিষ্ট পাতা লিফলেট আকারে বিলি করেছিল বিরোধীদল। মইনুল হাসানকে ইসলাম বিরোধী প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছিল। এবং তার প্রভাবও ভোটের বাক্সে পড়েছিল।

কিন্তু এটা সামগ্রিক উদাহরণ নয়। আংশিক মাত্র। ৬৭% মুসলমানের বাস জঙ্গীপুর লোকসভাতে জেতেন বামুন সন্তান অভিজিৎ মুখার্জি।সেখানে মুসলিম দলগুলি সরাসরি প্রার্থী দেওয়া সত্ত্বেও।

এবার মুর্শিদাবাদ আর মালদার পাঁচটা লোকসভা আসনের ভোটের একটু তত্ত্বতালাশ করবো। এই পাঁচটি আসনেই মুসলিম ধর্মীয় দলগুলি প্রার্থী দিয়েছিল।এই জেলাদুটি বেছে নেবার কারণও আছে। কারণ আরএসএস ধারাবাহিকভাবে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে যে এই জেলাদুটিতে যেহেতু সংখ্যাগুরুরাই মুসলমান, অতএব তারা পাকিস্তানপন্থী।

মুর্শিদাবাদ জেলাতে লোকসভা আসন তিনটে- বহরমপুর, জঙ্গীপুর এবং মুর্শিদাবাদ। ৬৭% পপুলেশন মুসলমান। বহরমপুরে বিজয়ী প্রার্থী অধীর চৌধুরী। জামাত এ শেরাতুল মুস্তাকিম আর ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ এবং মুসলিম ঘেঁষা এসডিপিআই, তিনটে দল মিলে মোট ভোট পেয়েছে ২০৮৩৩। আর চতুর্থ স্থানে থাকা বিজেপি প্রার্থী একাই পেয়েছেন ৮১৬৫৬ টি ভোট।

জঙ্গীপুর লোকসভাতে বিজয়ী প্রার্থী অভিজিত মুখার্জি।মুসলিম ঘেঁষা এসডিপিআই, ডব্লিউপিআই আর জামাত এ শেরাতুল মুস্তাকিম, তিনটে দল মিলে মোট ভোট

পেয়েছেন ২৯০৫১। আর চতুর্থ স্থানে থাকা বিজেপি প্রার্থী পেয়েছেন ৯৬৭৫১ টি ভোট।

মুর্শিদাবাদ লোকসভাতে জয়ী প্রার্থী বদরুদ্দোজা খান।মুসলিম ঘেঁষা এসডিপিআই,ডব্লিউপিআই,ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ আর এআইইউডিএফ, চারটে দল মিলে মোট ভোট পেয়েছে ২৯১৭১। আর চতুর্থ স্থানে থাকা বিজেপি প্রার্থী পেয়েছেন ১০১০৬৯ টি ভোট।

৬৭% মুসলমানের জেলার মুসলমানেরা সরাসরি ধর্ম-যুক্ত দলগুলিকে মোট ভোট দিয়েছে ৭৯০৫৫ টি। আর ৩২% হিন্দু অধ্যুষিত এই জেলাতে বিজেপি ভোট পেয়েছে ২৭৯৪৭৬ টি, প্রায় সাড়ে-তিনগুণ।

এরপরেও শুনতে হবে শুধু মুসলমানেরাই ধর্ম দেখে ভোট দ্যায় আর খালি মুসলিম ভোটব্যাঙ্কই হয়?

মালদা'তে আসি। লোকসভা আসন দুটো। মালদা উত্তর আর মালদা দক্ষিণ।

মালদা উত্তরে জিতেছেন মৌসম নূর। সেখানে মুসলিম ঘেঁষা ডব্লিউপিআই আর এআইইউডিএফ মিলে ভোট পেয়েছে ১১৭৭৮ টি। চতুর্থ স্থানে থাকা বিজেপি প্রার্থী পেয়েছেন ১৭৯০০০ টি ভোট।

মালদা দক্ষিণে জিতেছেন আবু হাসেম চৌধুরী।মুসলিম ঘেঁষা দল এআইইউডিএফ, এসডিপিআই, জামাত এ শেরাতুল মুস্তাকিম আর ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ মিলে ভোট পেয়েছে ৪০৮১৮টি। দ্বিতীয় স্থানে থাকা বিজেপি প্রার্থী পেয়েছেন ২১৬১৮১টি।

মালদা তে সবকটি মুসলিম ঘেঁষা দলগুলির মোট প্রাপ্ত ভোট ৫২৫৯৬টি। আর হিন্দুত্ববাদী বিজেপি পেয়েছে ৩৯৫১৮১ টি।প্রায় সাড়ে-সাত গুণ বেশি।

ধর্মের সুড়সুড়িতে খালি মুসলমানেরাই ভোট দেয়না। কিন্তু অপবাদটা শুধু মুসলমানেদেরই জোটে ক্যানো?

কিন্তু এটাই কি একমাত্র ব্যখ্যা? না আরও ব্যখ্যা আছে?

গত কয়েকটি ভোটে বিজেপির ভোট বাড়ছে। আচমকা কিন্তু বিজেপির ভোটার রা জন্ম নেয় নি। এদের অধিকাংশই অন্য দলের ভোটার ছিলেন। এদের অনেকেই বহু আগে থেকেই ভিতরে ভিতরে বিজেপি মাইন্ডেড ছিলেন। কিন্তু বিজেপি ভোটে জেতার মতন অবস্থায় ছিলনা বলে এরা অন্য কাউকে ভোট দিতেন।এখন বিজেপি জেতার জায়গায়, তাই বিজেপিকে প্রকাশ্যেই ভোট দিচ্ছেন।

তাহলে কি মুসলিম ভোটার দেরও একই পরিণতি হবে? মুসলিম ধর্মীয় দলগুলো যেভাবে শক্তিসঞ্চয় করছে তাতে এই আশংকার যথেষ্ট কারণ থাকছে।

শেষকথা

এই প্রবল মেরুকরণের হাওয়ায় জামাত আর আরএসএস দাঙ্গার উস্কানি ছড়াচ্ছে গোটা বাংলায়।শিক্ষা,স্বাস্থ্য,কর্মসংস্থানের মতন জরুরি প্রশ্নগুলিকে বাদ দিয়ে সচেতনভাবে মন্দির,মসজিদ,গরু নিয়ে মানুষকে ব্যস্ত রাখার অপপ্রয়াস চলছে।রুখে দাঁড়ানোটা নিজের স্বার্থেই দরকার। আগুন লাগলে সেটা যে কারুর ঘর বেছে পোড়াবেনা সেই সারসত্যটা বোঝা প্রয়োজন।শুভ ইঙ্গিত এইটাই যে এত প্ররোচনা সত্ত্বেও দেশের যুবশক্তির একটা বড় অংশই ধর্ম রাজনীতির পাতা ফাঁদে পা দেন নি।তারা নিজেদের মতন লড়াই করছেন এই ধর্ম ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে।

সুদিন তাহলে কতদূর ? কে জানে?

in kaali sadiyon ke sar sey jab raat ka aanchal dhalkega

Jab dukh ke badal pighalengey jab sukh ka saagar jhalkegi

Jab ambar jhoom ke nachega jab dharati naghame gayegi

Woh subah kabhi to aayegi...

— সাহির লুধিয়ানী

বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, ২০১৭।

বৃত্তের মধ্যে বৃত্ত

রফিক

প্রথম বৃত্ত

আমার নাম রফিক। পশ্চিমবঙ্গের একটা প্রত্যন্ত গ্রামে আমার বাড়ি। গ্রামের নাম আর দিলাম না কেন না সেটা আপনারা এমনিতেও চিনবেন না।

আমার গ্রামটা মুসলিম অধ্যুষিত। ফলে, সত্যি কথা বলতে কি আমার গ্রামে বা স্কুলে আমি কখনোই সংখ্যালঘু ছিলাম না বরং সংখ্যাগুরুই ছিলাম। তাই ধর্মীয় সংখ্যালঘুর যন্ত্রণা কিন্তু আমি টের পাইনি। আমার সংখ্যালঘুত্ব ছিল অন্য জায়গায়। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।

আমার ছোটবেলার সংকটের কারণ ছিল বরং আমার আব্বার ধর্মচেতনা। আমার ছবি আঁকতে ভালো লাগত। ওই ছোটরা যেরকম ছবি আঁকে আর কি। বাড়ি, পাহাড়, সূর্য, গাছ। একবার স্কুলের কম্পিটিশনে প্রাইজ পেলাম। বাড়ি ফেরার পর আব্বু আমায় খুব বকল। বলল, ছবি আঁকা না কি শয়তানের কাজ। আব্বু আমার রং-তুলি সব ফেলে দিল। সেই প্রথম আমার স্বাভাবিক প্রকাশের সাথে আব্বুর ধর্মবিশ্বাসের সংঘাত শুরু হল। পরবর্তীকালে সেই সংঘাত আরও বেড়েছে বই কমে নি।

আব্বু আমায় ভালো স্কুলেই পড়িয়েছিল। সেই স্কুলে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাজকর্ম হত। আমাদের সপ্তাহে দু দিন গানের ক্লাস হত। আমার গান করতে খুব ভালো লাগত। কিন্তু আব্বু বলল, ইসলামে গান গাওয়াও না কি হারাম। আমাকে গান গাইতে বারণ করা হল। দুটো মাত্র ক্লাস করতে পেরেছিলাম। তারপর বাড়িতে খবর চলে আসে। খুব অশান্তি হয়েছিল। তারপর থেকে চার বছর গানের ক্লাসে আমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতাম। বুঝলাম আমার প্রকৃতির সঙ্গে আব্বুর এই সংঘাত চলতেই থাকবে।

আমি প্রথম আব্বুর ওপর গলা তুলে কথা বলি যখন আমার পনেরো বছর বয়স। আমি লাইব্রেরি থেকে এনে গল্পের বই পড়তে ভালোবাসতাম। একদিন আব্বু তা দেখতে পেয়ে আমার বই ছিঁড়ে ফেলে দিল। অনেক আজেবাজে কথা বলল। আমি কেঁদে ফেলেছিলাম।

নিজের স্বতঃস্ফূর্ত স্বভাবের সাথে এই ক্রমাগত সংঘাতে আমি আস্তে আস্তে ডিপ্রেশানে চলে যাচ্ছিলাম। বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছনোর পর এর সাথে যোগ হল অন্য অ্যালিনিয়েশন। আমি বুঝলাম আমি আমার সমবয়স্ক অন্য ছেলেদের থেকে আলাদা। আমার স্বপ্নে যারা আসে, তারা নারী নয়, পুরুষ। আমি নিজেকে লুকিয়ে রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করতাম। এই নিজের ভেতরের টানাপোড়েনে আমি পড়াশুনো করতে পারছিলাম না। বারবার ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিলাম। ক্লাস ইলেভেনে একেবারে শেষের দিকে র‍্যাংক হলো। সেই সময় আমার জীবনে এল আমার প্রথম প্রেমিক। আমারই ক্লাসের সহপাঠী। যেন নতুন করে জীবনের মানে খুঁজে পেলাম। নিজেকে ভালবাসতে পারলাম। পড়াশুনোয় মন ফিরে এল। ক্লাসে অনেক ভালো রেজাল্ট করলাম। এমনকি আমার প্রেমিকের থেকেও অনেকটা ভাল। সেই অল্প বয়সে আমার প্রেমিক সেটা মেনে নিতে পারল না। ও আমাকে ডাম্প করে দিল।

প্রথম প্রেম ঘুচে যাওয়ার কষ্ট সবাই জানেন, নতুন করে বলবার কিছু নেই। বলার কথা এইটাই যে আমি আক্ষরিক অর্থেই আহার নিদ্রা ত্যাগ করলাম। সাতদিন টানা কিছু খাই নি, জল পর্যন্ত না। শেষমেশ আমাকে হসপিটালে ভর্তি করতে হল। অবস্থা খুব সিরিয়াস হয়ে যাওয়ায় আমাকে সাইকিয়াট্রি ডিপার্টমেন্টে পাঠানো হল। সেখানকার ডাক্তাররা আমায় বললেন আমার মনের সব কথা খুলে বলতে। তাঁরা আমাকে গোপনীয়তার আশ্বাস দিলেন। আমি আমার সমস্ত যন্ত্রণার কথা খুলে বললাম। কিন্তু তাঁরা তাঁদের কথা না রেখে আমার বাড়িতে সব জানিয়ে দিলেন। আমি আমার ধর্মীয় রক্ষণশীল বাড়িতে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আউট হয়ে গেলাম।

দ্বিতীয় বৃত্ত

যতটা ভয় পেয়েছিলাম আব্বুর প্রতিক্রিয়া কিন্তু তেমন হল না। আব্বু খুব শান্তভাবেই ব্যাপারটা নিলেন। বললেন, আল্লাহকে ডাকো, তিনিই তোমাকে পাল্টিয়ে দেবেন। আমি মনপ্রাণে প্রার্থনা শুরু করলাম। প্রচুর চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না দেখে আস্তে আস্তে ফ্রাস্টেটেড হয়ে যাচ্ছিলাম। তারপর ইন্টারনেট ঘেঁটে পড়াশুনো শুরু করলাম। দেখলাম আর বুঝলাম, সমকামিতা একটা স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। তাতে লজ্জা পাওয়ার বা লোকানোর কিছু নেই।

ভাবলাম, আব্বুকে এইসব দেখিয়ে বোঝালে কাজে দেবে। কিন্তু হিতে বিপরীত হল। আব্বুর এতদিনের শান্তভাব চলে গেল। আব্বু আমাকে নোংরাভাবে অ্যাটাক করল। বলল, আমার ওপর শয়তান ভর করেছে। আমার যাবতীয় বন্ধুদের নিয়ে সন্দেহ করা শুরু করল। কথায় কথায়, ছোটখাটো ভুলে আমার যৌনতা নিয়ে আমায় খোঁটা দেওয়া শুরু করল।

আমি এর মধ্যে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিলাম। আমার কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়ার ইচ্ছে ছিল। একটা র‍্যাঙ্কও এল। কিন্তু আব্বু আবার তাঁর ইচ্ছে আমার ওপর চাপিয়ে দিল। নিজের অনিচ্ছায় এবং আব্বুর ইচ্ছেয় মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হলাম।

এইখানেই প্রথম বুঝলাম আমি শুধু যৌন সংখ্যালঘুই নই, আমি ধর্মীয় সংখ্যালঘুও বটে। এক কাঁটাতারের বাইরে আরেকটা কাঁটাতারের গন্ডী তৈরি হল। বাইরে না ভেতরে? কে জানে।

তৃতীয় বৃত্ত

কলেজ হস্টেলে একদিন আমাকে আমার রুমমেটেরা জিজ্ঞেস করল আমি বিফ খাই কি না। আমি যথারীতি উত্তর দিলাম, হ্যাঁ খাই। তারপর বেশ কিছু অস্বস্তিকর প্রশ্ন। কেন খাই, কিভাবে খাই, না খেলে কি হয়, ইত্যাদি। না, আমি বলছি না যে তারা আমাকে কোনও মারধোর করেছিল বা কোনও খারাপ কথা বলেছিল। কিন্তু এইসব খুঁটিয়ে করা প্রশ্নগুলো তাদেরকে আমার থেকে কেমন যেন দূরে সরিয়ে দিল। আমি প্রথমবার বুঝতে পারলাম আদারাইজেশন কাকে বলে। এইসব আপাতনিরীহ প্রশ্নগুলো যেন আন্ডারলাইন করে দিল, আমি ওদের থেকে আলাদা। এর বাইরে ওইসব খুব কমন কথাবার্তা তো আছেই। যেমন, "তোমায় দেখে বোঝাই যায় না যে তুমি মুসলিম" অথবা "ও, তুমি বাঙালি, তাহলে তোমার নাম এরকম মুসলিম মুসলিম কেন?" ইত্যাদি।

এই আদারাইজেশন আমি এলজিবিটি সমাজের ভেতরেও দেখেছি। অনেক সময় সেটা অকারণ প্রশংসা সূচকও হয়। তার একটা অত্যন্ত বিদঘুটে উদাহরন দেই। আমি মুসলিম এটা জানার পর যেমন একজন বলেছিল, "ওয়াও, তুমি মুসলিম। মুসলিমরা শুনেছি ভীষণ ভালো সেক্স করে।" হাসবেন না, এমন কথা আপনার চারপাশে অনেকেই বলেন, হয়তো আপনিও। যেমন, "মুসলিমরা খুব অপরিচ্ছন্ন হয়", "গে-রা পার্ভার্ট হয়" ইত্যাদি। আবার প্রশংসাসূচক জেনেরালাইজেশনও আছে। যেমন "গে-রা খুব ভালো ঘর সাজায়" বা "ও, তুমি তো মুসলিম, কবে বিরিয়ানি খাওয়াবে বল।" এগুলোও কিন্তু দূরে ঠেলে দেওয়ার প্রকরণ।

এইসবের মাঝে জীবনে আরও অনেক ওঠাপড়া হল। এক ওঝা-পীরের কথায় আব্বু আমার বিয়ে দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। বিয়ে হলে না কি আমি "ঠিক" হয়ে যাব। আমি মাকে অনেক বোঝালাম। বললাম, যদি আমার বোনের বিয়ে আমার মত এরকম কোনও ছেলের সাথে হত তবে তোমার কেমন লাগত? মা একটু একটু করে বুঝতে শুরু করল কিন্তু আব্বু আরও রেগে যেতে লাগল। বলতে লাগল, আমি না কি বেশি শিক্ষিত হয়ে গিয়েছি। এখানে একটা কথা বোঝা দরকার। আমাদের গ্রামে আমিই প্রথম যে সায়েন্স নিয়ে পড়েছে। সব মিলিয়ে হয়তো জনা দশেক গ্র্যাজুয়েট পাওয়া যাবে। তাই আব্বুর মুখের এই কথাগুলোর প্রেক্ষাপটটা বুঝতে পারতাম। আচ্ছা, শিক্ষাও কি কাউকে সংখ্যালঘু করে দেয়?

আর এই ক্রমাগত চাপ সহ্য করতে পারছিলাম না। একসময় বাধ্য হয়ে বাড়ি থেকে পালালাম। কোথায় যাব জানি না। কিভাবে যেন গিয়ে পৌঁছলাম মুম্বাই। কন্সট্রাকশন ওয়ার্কারের কাজ নিলাম বেঁচে থাকার জন্য। সেখানে খুব কাছ থেকে দেখলাম শোষণের আরেক রূপ। তবে সেইসব গল্প তোলা থাক অন্য আরেকদিনের জন্য।

সুপ্রিম কোর্ট হোমোসেক্সুয়ালদের বলেছিল মিনিস্কিউল মাইনরিটি। আমাদের মত মানুষদের জন্য কি বলবে জানি না। ন্যানোস্কেল মাইনরিটি? সংখ্যালঘুতর? ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ?

জানি না। এখন এইসব কথা ভাবতে গেলে মাথায় খুব চাপ পড়ে। পুরোনো কথা মনে করতে গেলে মাথায় এতটাই চাপ লাগে যে মনে হয় মাথাটা যেন প্রেশার কুকার হয়ে গেছে, এক্ষুনি সিটি দেবে। তাই আজ এখানেই থামলাম।

ভালো থাকবেন।

কালক্রম : গান শেখা নিয়ে অশান্তি, ক্লাস ওয়ান থেকে ফোর, ২০০০-২০০৪।

মাধ্যমিক: ২০১১, মুম্বাই: ২০১৭ থেকে এখন।

ঘটনাক্রম অপরিবর্তিত কিন্তু নাম পরিবর্তিত। রফিকের সাথে কথোপকথোনের ভিত্তিতে অভিজিত মজুমদার দ্বারা অনুলিখিত

স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

নমস্কার, আপনারা কেউ আমাকে চেনেন না। এমনকি, যাঁরা আমার আশেপাশে থাকেন, তাঁরাও আমাকে ঠিক মতন জানেন না। কারণ, আমার একটি গুপ্ত বৈশিষ্ট্য আছে। এমন একটি বৈশিষ্ট্য, যা আমি দীর্ঘকাল ধরে নিজের মধ্যে দাবিয়ে রেখেছি; আমার এমন একটি অপ্রকাশিত পরিচয়, যা আমি প্রকাশ করতে চাই। আমি প্রকাশ করতে চাই আমার সত্তাকে, স্বীকার করতে না। নিজের প্রকৃত পরিচয়কে স্বীকার করবার কথা জানালে, আমার নিজেকে অপরাধীর মতন শোনাবে। দীর্ঘকাল ধরে আমার গভীরে আটকে রাখা আমার প্রকৃত পরিচয়কে আমি মুক্ত করতে চাই, এবং সেই কারণে সবার প্রথমে আমার নিজেকে, নিজের কাছে মুক্ত হতে হবে। সুতরাং, আমার আসল পরিচয় হল —

আমি সমকামী।

হ্যাঁ, আপনারা ঠিক পড়েছেন, আমি একজন সমকামী। আপনারা যা ইচ্ছা বলতে পারেন আপনার সেই সব বন্ধুদের যারা প্রচলিত সামাজিক কাঠামোর বাইরে ছিটকে গিয়ে তথাকথিত স্বাভাবিক সামাজিক চরিত্রের পরিবর্তে, ভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে - টুইলাইট দেখা উচিৎ নয়; দুর্গন্ধযুক্ত অশ্লীলতার সীমা পার করা উচিৎ নয়; ইত্যাদি। কিন্তু আমি, খোলা-মনে মুক্ত চিন্তায়ে, দ্বিমত পোষণ করে প্রকাশ করছি - আমি সমকামী। প্রকৃত অর্থে, "যে ব্যক্তি শারীরিক দিক দিয়ে নিজের সমলিঙ্গের ব্যক্তিদের প্রতি আকৃষ্ট হয়"।

হ্যাঁ, IIT মাদ্রাজে সমকামীরা আছে। বলা বাহুল্য, প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই আছে, প্রত্যেক স্থানে সমকামীরা আছে। বিস্ময়ের কিছু নেই, প্রকাশ না করলে আপনারা আমাদের আপনাদের মতই স্বাভাবিক মনে করেন। কিন্তু আমরা আপনাদের ছদ্মবেশে মন্দ কাজ করে বেড়ানো ছদ্মবেশী, তাই নয় কি? এবং আমরা খুবই চতুর।

সমকামিতার গম্ভীর রূপটা কলেজে, হাসি-ঠাট্টার বহিঃপ্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই না। তুমি যাকে-তাকে গে বলে মজা করো, তুমি বলো তোমার কোন বন্ধু সমকামী হলে তাতে তোমার কিছু আসে-যায় না, কারণ তুমি, ওহঃ, খুউব মুক্তমনা, যুক্তিবাদী, শিক্ষিত আধুনিক, তুমি তোমার কোন বন্ধুকে অন্য কোন পুরুষের সাথে জড়িয়ে হালকা মজা-মস্করা করলে (যদিও আজকাল প্রায় আমাদের সাধারণ কথাতর্বায় সমকামিতা নিয়ে আলোচনা আপনাআপনিই চলে আসে) কিন্তু গভীরে তুমি জানো সে সমকামী নয়। তারপর কুড়ি বছর পার করে যখন রিইউনিয়ানে দেখা হয়, তখন তুমি তার স্ত্রীর কাছে গিয়ে হাসতে হাসতে মজা করে বললে, তার বর একজন সমকামী।

আমি আমাদের দেশের গর্ব IIT-র কথাই বলেছি।

সমকামিতার ধারণাটা খুবই জটিল, এমনকি আমাদের কাছেও। এটা একটা ভয়ংকর অভিজ্ঞতা হতে পারে। আবার কখনো মনে হয় তোমাকে এমন এক অপরাধের অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করা হল, যে অপরাধ তুমি কখনো করোই নি; আর এর পর থেকেই তোমার আশেপাশের লোকজন তোমাকে দেখেও অদেখার ভান করে চলেছে, এড়িয়ে চলেছে। ঈশ্বর তোমাকে এক গুপ্ত বৈশিষ্ট্য দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, এই লুকোনো সত্তাকে কীভাবে সারা জীবন আটকে রাখা যাবে, তার কোন সুনির্দিষ্ট বিধান নেই। তুমি মনে করো সমকামিতা পাপ, কারণ সংস্কৃতিবান আধুনিক ভারতের প্রাচীন রীতিনীতি তোমাকে তাই বলছে। এই রকম অবস্থায় ইন্টারনেটটাই তোমার একমাত্র বন্ধু যেখানে হাজার একটা ফোরামে বিভিন্ন লোক তোমার সমর্থনে, সমকামিতার সমর্থনে দিন রাত্রি ডিবেট করে চলেছে কিন্তু দুর্ভাগ্য, কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিদের কাছ থেকে এইরূপ কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। আমার মনে আছে, একবার আমি আমার এই 'অসুস্থতা' সম্পর্কে প্রচণ্ড ভাবে মানসিক দিক দিয়ে ভেঙে পড়ে এক খ্রিস্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে মেইল করি, ভেবেছিলাম, তাঁরা আমাকে কোন যুক্তিপূর্ণ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান বলবেন। আমি কি উত্তর পেলাম - ধর্মগ্রন্থ থেকে তুলে দেওয়া হাজার একটা কোট-আনকোট ধর্মীয় বচন। আমাকে বাধ্য করা হল স্বীকার করতে যে আমি দোষী এবং, আমার অপরাধের জন্য আমাকে ক্ষমা চাইতে বলা হল। তখন আমার তেরো বছর বয়েস। যে অপরাধ আমি কখনও করিনি,

সেই অপরাধের গ্লানি, লজ্জা, হীনমান্যতা আমাকে নিজের মধ্যে কুঁকড়ে দিল, বিষমকামী ব্যক্তিরা নিজেদের ভাগ্যবান মানুন, এই গ্লানির তাপ আপনাদের কখনো ভোগ করতে হবে না। অনেক সময় লেগেছিল আমার (সম্ভবত প্রায় তিন বছর) এই গ্লানি, হীনমান্যতা কাটিয়ে নিজেকে স্বাভাবিক মনে করতে। আর যখন আমি নিজেকে সাধারণ স্বাভাবিক মানতে পারলাম এক অকল্পনীয় অভূতপূর্ব আনন্দ পেয়েছিলাম। অবশ্যই সাময়িক সময়ের জন্য এক অপূর্ব আনন্দ।

এটা সেই সময়ের কথা যখন আমারা সবাই দিন-রাত্রি এক করে JEE-র জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। হ্যাঁ, সেই দুটি কঠিন বছর, বিষমকামীরাও হয়তো এই সময় এমন এক দুশ্চিন্তায়ে ভোগে যার জন্য কাউকে দোষারোপ করা যায় না। এই রকম পরিস্থিতিকে বলা যেতে পারে কি, কোন ব্যাতিক্রম বিষয়ের দুশ্চিন্তা নির্দিষ্ট কোন কিছুর উপর নির্ভর করে না।

এই সময়ে আমি এক বিষমকামীর প্রেমে পড়ি (আপনারা কি বুঝতে পারলেন শুনতে কতটা খারাপ লাগে যখন একটা গোটা 'সাধারণ মানুষকে' শুধুমাত্র তার যৌনতার উপর নির্ভর করে পরিচয় দেওয়া হয়)। সে যখনই আমাকে ত্রিকোণমিতির প্রশ্ন নিয়ে ফোন করত, আমার সঠিক উত্তর জানা না থাকলেও তিরবেগে ছুটে যেতাম ওর সাথে কথা বলতে। একমাসের ভিতরে এক ভয়ংকর পরীক্ষা থাকা সত্ত্বেও, এক বিষমকামী পুরুষ কী করে আমার সাথে এক প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলবে, তার চিন্তায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় নষ্ট করেছি। তার পর, একদম শেষে, নিজের কাছে স্বীকার করলাম, হ্যাঁ আমি আরও ভালো পরীক্ষা দিতে পারতাম।

এরপর আসলাম IIT-তে, ওহো, দুঃখিত, IIT-তে যুক্ত হলাম। 'উত্তেজনা' শব্দটি খুবই তুচ্ছ হবে যদি আমি IIT-তে যুক্ত হওয়ার এই কৃতিত্ব এবং একটি উন্নত মেধাযুক্ত জীবনের আশা – এ সকল অনুভূতির বিবরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করি। তোমার চারপাশে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ভরা লোকজন। প্রতিনিয়ত প্ররোচনামূলক লেকচার তোমাকে মনে করিয়ে দেয় এক অপূর্ব আকর্ষণীয় ভবিষ্যৎ তোমার সম্মুখে। তা সত্ত্বেও, বাস্তব বেশিদিন চাপা থাকে না। আমি মোটেও বলতে চাই না আমি আমারই ক্লাসে কীরূপ নিস্তেজ আশাহীন উদাহরণ পেয়েছি, সেটা সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। এখানে এমন কেউ নেই যে নিজেকে সবার সামনে, প্রকাশ্যে সমকামী হিসাবে পরিচয় দিয়েছে। এমনকি, IIT-র মতন প্রতিষ্ঠান যেখানে পাঁচ হাজার কিশোর সমেত বুদ্ধিজীবীদের চাঁদের হাট, সেখানে LGBT সম্পর্কে কোন আলোচনা-পরামর্শ হয় না। এখানে GCU এমন একটা হাইপ দেখানো গ্রুপ যারা শুধু মাত্র নিজেদের ব্যস্ত রাখতে LGBT-কে 'কর্তব্যের প্রতি তাদের অবস্থান'-এর অংশ হিসাবে বেছেছে। যেহেতু সমকামী সম্পর্ক বর্ণনার ক্ষেত্রে এটা যথেষ্ট নয়, এখানে অনেক সিনিয়াররা আছে যারা তোমাকে বিভিন্ন ভাবে লিড করে থাকে, যার ভিতর দিয়ে তুমি সমাজের চাপা দেওয়া অব্যক্ত দিক গুলি সম্পর্কে জানতে পারবে, বিশেষ ভাবে সমকামী ঘৃণা সম্পর্কে – সমকামীদের প্রতি সমধর্মিতার ক্ষেত্রে অত্যন্ত আবশ্যক দিক। ঘটোনাচক্রে GCU-এর এক প্রতিনিধি আত্মসন্তুষ্টির জন্য প্রচার করে, "আমরা এখানে একটি সুস্থ সৌভ্রাতৃত্বমূলক পরিবেশ গঠন করতে চাই, Gays can clear off"। উপস্থিত শ্রোতাদের ভিতর থেকে সাংঘাতিক প্রশংসা আসে। আমার তরফ থেকেও।

আমার বিল্ডিংয়ের স্টুডেন্টরা ভণ্ড ছাড়া কিছুই না, তারা হায় হায় করে চিৎকার করে বলে, 'ডুড, ঐ ছেলে গুলোকে দেখো, হাত ধরে যাচ্ছে, ইয়্যাক...' কিন্তু বিপরীত দিক দিয়ে সমকামী মেয়েদের ক্ষেত্রে তাদের এই প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না, আহ, – IIT এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যারা বিশ্বায়িত দুনিয়ায়, ভবিষ্যৎ লিডারের জন্মস্থান হিসাবে নিজেদের দাবি করে থাকে, কিন্তু উল্লেখযোগ্যভাবে এটি বাদবাকি ভারতের মতোই। তবে সমকামিতার প্রতি ভারতকে কিন্তু কৃতজ্ঞ হওয়া দরকার। আমরাই প্রথম যারা কোন একটা বিষয়ে আলোচনা করবার ক্ষেত্রে সব ধর্মীয় নেতাদের এক আসনে বসাতে পেরেছি।

জয়রাম রমেশ বলেছিলেন, IIT হয়তো তোমাকে ভালো ইঞ্জিনিয়ারিং শেখাতে পারবে না, কিন্তু তোমাকে স্বাতন্ত্র, স্বাবলম্বন এবং স্বাধীন চিন্তাশীল ব্যক্তি হতে শেখাবে। এক বছরেরও কম সময় লেগেছিল আমার ধারণা, "হ্যাঁ, আমি এক বঞ্চিত নিঃসঙ্গ সমকামী, IIT আমাকে স্বীকৃতি দেবে", থেকে "আমি একজন সমকামী এবং আমি অস্তিত্বহীন নই"-তে পালটাতে।

আমি বুঝতে পারছিলাম এখনই সময়। পৌরাণিক গ্রন্থে থাকা স্বর্গীয় আকাশবাণীর মতন, আমার ভিতর থেকে আসা একটা অকল্পনীয় তীক্ষ্ণ আওয়াজ আমি শুনতে পাচ্ছিলাম, আমি শুনতে পাচ্ছিলাম আমার অন্তরাত্মা চিৎকার করে

আমকে বলছে – আমি বেরিয়ে আসতে চাই, আমি বেরিয়ে আসতে চাই এই ছদ্মবেশে লুকিয়ে থাকা জীবন থেকে। আমি এই দ্বিমুখী জীবন আর সহ্য করতে পারছিলাম না – আমার পরিবারকে জানাতে হয়ছিল, আমার প্রকৃত পরিচয় জানানোর জন্য আমাকে প্রায় লক্ষাধিকবার রিহার্সাল নিতে হয়। আমার বোন – মেডিসিন নিয়ে পড়ছে। আমি ভেবেছিলাম সে হয়তো আমাকে বুঝতে পারবে। এক রাতে আমি ওকে ফোন করি আর নিজের সব বক্তব্য ওর সামনে তুলে ধরি। ও সাংঘাতিক আঘাত পায়, আমাকে ধমক দিয়ে বলল IIT আমার মাথা খাচ্ছে। সেই সঙ্গে আমি উপদেশ পেলাম এ ব্যাপারে আর কোন কথা বলতে না, না কাউকে জানাতে। দুর্ভাগ্য, শিক্ষিত লোকদের কাছেও মাঝেমধ্যে যুক্তি পার পেয়ে ওঠে না। ধর্মীয় বিশ্বাসই আমাকে সেদিন শেষ উত্তর দেয়, যা তুমি বিশ্বাস করো বা না করো কিছু আসে যায়ে না। আবার খোলসের ভিতর, নিঃসঙ্গ কচ্ছপ, এটাই তোমার আসল জায়গা। যখনই তুমি তোমার আত্মার কথা স্পষ্ট শুনতে পারো, সে চিৎকার করে বলছে তুমি সমকামী; তোমার ভিতর আপনাআপনি একটা পরিবর্তন ঘটে।

বছরের পর বছর তুমি টিন ম্যাগাজিন পড়ে গেছো এই আশায় যদি কিছু একটা পরিবর্তন হয়, রাতের পর রাত জেগে ভগবানের কাছে বৃথা কান্নাকাটি করে গেছো যাতে উনি তোমাকে বিষমকামী বানিয়ে দেন, তুমি সমকামী, তোমার জন্য তোমার বাবা-মাকে সমাজের কাছে কী রূপ অপদস্থ হতে হবে তার আতঙ্ক; নিষ্ঠুর ভাবে ভাঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়া তাদের সব চাইতে সুখের স্বপ্ন যে তাঁরা তাদের একমাত্র ছেলের সন্তানের সাথে খেলা করছে, তার ব্যথা; তোমাকে ভিতর থেকে শক্ত করে তোলে। কিন্তু আমি, আবারো চেষ্টা করলাম, সহজ সরল ভাবে।

তবে এবার আমাকে বেশি ভয় পেতে হয়নি। আমি, আমার এক কাছের বান্ধবীকে জানিয়েছিলাম, আমার সৌভাগ্য, ও আমাকে বুঝেছিল। ও বলেছিল, ও সবসময় আমার পাশে থাকবে। আমি কে, কী, তাতে কিছু আসে যায় না। আমি সেদিন ওকে যে ভাবে ভালবেসেছিলাম, কোন পুরুষ কোন নারীকে কোন দিনও সেভাবে ভালবাসতে পারবে না।

আমি বেশ সাহসী হয়ে উঠছিলাম, কিছু একটা করে নিজেকে প্রকাশ করবার পদক্ষেপ নিতে শুরু করছিলাম। 'Desperate Housewives' দেখার সময় আমি আর আগের মতন জানলা-দরজা বন্ধ করতাম না। এমনকি এক রাত, আমি আমার মা'র সাথে আলোচনা করেছিলাম হিন্দুরা কতটা নারী-বিদ্বেষী হয় যখন তারা সাবরিমালা মন্দিরে মেয়েদের ঢুকতে দেয় না। আমি বোধহয় আমার সীমানা পেরিয়ে যাই, মা আমাকে বলেছিলেন, "তোমার দৃষ্টিভঙ্গি প্রচণ্ড উগ্র। এরপর কী? এবার কি তুমি আমাকে বলতে চাও যে তুমি গে?" ধরা পড়েও ধরা পড়িনি, আমি হঠাৎ চমকে গিয়ে বোকার মতন একটা সাধারণ ব্যাপার হিসাবে উড়িয়ে দিয়ে আমাদের প্রতিবেশীর প্রশংসা শুরু করে আলোচনাটাকে সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দিয়েছিলাম। আমাদের প্রতিবেশি কতো ভালো, অফিস যাওয়ার সময় মা'কে লিফট দিয়েছে।

সেই পরীক্ষাটা খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়, মনে হয় যেন জীবন পপকর্ন হাতে থিয়েটারে বসে আমাকে মেপে চলেছে। আমার বাবা-মা, আমাকে জীবন দিয়েছেন, নিঃশর্ত ভালোবেসেছেন। তাদের অধিকার আছে জানার, আর আমার কর্তব্য তাঁদের বলার। এক রাত, আমি তাঁদের একসাথে বসিয়ে বললাম, আমি তোমাদের কিছু বলতে চাই। আমি তাঁদের বলেছিলাম তাঁদের সাথে আগের মতন তাস খেলাটা আমি খুব মিস করি। তাঁরা হাসতে হাসতে এক প্যাকেট তাস নিয়ে এসে আমার সাথে বসে পড়েন। খেলাতে আমার মনোযোগ ছিল না, বোকার মতন জোকস বলে যাচ্ছিলাম যে IIT-র স্টুডেন্টরা কত খারাপ রামি খেলে। আমাদের খেলা শেষ হল, বাবা JEE-এর রেজাল্টের জন্য আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। উনি হাসলেন, শুতে চলে গেলেন।

আমার মা আর আমার মধ্যে সম্পর্ক। সবসময় সন্তানদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে চলা একজন অভিভাবক। আমার মধ্যে কিছু একটা পরিবর্তন দেখে উনি জানতে চাইলেন আমার কী হয়েছে। আমি সব ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিলাম, বললাম আমার একটা প্রবলেম আছে, আর IIT থেকে বেরিয়ে আমার জীবন ওতটা মধুর হবে না যতটা উনি আশা করেছিলেন। আমার মাথায়ে রক্ত চড়ে গেছিল। উনি আমাকে সব কিছু পরিস্কার করে খুলে বলতে বললেন, যাতে উনি আমাকে 'সাহায্য' করতে পারেন। আমি বললাম, ওঁর পক্ষে তা সম্ভব নয়। মা আমাকে অনুরোধ করে বললেন উনি জানতে চান কীসের দুশ্চিন্তা তাঁর সন্তানকে কুরে কুরে খাচ্ছে। এইবার আমি মাকে জানালাম। সব কথা খুলে বললাম। কিছুক্ষণ নিজের মাকে তুমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে

দেখলে, কিন্তু যখন, নিজের সন্তানকে লালন-পালন করতে কোথায়ে উনি ভুল করেছেন যে তাঁর ছেলের এই ভয়ংকর 'রোগ' দেখা দিলো এবং, IIT-তে এমন কী হয়েছে যে তাঁর এই 'ভালো ছেলে'টা যার স্কুলে সবসময় পারফেক্ট র‍্যাঙ্ক হত আজ সে এই ভাবে কথা বলছে – এই সমস্ত কথা চিন্তা করে উনি ফেটে পড়লেন, তখন মনে হচ্ছিল একটা আস্ত পাথরের মতন জড় পদার্থ হয়ে গেলে বোধহয় বেঁচে যাবে। আমি জানালাম উনি যখনই বলবেন আমি ওঁকে ওঁর সমস্ত প্রয়োজনীয় সময় দেবো। এমনকি আমি ওঁর সাথে ডাক্তারের কাছে যেতেও রাজি হলাম, যাতে উনি বুঝতে পারেন আমি সম্পূর্ণ ভাবে সুস্থ। মা সব প্রয়োজনীয় কাজ করে রেখেছিলেন। উনি নিজেই বাবাকে জানান(ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার বলার প্রয়োজন হয় নি)। মা কয়েক জন ডাক্তারকে ফোন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে নেন।

আমরা ডাক্তারের অফিস গিয়েছিলাম। একজন অ্যানড্রোলজিস্টের অফিস। 'কী! অ্যানড্রোলজিস্ট?'। আমার মূল উদ্দেশ্য ছিল ধৈর্য নিয়ে সহযোগিতা করা, তাই আমি কোন প্রতিবাদ করিনি। একটা ঠাণ্ডা স্রোত আমার শিরদাঁড়া দিয়ে নেমে গেল। আমারা ডাক্তারের অফিসে ঢুকলাম। আমার বাবা মা ডাক্তারের সাথে কথা বললেন। তাঁরা জানালেন আমার সমন্ধে জেনে তাঁরা কতটা আঘাত পেয়েছেন, দুঃখ পেয়েছেন। তাঁরা আলোচনা করলেন ইন্টারনেট কী ভাবে সমাজটাকে দুষিত করছে, আমাকে সুস্থ করবার জন্য তাঁরা কতটা চিন্তিত, তাঁরা ডাক্তারকে জানালেন আমাকে সুস্থ করবার জন্য কতো আশা নিয়ে তাঁর কাছে এসছেন। ডাক্তার হেসে বললেন, "আজকাল এই সব ননসেন্স ব্যাপার স্যাপার বাচ্চাদের সামনে খুব তুলে ধরা হয়। বাচ্চারা মনে করে এটা একটা ফ্যাশান। কলি যুগ, আমি বলছি আপনাদের, কলি যুগ"। ডাক্তার আমকে ইশারা করে ভিতরে যেতে বললেন। আমি গেলাম। উনি ভিতরে আসলেন। একটা প্রচণ্ড অস্বস্তিকর অশ্লীল কাজ উনি করলেন। আমি শুধু ভাবলেশহীন ভাবে দেখতে থাকলাম। আসলে ওটা ছিল শারীরিক পরীক্ষা করবার একটা পদ্ধতি। উনি পরিক্ষা করলেন আমার পুরুষাঙ্গে, পুরুষত্বে কোন দোষ আছে কি না। আমি পাশ করলাম; আর আমার এই শারীরিক পরীক্ষায় পাশ হওয়াতে উনি সিদ্ধান্তে আসলেন আমার রোগটি মানসিক। উনি বেরিয়ে এসে আমার বাবা-মাকে জানালেন, "আপনাদের ছেলে সম্পূর্ণ সুস্থ! চিন্তা করবার কোন কারণ নেই। প্রথম ধাপে পাশ করে গেছে, পরেরগুলোতে নিশ্চয় সফলতা পাবে। ওকে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যান। খুব বুদ্ধিমান ছেলে, দেখুন... ও নিজেই নিজেকে পালটাতে চায়"। আমি সম্পূর্ণ চুপ ছিলাম, কয়েক মুহূর্ত আগে নগ্ন হয়ে পরীক্ষা দেবার ফলে যে একটা আঘাত পেয়েছিলাম। সমস্ত দিন একটাও কথা বলতে পারিনি। পর দিন সকালে, নিজেকে যতটা সম্ভব শান্ত করে আমি জানালাম, আমাকে শহরের সব চাইতে ভাল সাইকিয়াট্রিস্টেরের কাছে নিয়ে যেতে, সব থেকে ভাল সাইকিয়াট্রিস্ট। আমারা বেশ একটা ঝকঝকে, স্টাইলিশ ক্লিনিকে গিয়েছিলাম, আমি খুশিই ছিলাম। হ্যাঁ, ক্লিনিকটা দেখে কিছুক্ষণের জন্য খুশি ছিলাম। তিনটে সেশন। আমার তিনটে ঘণ্টা নিজের সমন্ধে বেস্ট আলোচনা করবার, আমার তিনটে ঘণ্টা আমার ভিন্ন ক্রোমোজোম বিশ্লেষণ করবার, কী কারণে যখন দশ বছরের ছিলাম সেই সময় থেকে আমি সার্টলেস সালমানের ছবি জোগাড় করতাম, কেন আগেকার দিনে সমাজ লেফটিদের শয়তান বলত কিন্তু পরবর্তীকালে তাদের ঐ ভ্রান্ত ধারণা ভাঙে। উনি আমার সব বক্তব্যে সম্মতি জানালেন, "হ্যাঁ, সব সত্যি, তবে তোমাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তোমার বাবা মা যা বলছেন, তা শোনো"। উনি ওনার বক্তব্য শেষ করলেন। তিন হাজার টাকা আমার বাবা খরচা করলেন ভারতের সব চাইতে বেস্ট সাইক্রাট্রিস্টের সাথে আলোচনা করে, কিন্তু আমারা কী সিদ্ধান্তে আসলাম? আমার বেশি ইন্টারনেট না করে পড়াশোনায় মন দেওয়া উচিত।

এখন আমি কোন কিছু কেয়ার করি না। আমার কর্ম ক্ষেত্রে কিংবা অন্য কিছুতে আমার গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত সঠিক কি না, তা বিচার করবার জন্য অন্য কারুর প্রয়োজন আমি অনুভব করি না। IITতে আমার বন্ধুরা যারা সব সময় আমার যৌনতা নিয়ে প্রকাশ্যে সন্দেহ করত তবুও আমি যাদের বিশ্বাস করতাম, তাদের সবাইকে আমি মেইল করি। তারা আমাকে খুব সাপোর্ট করেছে। এর পর আমি আরও কিছু লোকের সামনে নিজেকে প্রকাশ করলাম, তার পর আরও কিছু লোকের সামনে। আমি খুব মিশ্র প্রতিক্রিয়া পেয়েছি। কেউ কেউ আমার কথা অবিশ্বাস করেছেন, কেউ বা আমার বক্তব্যকে সম্মান জানিয়েছেন, আমাকে অপমান করেছেন আবার কেউ প্রচণ্ড চমকে গেছেন। হ্যাঁ, IIT-তে হোমোফোবিক আছে, কিন্তু সব থেকে যেটা প্রয়োজন IIT-

তে অনেক উচ্চমনের ব্যক্তিরা আছেন, তারা আমাকে আশা দিয়েছে। আমি যা ভেবেছিলাম, IIT সেই রকম নয়, কিন্তু সম্পূর্ণ পারফেক্ট বলে কিছু কি পাওয়া যায়? আমি বাস্তব, শেষমেশে ছাত্র সমাজের কণ্ঠ হিসাবে আমার গল্প স্বাধীনতা পেয়েছে। আমি, আমার ক্লাসে কিছু বন্ধুদের পেয়েছি যারা গে-দের ভাল দিক গুলো চিন্তা করে গে হওয়া কতো ভালো তা আমাকে বলে। আমি অনেক প্রোফেসার পেয়েছি যারা আমার কাছে সমকামীদের প্রতি তাঁদের সাপোর্ট প্রকাশ করেছেন। এ সব কিছুর ভিতর দিয়ে আমি দিনের শেষে বিছানায় যাই, জানি আমি এবার নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারবো। যদিও আমি অনেক অনুশোচনা, লজ্জা, ডিপ্রেশানের ভিতর দিয়ে গেছি। মেডিক্যাল পরীক্ষা দিয়েছি, আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ছি, সামাজিক বাধানিষেধ পেয়েছি। কিন্তু যখন আমার গল্পটা কতটা 'প্রেরণাদায়ক' জানিয়ে আমি আবারও মেইল পাই, তখন আমি অনুভব করি একটা সময় আসবে যখন কোন নতুন সমকামী নিজের প্রকৃত পরিচয় দিতে কখনোই বিব্রত বোধ করবে না, সে কাঁদবে না বরং লজ্জা লজ্জা ভাব নিয়ে টিভি সিরিয়ালের কোন নতুন হিরোর উপর তার ক্রাশের কথা সে তার রুম মেট'দের কাছে গল্প করবে।

আমি অনুভব করি এই রকম একটা ভবিষ্যত আসবে।

২০১১, আই আই টি মাদ্রাজ

মাদ্রাজ IIT'থেকে প্রকাশিত ছাত্র সমাজের কণ্ঠস্বর *The Fifth Estate* পত্রিকায়, IIT-তে পাঠরত এক ছাত্রের ব্যক্তিগত জীবনের প্রকাশ।

অনুবাদ : মৌমিতা ঘোষ, লেখাটি গুরুচণ্ডা৯ প্রকাশিত *আমার যৌনতা* সংকলনের দ্বিতীয় সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত।

মন্দিরে মিলায় ধর্ম

সুমন মান্না

১

নির্ধারিত সময়ে ক্লাবঘরে পৌঁছে দেখি প্রায় জনা দশেক গুছিয়ে বসে আছে। এটা সচরাচর দেখতাম না ইদানীং। যে সময়ে মিটিং ডাকা হ'ত সেই সময়ে মিটিঙের আহ্বাহক পৌঁছে কাছের লোকেদের ফোন ও বাকিদের জন্য হোয়া (হোয়াটস্যাপ গ্রুপ, অনেকবার এর কথা আসবে তাই এখন থেকে হোয়া) গ্রুপে মেসেজ পাঠাতেন। সপ্তাহের মাঝ মধ্যিখানে রাত সাড়ে ন'টায় ডাকা মিটিঙে এত ভিড় দেখে ভালোই লাগল কিন্তু। কিছু একটা কথা চলছিল, আমি পৌঁছতেই আচমকা স্তব্ধতা আর যারা বসেছিল তাদের চোখে মুখে আহ্লাদের উদ্ভাস দেখেও ভালো লাগল।

"কী খবর? সব ভালো তো?" এই সব ছেঁদো ভদ্রতাও হল টল। উৎসাহ বশত তখনই একজন বলে ওঠেন - "এবার তা'হলে শুরু হোক?" আর একজন (এখানে বাকিরা সবাই ওই "একজন" হয়ে থাকবেন, তাদের কথা, বার্তা, চিন্তা, বুদ্ধি এত এক রকম। তাছাড়া চেহারা বৈশিষ্ট্য দিয়ে বোঝান সমীচীন নয়। সবার নামও জানি না, হোয়া গ্রুপে ফিসফিস অক্ষরে নাম আসে সেই নাম চিনি, এখানে নামের সঙ্গে মুখ মেলানর উপায় নেই। আর তাছাড়া ফায়ারিং স্কোয়াডে দাঁড়ান সেপাইদের মুখ, নাম কে কবে জানতে চায়) বললেন -"আর পাঁচ মিনিট দেখা হোক, অনেকেই তো আসবে বলেছিল।" প্রেসিডেন্ট (ইনি আলাদা, এর নাম জানি, আর ডব্লু এ'র প্রেসিডেন্ট) বললেন তা'হলে ওই কথাগুলো একটু জানিয়ে রাখি....সেসব চলতে থাকল।

এই আচমকা মিটিঙের সূত্রপাত সেইদিন (২০শে সেপ্টেমবর) সকালে, প্রায় দুপুর তখন। বাঙালিদের দুর্গাপুজোর হোয়া গ্রুপে বউ একটা মেসেজ পায়। একজন সেখানে লিখেছে পরের দিন নাকি সোসাইটিতে মাতারাণীর মূর্তি স্থাপনা হবে, যেটা কিনা মন্দির বানানোর প্রথম পদক্ষেপ। আমার বউ তাকে "সে কী? কেন? কে করছে? এটা করা যায় নাকি?" এইসব প্রশ্নে জেরবার করলে সে জানায় "সোসাইটির বাসিন্দারা ও বিল্ডার এই মন্দির বানাচ্ছে।

বউ আমাকে এই কথা জানালে, আমরা ঠিক করি আর ডব্লু এ'র কাউকে জিজ্ঞেস করে দেখা যাক, ওরা এটা জানে কী না। আমার পরিচিত এক মেম্বারকে আমি আলাদা করে হোয়াতে জানতে চাই এর সত্যতা ও আর ডব্লু এ র ভূমিকা।

ভদ্রলোককে পাঠানো মেসেজ নীল টিক হতেই ভাবি উত্তর পাব। কিন্তু তার ফোন আসে। তিনি জানান, কয়েকজন রেসিডেন্ট চাঁদা তুলে এইসব করছে। আর ডব্লু এ জানে। কিন্তু অফিশিয়ালি এ ব্যাপারে চুপ থাকবে বলে কথা দিয়েছে। যাই হোক না কেন মন্দির তৈরি হবে। ধর্মকর্ম হবে। ভালো কাজ। তাই না?

আমি গুম হয়ে যাই। মনে পড়ে এক বাঙালি মাস কয়েক আগে " কে কে মন্দির চান সোসাইটিতে? যদি চান, তা'হলে বুড়ো আঙুল তুলুন" এই মর্মে হোয়াতে পাগলা করে মারছিল। অনেকে বুড়ো আঙুল তুলেছিল। আমি আপত্তি জানিয়েছিলাম। পরে সে নিয়ে কিছু আর এগোয়নি দেখে ভেবেছিলাম সে অন্য সাঁকো পেয়েছে।

তখনই ঠিক করি আর ডব্লু এ'র গ্রুপে জানতে চাইব এ সম্পর্কে ওদের মতামত। আমি লিখি

প্রিয় অধিবাসীবৃন্দ,

জানলাম যে একটি স্থায়ী মন্দিরের খুব শীঘ্রই উদ্বোধন হতে চলেছে সোসাইটিতে।

একজন বাসিন্দা হিসেবে আমি এইখানে এর বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

আমি মনে হয়, মানুষ নিজের ব্যক্তিগত পরিসরে নিজস্ব ধর্মীয় রীতিনীতি স্বচ্ছন্দে পালন করতে পারে। এর অতিরিক্ত কিছু রীতিনীতি থাকলে তার জন্য আমাদের সোসাইটির কাছাকাছি অনেক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আছে। এ ছাড়াও এখানেই অনেক ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালিত হয় ও উৎসাহী মানুষ এতে অংশগ্রহণ করেন।

আমি এও মনে করি আমাদের সোসাইটিতে এখন এর থেকেও জরুরি অনেক বিষয় আছে যা আশু সমাধান ও যথেষ্ট মনোযোগ দাবি করে।

আর তাছাড়া আমি যদ্দুর জানি এ হেন স্থায়ী ধর্মীয় স্থান এই ধরনের আবাসনে বানানোটা বে-আইনি।

এর সঙ্গে আমি আমাদের শ্রদ্ধেয় আর ডব্লু এ' র প্রেসিডেন্ট

ও বাকি সদস্যদের এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে ও যাথাযথ ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করছি।

শ্রদ্ধাসহ।

জানা ছিল। সেই অনুযায়ী এর কিছুক্ষণের মধ্যেই উড়ে আসতে থাকে মন্তব্যগুলি। প্রথম দু'টি আশ্চর্যজনক ভাবে আমাকে সমর্থন করে। তারা জানায়, মন্দিরের চেয়েও সোসাইটির সামগ্রিক উন্নয়ন অনেক বেশি জরুরি। তার পরেই আসতে থাকল সেইগুলো যার অপেক্ষা ছিল। নিচে পরপর দিলাম।

১) আমি খুব জোর দিয়ে এই পোস্টের বিরোধিতা করছি। আমি নিজেকে সেকুলার হিসেবে প্রমাণ করতে চাই না।

২) মন্দির থাকলে ক্ষতি কীসের? কেন এর বিরোধিতা অপ্রয়োজনীয়ভাবে?

৩) এখানকার আবাসিকদের মতামত সবসময় স্বাগত (এটা ঠিক কেন বলতে চেয়েছে পরিষ্কার হয় নি, এই মেসেজ যিনি করেছেন তার কথা পরে আরও আসবে, তখন একে তিন নং বলব)

৪) একটা মন্দির কিছুতেই বে-আইনি হ'তে পারে না।

৫) দয়া করে আইনটি দেখান, যেখানে মন্দির বানানোকে বেআইনি বলা আছে।

৬) আমি মনে করি আমাদের সব সমস্যা বিল্ডার সমাধান করে দিয়েছে। তা ভালো, আমি জানতাম না। তা এখন আমরা নতুন ইস্যু নিয়ে বিতর্ক করতেই পারি। (অল্প সারকাজম কিন্তু ঠিক আছে)

৭) আমি বুঝতে পারছি না, কীভাবে মন্দির তৈরি বে-আইনি হ'তে পারে?

৮) আমি প্রস্তাব করি মন্দির বানান হোক। তারপর যে এটা বে আইনি মনে করছে সে কেস করুক আমাদের বিপক্ষে। তারা যদি জেতে কোর্ট এটা ভেঙে দিতে বলবে।

৯) মন্দির তো একটা শব্দমাত্র। একবার তৈরি করলে এতে বসান মূর্তিগুলি এর অংশ। কিন্তু সেই জায়গাটা সকলের জন্যই পবিত্র হয়ে যায়।

৯- ক) (ইনি পরপর দু'টো লিখলেন কি না) আমাদের অনেক ঘটনায় দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু ঘটেছে। সাম্প্রতিক অতীতে। তাই 'পজিটিভ এনার্জি" র উৎস হিসেবে একটা মন্দির তৈরি হওয়া অবশ্যই উচিৎ।

অফিসে কাজকর্ম থাকে তাছাড়া সব মন্তব্যের তো জবাব হয়ও না ঠিক। যারা সমর্থন করেছিল তাদের ধন্যবাদ দিলাম। লিস্টের ১) নং কে উত্তরে লিখলাম - আপনি নিজের পছন্দে একটি বে আইনি কাজ সমর্থন করতেই পারেন। পছন্দ আপনারই। ২) নং কে লিখেছিলাম - এটি বে আইনি ও এটি আবাসিকদের সাধারণ সমস্যাগুলি সমাধান করে না। ৪) নং কে বললাম - ভারতীয় আদালত যদিও তাই মনে করেছে।

এই উত্তরগুলি দেওয়ার পরেও এই রকম মেসেজ আসতেই থাকে হোয়াতে। সেগুলো সবই একই রকম। এর পরে আসরে নামেন সেই বাঙালি ভদ্রলোক যিনি কিনা প্রথম কে কে এখানে মন্দির চান বলে ক্ষেপে গেছিলেন। তিনি খুব বড় একটা কিছু লেখেন বটে, কিন্তু সে ইংরাজির যতটুকু বোধগম্য হয় তা এইরকম:

"সবার মতামত সমান মূল্যবান।

-স্থায়ী মন্দির এখনও বানান হয় নি।

- নবরাত্রি তে মাতারাণীর পুজো। যেহেতু হিন্দু তাই এতে বিতর্কের জায়গাই নেই।

- আমার বন্ধু বলেছেন (আমাকে বন্ধু বলেছে, আমি উলুতপুলুত, তা এর সঙ্গে আলাপ পরিচয় আছে) এখানে মানুষ নিজের ইচ্ছেমতো ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করতে পারেন ব্যক্তিগত জায়গায়। আমি তাকে জিজ্ঞেস করছি তিন বছর আগে এখানে দুর্গাপুজো কেন শুরু করেছ তুমি ও তোমার বন্ধুরা মিলে? যদিও আমি তখন ছিলাম না এখানে। (হ্যাঁ, এই অবকাশে বলে রাখি সে এক পাপ করেছিলাম বটে, কিন্তু মাইরি বলছি খেটে খেটে প্রাণ গেছে, পুজোর ক'দিন সোসাইটি ছেড়ে বেরোতে পারিনি, সবার সঙ্গে তিনবেলা ভেজ গিলেছি, একফোঁটা মদ অবধি খাওয়ার সময় পাইনি। তাতেও পাপ ধোয় না)

- এর আগে আমি মন্দির নিয়ে মতামত চাই যখন হোয়া গ্রুপে।

- ১৮৬ টি মতামতের মধ্যে মাত্র তিনজন এর বিরুদ্ধে মত দিয়েছিল। তাদের জন্য আমাদের সম্মান ও শ্রদ্ধা আছে। - তাই আমরা তাদের থেকেও তাইই আশা করি।

- আমরা মনে করি আমরা যে এ নিয়ে কোনও বড় বিবাদ না করি।

এর বেশিটাই বুঝিনি। যতটুকু বুঝেছিলাম তার উত্তরে বলেছি - তুমি যদি আমার মূল মেসেজটা আর একবার পড়তে তা'হলে হয়ত প্রশ্নের উত্তর পেতে।

এরপর আমার বক্তব্যের সমর্থনে দু একজন আরো আসেন। তারা বাকিদের মন্তব্যের উত্তর (যেগুলো আমি দিই নি) দিয়েছেন। তাদের আমিও একটু ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু আর ডব্লু এ র সবাই মুখে কুলুপ। বাড়ি ফেরার পথে আমি আর একবার একটা পোস্ট করি আর ডবলু এ'র মতামত চেয়ে। অবশেষে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ প্রেসিডেন্ট মাঠে নামেন। প্রথমেই তিনি এক জরুরি ভিত্তিতে ডাকা এক মিটিং প্রস্তাব করেন রাত সাড়ে ন'টায় ক্লাবঘরে। তার কিছু পরেই আর ডবলু এ' অবস্থান বোঝাতে গিয়ে জানান -

আর ডব্লু এ'র অবস্থান খুব পরিষ্কার। আমরা এই আইনানুগ সংস্থার সদস্য হিসেবে মনে করি যে যদি আইনানুগ পথে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ আবাসিকদের ইচ্ছা ও আবেগ কে মাথায় রেখে যদি এটি সম্ভব হয় তাহলে আমরা এটি (মন্দির স্থাপনা) সমর্থন করব। অন্যথা, এ ব্যাপারে আমরা নিরপেক্ষ থাকব, অর্থাৎ সমর্থন করব না, বিরোধিতাও করব না।

আর ডব্লু এ'র এই "পরিষ্কার" করে বোঝান তে মানুষজন খুবই উৎফুল্ল হ'ল। "এইত, সবকিছু কি সুন্দর স্পষ্ট ব্যাখ্যা! এই না হ'লে আর ডবলু এ - বললে হবে!

আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম - সময়মত পৌঁছে যাব।

২

মিটিঙে পৌঁছনর পরে কিছু আজেবাজে আলোচনা হ'ল। যাতে বাকিরা আসে। দেখতে পাচ্ছিলাম, লোকজনের তাতে একটু অস্থির অস্থির ভাব। এ যেন সোসাইটি হ'লে জওয়ানি সিরিজের মুভি চালানর আগে ফিল্ম ডিভিশনের তথ্যচিত্র। যা শেষ হচ্ছেই না। কিন্তু লোকজন ঢুকছিল, এদিক ওদিক থেকে যতগুলো চেয়ার পাওয়া গেল জড়ো করে বসছিল, বাকিরা দাঁড়িয়ে। প্রেসিডেন্ট গলা ঝেড়ে নিয়ে শুরু করলেন -"আজকের এই জরুরি মিটিং তা'হলে শুরু করা যাক। যার যা বলার একে একে বলতে থাকুন।" বলে তার বাঁদিকে তাকালেন। আমি তার ডানদিকে বসে। ভাবলাম, ভালোই হল সবার কথা শুনে গুছিয়ে নিতে পারব উত্তরগুলি।

গুছোব কি আর সাজাবই বা কি! যা যা হ'ল ঠিক তাই তাই পর পর লিখে যাই। লেখার প্রথমে যদিও বলেছিলাম যে নাম ব্যবহার করব না এবং চেহারা দিয়েও মানুষকে বোঝান ঠিক নয়। তাই প্রেসিডেন্ট এর বাঁদিকে বসা লোকটিকে এক নং দিলাম। আর খেয়াল রাখতে হবে মেসেজ অনুসারে যাকে আগে তিন নং বলে চিহ্নিত করেছি তিনি এখানে সাত। আর সেই বাঙালি ভদ্রলোক প্রথম যিনি মন্দির বলে ক্ষেপে উঠেছিলেন তার নম্বর পাঁচ। ব্যস, এইবার সব জলের মতো "পরিষ্কার"।

দুই- আমি যেটা জানতে চাই, মানে আমার স্ত্রী আমায় এটা জানতে পাঠিয়েছেন যে, মন্দির তো দেখুন অনেক রকমের হয়, এখানে কীসের মন্দির হবে?

সাত- মন্দিরে তো সব দেবতাই থাকবেন। কি তাইতো? মাতারাণী, শিব, হনুমান, লক্ষ্মী, বললাম না সর্বধর্ম স্থল হবে এইটা

আট- সর্বধর্ম মানে কি মুসলমানেরাও আসবে নাকি?

সাত - আমি কি তাই বলেছি? (তারপর একটা দুর্বাসা দৃষ্টি, এরা যে কোত্থেকে আসে - ধরণের)। শুনুন, আমি পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছি...(তার কথার মাঝখানে অন্য একজন বলে ওঠেন)

ছয়- আমি সবাইকে একটা কথা জানাতে চাই। আমি এখানে আসার আগে &*& সেক্টরে থাকতাম সেখানে... (তার কথা শেষ করতে দেওয়া হয় না)

সাত- আমি তো বললাম আমি সব বলছি, মাঝখান থেকে কথা বলছেন কেন?

ছয়- সবাই সে'সব কথা জানে। আলাদা করে শোনার কিছু নেই। আমি যখন &*& সেক্টরে থাকতাম...

সাত - আমাকে তা'হলে বলতে দেওয়া হবে না তো?

দুই- আমি জানতে চাই যে মন্দির যে তৈরি হবে, তার অনুদান কি আমরা ভাগাভাগি করে দেব নাকি যে যত পারে?

ছয়- আমি তো সেটাই বলতে চাইছি। আমি যখন &*& সেক্টরে থাকতাম...

সাত- এখানে যখন বলতে দেওয়া হচ্ছে না, তখন মিটিঙে ডাকাই বা কেন?

#&&%$+*&#-+++$+*&&@%& (কিছু শোনা যায় না)

প্রেসিডেন্ট -(সামনের টেবিলে ঘুষি মেরে) আ: এইরকম করলে কী করে হবে! (সাত কে উদ্দেশ্য করে) হ্যাঁ, আপনি বলুন।

সাত - আমি বলতে চাই যে সোসাইটিতে এইরকম রুল থাকে যে কেউ ফ্ল্যাট কিনলে ফ্ল্যাটের দামের একটা পার্সেন্টেজ মন্দির ফান্ডে দিতে হয়। এখানে লোকজনকে তা দিতে হয়নি, যে যার মতো নিজেরা টাকা দিয়েই করছে, কারোর থেকে টাকা চাওয়া হচ্ছে না, তাতেও আপত্তি।

অনেকে - হ্যাঁ, সে কী। নিশ্চই নিশ্চই, এমন হ'লে আমাদের কী সুন্দর বড় মন্দির হ'ত। মার্বেল বসান। ফোয়ারা থাকত (যে যার মতো বলছিল)

ছয়- এবার আমি বলি? আমি যখন &*& সেক্টরে থাকতাম সেখানে মন্দির বানিয়েছিলাম। একটা বড় বোর্ডে সেখানে কে কে দান দিয়েছেন তাদের নাম লেখা হয়েছিল। কিন্তু অ্যামাউন্ট লেখা হয় নি। কেউ পাঁচশো দিলেও নাম, যে পঞ্চাশ হাজার দিয়েছে তারও নাম পাশাপাশি।

এগার - আমি একটা কথা বলতে চাই। আমি একদিন সকালে বাইরেটা একটু হাঁটতে গিয়েছিলাম। দেখি তিনজন মহিলা খালি পায়ে বেরোচ্ছেন। আমি বললাম কোথায় যাচ্ছেন? ওরা বললেন আমরা প্রতি সোমবার সাই মন্দিরে শিব বাবাকে জল চড়াতে যাই। আমি বললাম খালি পায়ে? ওনারা বললেন কী আর করা যাবে, শিব বাবাকে জল চড়াতে গেলে জুতো পরা যায় নাকি? আমি ভাবলাম, যদি সোসাইটিতে একটা মন্দির থাকে তা'হলে এনাদের খালি পায়ে হাঁটার কষ্ট করতে হয় না।

নয় - নিশ্চই নিশ্চই। মন্দির থাকলে কত সুবিধা, আমাদের জন্য তো বটেই, আমাদের সোসাইটির বয়স্করা সেখানে যেতে পারবেন। আমাদের পরের প্রজন্ম সেখান থেকে কত কী শিখতে পারবে।

দশ- (আমার দিকে তাকিয়ে, দাঁত মুখ খিঁচিয়ে) শুনছ? এর পরেও বলবে মন্দির বানানোটা ঠিক নয়? এই যে তোমরাও তো এখানে দুর্গাপুজো করো, বলতে পারবে সোসাইটির কেউ তাতে বাধা দিয়েছে?

আমি - (মৃদুস্বরে, প্রেসিডেন্ট এর দিকে তাকিয়ে) বলব?

পাঁচ - (প্রেসিডেন্ট আমার দিয়ে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে হ্যাঁ কি না বলার আগেই শুরু হয়ে যান) আমি শুধু একটাই কথা বলতে চাই। আজ থেকে মাস ছয়েক আগে আমি এই গ্রুপে জানতে চাই এখানে একটা মন্দির বানানোতে কার কার মত আছে। তারা বুড়ো আঙুল দেখান। এর মধ্যে একশো ছিয়াশি জন থামস আপ (সত্যি থামস আপ ই বলেছিল) দিয়েছিল। (আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে) ও তো ছিল তখন গ্রুপে ও জানে।

আমি - (সবার চোখ আমার দিকে) আমি কি হ্যাঁ বলেছিলাম?

পাঁচ- না। তুমি বিরোধী ছিলে (বাকিরা হতাশ)। তিনজন শুধু বলেছিল মন্দির চাই না। কিন্তু একশো ছিয়াশি জন থামস আপ দিয়েছিল। আমি তখন আরও কয়েকজন মিলে আর ডব্লু এ'র সঙ্গে মিটিং করি। তিনবার মিটিং হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আর ডব্লু এ আমাদের বলে নিজেরা টাকা পয়সা তুলে যদি করতে পারো আর তা চালানর খরচ যদি নিজে থেকেই উঠে আসে তাহলে করো। সেই অনুযায়ী আমরা মাতারাণীর মূর্তি এনেছি। কাল প্রতিষ্ঠা হবে।

বারো - মন্দির অত্যাবশ্যকীয়। একটা সোসাইটি এখানে আছে যেখানে মন্দির নেই? তুমি আইন দেখাচ্ছ? তুমি যে সব ভিডিও দিয়েছ (আমি মাইরি বলছি খবরের লিঙ্ক দিয়েছিলাম) তাতে এক জায়গায় আছে - কে একজন জলের ট্যাঙ্কে মূর্তি বসিয়েছিল তাই কোর্ট বলেছে সেটা জলের ট্যাঙ্ক থেকে সরিয়ে সোসাইটির বাইরে বা ভেতরে, শোনো ভালো করে ভেতরেও বলেছে - স্থাপন করতে হবে। আর একটা ভিডিও, তাতে একজন বলেছে মন্দিরের মাইকের আওয়াজে তার মেয়ের পড়াশোনায় অসুবিধা হয়, তাই পুলিশ বলেছে মাইক না বাজাতে। তোমরা যে দুর্গাপুজোয় কত রাত অবধি ফাংশান করো, তাতে লোকের অসুবিধা হয় না? কেউ বলেছে দুর্গাপুজো বন্ধ করার কথা?

আমি- সে তো সোসাইটিতে সব ধর্মীয় অনুষ্ঠানই পালিত হয়। হোলি, জন্মাষ্টমী গণেশ পুজো দুর্গাপুজো, সেগুলো তো সাময়িক। কিন্তু মন্দির মানে তো তাতে নিত্যনৈমিত্তিক এইসব চলবে।

বারো - সব বুঝি, কিছু বলিনা, তোমরা তো দুর্গাপুজো একটা কমার্শিয়াল ব্যাপার করে ফেলেছ। লোকের থেকে টাকা নাও।

আমি - সে তো প্রথমবার চাঁদা তুলেছিলাম। পরের বার তো চাঁদা চাই নি।

বারো - লোকের বাড়ি বাড়ি তো গিয়েছিলে?

তেরো (ইনি বাঙালি, দুর্গাপুজো দলের, সেন্সিবল লোক, মন্দির পন্থী, কিন্তু নিশ্চিত জানি আমি মারধর খেলে এই লোকটাই আটকাত বাকিদের) - সে তো নিমন্ত্রণ করতে।

বারো - নিমন্ত্রণ? যাও তো একগাদা হ্যাণ্ডবিল দিতে (যাতে অফার টফার থাকে এমন কুপন, গতবারে মাংসর দোকানের কুপন অবধি ছিল) যত্তসব কমার্শিয়াল ব্যাপার।

এগার - এই যে আমরা জন্মাষ্টমী করেছিলাম - একটা কোনও কমার্শিয়াল স্টল ছিল?

সাত - (আচমকা উঠে পড়ে বাইরে যেতে উদ্যত, সবার দিয়ে হাত তুলে ওয়েভ করতে করতে) আচ্ছা আমি চললাম। দেরি হয়ে যাচ্ছে, কাল থেকে তো নবরাত্রি, যা করার আজই করতে হবে (এই বলে কোমরে হাত দিয়ে সামান্য পেলভিক শ্রাগ)।

প্রেসিডেন্ট এবার আমার দিকে তাকালেন

আমি- সবাইকে নমস্কার জানাই। আমি বলতে চেয়েছি মন্দির এইভাবে বানানো যায় না। একটা জমি যখন পুরসভা থেকে ছাড়পত্র পায় তাতে পরিষ্কার লেখা থাকে এর উদ্দেশ্য কি, কোথায় কী থাকবে না থাকবে। আমি যদ্দুর জানি এই জায়গার যে প্ল্যান আমি দেখেছিলাম তাতে মন্দিরের কোনও উল্লেখ ছিল না। বরং একটা বাচ্চাদের স্কুল ছিল। আমি তাই এ বিষয়ে আর ডব্লু এ অবগত আছে কি না জানতে চাই।

দ্বিতীয়ত, আমি বলতে চাই, আমাদের সোসাইটিতে সমস্যার অন্ত নেই। আমাদের বড় রাস্তার সঙ্গে সোজাসুজি যোগাযোগ এখনও হয় নি। সোসাইটির রক্ষণাবেক্ষণ এখনও তেমন ঠিকঠাক নয়। এই অবস্থায় আর ডব্লু এ কি এমন একটা ব্যাপারে জড়াতে চাইবে যাতে পরবর্তী কালে অনেক সমস্যার জন্ম দিতে পারে?

তৃতীয়ত,....

পনেরো- তুমি কি সব লিখে এনেছ?

আমি- না, আমার মনে আছে সবই। যা বলছিলাম, আমার মনে হয়ছে যারা বিশ্বাস করেন তাঁরা তো বলেন ভগবান সর্বত্র আছেন। এখানে সোসাইটিতে আমরা যে যার বাড়িতে ইচ্ছে মতো পুজো টুজো করতেই পারি। তাছাড়া এখানে সব ধরণের ধর্মীয় অনুষ্ঠানই পালিত হয়। যাতে যে যার ইচ্ছেমত অংশ নেন। আর আশেপাশে মন্দিরও নেহাৎ কম নেই। বরং, আমি দেখেছি বাচ্চাদের স্কুল ভ্যানে কীভাবে তাদের ঠেসে ঢুকিয়ে বিপজ্জনকভাবে ভ্যান যাতায়াত করে। এখানে একটা নার্সারি স্কুল হলে বাচ্চারা নিরাপদ হতে পারে। একটা লাইব্রেরি নেই এ তল্লাটে। একটা লাইব্রেরি থাকলে লোকের অনেক সুবিধা হয়।

পনেরো - আরও বলবে?

আমি- এই শেষ পয়েন্ট, আমি জানি আমাদের সব ক'টা টাওয়ারের ওসি (অক্যুপেন্সি সার্টিফিকেট) নেই। তার ওপরে বে আইনি নির্মাণ হচ্ছে জেনে পুরসভা যদি বাকিগুলোর ছাড়পত্র বাতিল করে আর ডব্লু এ'র কাছে সেটা কেমন লাগবে? এটা একটু বেশি ঝুঁকি হয়ে যাবে না?

প্রেসিডেন্ট - (এতক্ষণ কিছু না বলতে পেরে গণগণে, বাকি কার কি বলতে উদ্যত হচ্ছিল, তাদের থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল) শোনো, তোমার প্রত্যেক প্রশ্নের এক এক করে উত্তর দিচ্ছি। এই জমি আমার, আমি এই জমিতে যা ইচ্ছে তাই করতে পারি।

আমি- (চোখে চোখ রেখে)- এটা আপনার জমি?

প্রেসিডেন্ট - আমার, হ্যাঁ, মানে আমাদের সবাইকার। সবাই, মানে মেজোরিটি যা বলবে এখানে তাই হবে। আইন টাইন সব জানি। কোথায় কী হয় কীভাবে সব জানা আমার। তোমাকে ওসব ভাবতে হবে না। আর তোমার স্কুল, লাইব্রেরি? তুমি উদ্যোগ নিয়ে এস আমার কাছে, আমি হ্যাঁ বলে দেব। তোমার স্কুল লাইব্রেরি তুমি যা ইচ্ছে তাই বানাও। আজ বাদে কাল এখান থেকে বিল্ডার চলে যাবে আমাদের হাতে সব ছেড়ে দিয়ে। তখন আমি প্রেসিডেন্ট থাকি বা না থাকি আমি বলছি এখানে মেজোরিটি যা চাইবে তাই হবে।

সতেরো - খুব আইন আইন করছ যে, চিৎকার করে শুনুন আচ্ছা এখানে যারা যারা আছে তাদের মধ্যে এমন কেউ আছে যে কখনও রেড লাইট জাম্প করেনি? তারা হাত তুলুন।

(আমি একা হাত তুললাম)

সাতেরো - (আমার দিকে তাকিয়ে) তুমি রেড লাইট বাঙ্ক করোনি? প্রমাণ কী?

আমি - যদি জানতাম তুমি চাইবে তা'হলে প্রমাণ রাখতাম।

সতেরো - এখানে কেউ আছে যে কখনো কাউকে ঘুষ দেয়নি?

(এবার হাত তুলিনি, পাপ আছে)

সাতের- এখানে এমন কেউ আছে যে কখনও "গলত

কাম" (এর ঠিক বাংলা জানি না, বোধ হয় অপরাধমূলক কাজ হবে) করে নি?

আমি- হাত তুললাম

সাতের - কিন্তু মেজোরটি চাইলে তো মন্দির বানাতেই হবে। আইনের জন্য মানুষ না মানুষের জন্য আইন?

আমি- অষ্টাদশ শতাব্দিতে মেজোরিটি চাইত বলে বিধবা কে মৃত স্বামীর চিতায় জ্যান্ত জ্বালান হত। মেজোরিটির বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ণ হয় বলেই বিধবারা এখন বেঁচেবর্তে থাকেন।

প্রেসিডেন্ট - (চোখ মুখ কুঁচকে) তোমরা বাঙালিরা, কিছু মনে কোরো না, কিছুই জানো না। আমি তোমাদের দুর্গাপুজো করার অনুমতি দিই। তোমরা আমাকে একবার ডাকোও না। তোমাদের ব্যানার লেগেছে দুর্গাপুজোর, আর ডব্লু এ'র নাম আছে ওতে? এই যে তোমার সঙ্গে আমি আগের বার দুর্গাপুজোয় কথা বলেছি। বলিনি? যা যা করতে চেয়েছ সব করতে দিয়েছি- দিই নি?

আমি - আমি কি সে কথা অস্বীকার করেছি? আমি তো জানি আমি আজ মন্দির নিয়ে কথা বলতে এসেছি।

চারপাশ থেকে সোরগোল - একবার প্রেসিডেন্টকে স্টেজে ডাকে নি। কী দুঃসাহস। দুর্গাপুজোর ব্যানারে আর ডব্লু এ'র নাম নেই? এরা তো পুরো কমার্শিয়াল করে দিয়েছে। কত বাইরের লোক আসে সোসাইটিতে। কখন কী ঘটে যায়। তাও প্রেসিডেন্ট কে ডাকবে না স্টেজে

তেরো - হ্যাঁ, ব্যানারে নাম থাকা উচিৎ ছিল। ঠিক আছে ওটা আমি দেখে নিচ্ছি।

বাকিরা - তা বলে ব্যানারে আর ডব্লু এ'র নাম দেবে না?

পাঁচ - আমি বলছি প্রেসিডেন্ট, আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আর ডব্লু এ'র নাম তুলে দেব ব্যানারে।

প্রেসিডেন্ট - হ্যাঁ। এটা ঠিক করো না তোমরা। আমি এই বলে দিচ্ছি, পরের বার এস দুর্গাপুজো করার অনুমতি নিতে, কিচ্ছু করতে দেব না।

তেরো - প্রেসিডেন্ট, আমরা ব্যাপারটা দেখছি, আর আমাকে দেখিয়ে - ও কিন্তু এখানে এসেছে ওর নিজের পক্ষ থেকে মন্দির নয়ে কথা বলতে।

আমি - আমি তো সেটাই...

চারপাশ থেকে - মন্দির হবেই। আইন কী করবে? মন্দির একবার হয়ে গেলে মন্দির ভাঙবে? দেখা আছে? মন্দির হয় না নাকি কোথাও? কে বলেছে মন্দির বানানো নিষিদ্ধ? প্রায় সবাই দাঁড়িয়ে পড়েছে এইবার।

দূর থেকে দেখি দশ নং আমার দিকে তাকিয়ে চোখ মুখ পাকিয়ে হাত নেড়ে কীসব বলতে চেষ্টা করছে, কিন্তু মাঝখানের ওই চিৎকারে আমিও তাকে ইশারায় কানে হাত দিয়ে বললাম কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। প্রেসিডেন্ট এর কাছে গিয়ে বললাম। আমি আপনাদের ভাল চাই। দেখেছি আপনারা সোসাইটির জন্য অনেক কাজ করেন। আমি চাই না একটা মন্দির বানানো নিয়ে এতে নতুন সমস্যার জন্ম হয়।

প্রেসিডেন্ট - আমি তোমাকে তো বললাম, এখানে আমি সবাইকে চিনি জানি। তোমার চিন্তা করার কিছু নেই সব সামলে নেব।

সবাইকার দিকে উদ্দেশ্য করে- আচ্ছা তা'হলে এবার যাওয়া যাক।

আমিও বাড়ির পথ ধরলাম। খালি হাতে। অনেক কিছুর জবাব অনেক রকম ভাবে দেওয়া যেত। তাতে মারধর হ'ত। একটা এফ আই আর। সেসব অ্যাফোর্ড করা যাবে না আমার।

খালি হাতে। একা একা ফিরে আসতে হয়। যাতে অন্তত এই লেখাটা শেষ করা যায়। রাস্তা অনেক বাকি। অনেকটা যেতে হবে।

ডিসক্লেমার - ১) আমাকে ভীরু, কাপুরুষ যা খুশি মনে করতে পারেন। ২) সব চরিত্র কাল্পনিক।

ফরিদাবাদ, হরিয়ানা, ২০১৭

ক্রমবর্ধমান বিভাজন ও বর্তমান ভারত

সেখ সাহেবুল হক

সংখ্যালঘু নয়, মানুষ :

সংখ্যালঘু ট্যাগ লাগিয়ে দেওয়া না পর্যন্ত একটা অংশের নিস্তার নেই। সোশাল মিডিয়াও এর ব্যতিক্রম নয়। এড়িয়ে যাওয়া যায়, পালিয়ে যাওয়ার পথ নেই।

কোনও বিষয়ে মতামত রাখলে, কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা, কিংবা যোগীর রাজ্যে শিশুমৃত্যু বা দিলীপ ঘোষের গোমাংস ফেলার মিথ্যে নাটকের বিরুদ্ধে কিছু।

একটা শ্রেণির আক্রমণের ধরন এমন - "তুই শালা মোল্লার বাচ্চা। এসব নিয়ে তোর বলার অধিকার নেই"। নামটা আরবি বলেই হয়তো দেশের ইস্যু নিয়ে মন্তব্যে সরাসরি ধর্মীয় আক্রমণ নেমে আসে। উত্তরপ্রদেশে দেড়শো শিশুর মৃত্যুর কৈফিয়ত চাইলে জবাব দিতে হয় কেন আইসিসরা মানুষ মারছে!

একজন অমুসলিম সুস্থচিন্তার কথা লিখলে ভক্তরা অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু মুসলিমদের সুস্থচিন্তার কথায় গাত্রদাহ হয়। দেশকে আর কতটা ভালোবাসলে ধর্মের মানদণ্ড দিয়ে বিচার হবে না, নিছক সম্প্রীতির কথাতে আপত্তি থাকবে না, তেড়ে আসবে না একশ্রেণির নিম্নরুচির দুপেয়ে। এমনই সহিষ্ণুতায় দেশ এগোচ্ছে।

আরবি নাম দেখে বাংলাদেশি ভেবে বিস্তর নোংরা আক্রমণ করে যখন কেউ বুঝতে পারেন 'ভারতীয়'। তখন নিজেকে এই ভেবে সান্ত্বনা দিই, এ দেশের সহনাগরিক ভাই নামের ফেরে চিনতে ভুল করেছেন। এটা তাঁর দোষ নয়। তাঁকে হয়তো শেখানো হয়েছে ওরকম। তিনিও হয়তো পরবর্তী প্রজন্মকে শেখাবেন।

কেউ ভাবেন সংখ্যালঘু, কেউ দেশদ্রোহী। 'মানুষ' ভাবার লোকেরাই কমে আসছেন।

চুপ থাকতে হবে :

চুপ থাকতে হবে। মেজোরিটি কথা বলছে। মেজোরিটি ধর্ষণ করলে শিক্ষাদান, ভুয়ো এনকাউন্টারে খুন করলে আগাছা সাফ, খাদ্যে হস্তক্ষেপ আসলে জীবপ্রেম, দাঙ্গা লাগানোটা পার্টির প্রোপাগান্ডা। শিশুর ভ্রূণ ত্রিশূলে গাঁথাটা অস্ত্রপরীক্ষা, অস্ত্রপরীক্ষা তো আমেরিকাও করে।

ভুল তথ্য ছড়ানো সাংবিধানিক অধিকার, ভুয়ো ডিগ্রি ততটাও ভুয়ো নয়, প্রেমে বাধাদান আসলে কৃষ্ণের সম্মানরক্ষা, মিথ্যে মামলায় তেইশ বছর জেল খাটালে বিচার ব্যবস্থার ভুল। মেজোরিটির গুরুতর অভিযুক্তরা ছাড়া পেয়ে গেলে বিচারব্যবস্থার জয়। সীমান্তের সৈনিক শুধু মেজরিটির গর্বের জিনিস, ক্ষুধার চেয়ে অস্ত্র বড়, সবার উপর রাম সত্য...।

দিনের শেষে মেজোরিটিই কথা বলে! শুধু দেখে যাওয়া ছাড়া কাজ কি। গরুর আধার, অযোধ্যায় রামমন্দির, গোমূত্রের বিশ্বব্যাপী চিকিৎসা, গোবরের কেকশিল্প, আদর্শ রামরাজত্ব দিয়েও দেশটা শান্ত হওয়া সম্ভবপর নয়। তা ধর্মীয় উন্মাদরাও জানেন।

সত্যি লিখলে কমিউনিস্ট, মেজোরিটি যুক্তিতে না পারলে বানিয়ে দেবে 'খানকির ছেলে', তথ্য দিলে 'ফটোশপ' ছুটে আসবে, হাতেগোনা পাঁচজন সুস্থচিন্তার লোক নিয়ে ফেসবুকে কয়েক হাজার ফেক প্রোফাইলের সামনা করা মুশকিল। ফেসবুকের বাইরেও ছড়িয়ে যাচ্ছে ভুয়ো ছবি, ভুয়ো ভিডিও, রগরগে ভাষণ, অস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা। আসলে মেজোরিটি আপাতত শেষ কথা বলছে!

দেশের উন্নয়ন নিয়ে প্রশ্ন তুললে 'তিন তালাক' দিয়ে প্রসঙ্গ ঘোরানো হবে, মেজোরিটির যে কোন ভুল ধরলেই 'সীমান্তে সেনারা লড়ছে...' থিওরি বলবত হবে।

মেজোরিটিরা যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন। মেজোরিটি মানে 'মাই বাপ', মেজোরিটি উচ্ছিষ্ট ছুঁড়ে দিতে পারেন, দুর্নীতির বাড়ি-গাড়ি তুলতে পারেন। মেজোরিটিরা পাকিস্তানি ট্যুরিজম চালান, দেশপ্রেমিক নির্ধারন করে দেন, কবর থেকে তুলে...। মেজোরিটি বিদেশি ধান্দাবাজ 'সানিউর' পোষেন, দেশি য় ধোঁকাবাজ ধ্রুব সাক্সেনাদের বাঁচাতে চান। অথচ সুস্থচিন্তাকে বিদেশে চালান করতে চান!

কেউ চুপ আছেন বলে দেশকে ভালোবাসেন না এমন নয়। মেজোরিটি সুস্থ চিন্তাকে ভয় পায়। এই ভয় যতদিন

টিকে থাকছে, সুস্থচিন্তারা জীবিত থাকবে।

তোষণকেন্দ্রিক রাজনৈতিক মিথ্যাচার :

ঈমাম ভাতাকে মুসলিম উন্নয়ন ধরে নেওয়া হয়। 'মোল্লাদের সব দিয়ে দিচ্ছে' জাতীয় সরলীকরণ সমাজে বিভাজন সৃষ্টি করছে। রাজনীতির সুক্ষ্ম প্রলেপে বাস্তবতা সম্পর্কে অন্ধকারে আছেন রাজ্যের একটা বড় অংশ। কিংবা ওয়াকফ বোর্ড জিনিসটা সম্পর্কে খুব কমজনই জানেন।

শুধুমাত্র মুসলিম হওয়ার কারনে চাকরির পরীক্ষায় ৫০% পেয়ে কোনও মুসলিম চাকরি পেয়েছেন গত পাঁচবছরে এমন ব্যতিক্রমী ঘটনা খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।

মুসলিম হওয়ার কারনে যেমন কারো ব্যাঙ্কের ঋণ মুকুব করা হয়নি। তেমনি মুসলিমদের ঘরবাড়ি তৈরী বা আমোদপ্রমোদের পৃথক ব্যবস্থা, পৃথক রাস্তা, পৃথক হাসপাতাল, পৃথক সিনেমাহল, পৃথক ভিক্টোরিয়া, পৃথক ইডেন গার্ডেন, যৌনপল্লী ইত্যাদি হয়নি। সুতরাং একটা পিছিয়ে পড়া শ্রেণিকে নিয়ে রাজনীতি এবং মিথ্যাভাষণ প্রতিনিয়ত চলছে।

প্রতিশ্রুতির পরেও কয়েকশো মাদ্রাসা অনুমোদন পায়নি বিভিন্ন জেলায়। রাজনৈতিক ভাষণদানে শুধু বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে অনেক দিচ্ছি, আরো দেবো।

রাজ্য সরকারের বিশ্বজয় করা কন্যাশ্রী, সিভিক পুলিশ বা সবুজ সাথী প্রকল্পও কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য লাগু হয়নি। মাদ্রাসা শিক্ষায় টাকার পরিমান বাড়ানো হয়েছে ঠিকই, তাতে পিছিয়ে পড়া অংশের সঠিক মানোন্নয়ন হয়েছে ধরে নেওয়াটা সমীচীন হবে না।

এই সমাজের একটা অংশ মনে করেন মুসলমানরা শিক্ষায় পিছিয়ে, কালচার নেই, অনেক বাচ্চাকাচ্চা ইত্যাদি। এই অশিক্ষার অন্ধকার একমাত্র শিক্ষার আলোকবর্তিকা দিয়েই সরানো যেতে পারে। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সচেতনতায় বিনিয়োগে যারা তোষণ খুঁজে পান তাঁদের পিছিয়ে থাকার সমালোচনা করার অধিকার নেই। বস্তুত লোকে মুখে শুনে গ্যালো গ্যালো করে ওঠা বোকাবোকা চিন্তাভাবনাগুলোর পরিসংখ্যানের সামনে বড়ই ম্লানায়মান।

চারপাশে মেধাবী ছেলেদের উঠে আসা সংখ্যালঘু পরিবার থেকে। এর পেছোনে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা আর আল আমিন মিশনের মতো অলাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলোর আশ্রয় রয়েছে। সেদিনই তোষণ থিওরি মেনে নেওয়া যাবে, যেদিন কোনও মুসলিম শুধু প্রিলিমিনারি পাস করেই ডব্লুবিসিএস অফিসার হতে পারবেন। মুসলিম উন্নয়ন মানে ঈমাম ভাতা নয়। বরং তা অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত মুসলমানদের হাতে রাখার কৌশল মাত্র। উন্নয়ন চাইলে যোগ্য মুসলিমদের চাকরিবাকরি সুনিশ্চিত করতে হবে, সর্বোপরি শিক্ষা এবং কালচারে জোর দিতে হবে।

ঘোমটা বা টুপি পরে ইফতার পার্টিতে যাওয়াটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে হতে পারে, উন্নয়নের উদ্দেশ্য নিয়ে নয়।

আজও মুসলিম মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে হতে দেখি, ক্লাস এইটে পড়া ছেড়ে চেন্নাইয়ে কাজ করতে যেতে দেখি। গোটা পাড়ায় একটা পোষ্ট গ্রাজুয়েট মুসলিম নেই। সত্যিকারের মুসলিম উন্নয়ন(তোষণ বলে চালানোর চেষ্টা) হতে অনেক বাকি!

মুসলিম সমাজ তোষণকেন্দ্রিক বিভাজন নয়, উন্নয়ন চান।

সরকারি মাদ্রাসাভিত্তিক শিক্ষাক্ষেত্র ধর্মচর্চার স্থান নয় :

মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়েও মানুষের চিরন্তনী ভুল ধারণা। যা বিভাজনে মুখ্য ভূমিকা নেয়। মাদ্রাসা প্রধানত দুই ধরণের। খারেজী মাদ্রাসায় শুধু আরবি পড়ানো হয়। এইসব ছাত্রদের মধ্যে বাংলাটাই ঠিকভাবে বলার ক্ষমতা থাকে না। এদের দিয়ে সত্যিই দেশের কোনও বিশেষ উপকার হয় না। দু একজন ব্যতিক্রম থাকতে পারেন। অবশ্যই আছেন। সরকার এই মাদ্রাসার খরচ বহন করে না। যাকাত আর দানের টাকায় এই মাদ্রাসা পরিচালিত।

উল্টোদিকে জেনারেল মাদ্রাসা। এটিকে খারেজী মাদ্রাসার সাথে গুলিয়ে ফেলা হয়। এখানে অতিরিক্ত ভাষা হিসেবে আরবি পড়ানো হয়। নিছকই ধর্মচর্চা হয় না। সিলেবাস পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের সমতুল্য।

স্প্যানিশ বা ফ্রেঞ্চ শিখলে আরবি শেখায় সমস্যা থাকতে পারে না।

এইসব মাদ্রাসায় প্রচুর পরিমানে অমুসলিম ছাত্ররা পড়েন, অনেকক্ষেত্রে তাঁরাই টপার। এমনকি আরবিতে সর্বোচ্চ

পান। কিছু বন্ধুবান্ধবকে মাদ্রাসায় পড়ে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার বা সুস্থশিক্ষা সম্পন্ন হতে দেখেছি।

মাদ্রাসাভিত্তিক শিক্ষা আন্দোলন এসেছিলো পিছিয়ে থাকা মুসলিমদের শিক্ষা বিস্তারের জন্য, ধর্মপ্রচারের উদ্দ্যেশ্য নিয়ে নয়। যার সুপ্রাচীন ইতিহাস এবং অবদান ভীষণভাবে রয়েছে। অমুসলিম ছাত্ররাও মাদ্রাসায় পড়তে আসছেন।

জেনারেল মাদ্রাসা যদি দেশের বিকাশে সহায়ক না হতো মাদ্রাসার চাকুরিরত অমুসলিম শিক্ষকেরা প্রশ্ন তুলতেন বা পদত্যাগ করতেন। জেনারেল মাদ্রাসা নিয়ে অনেকের ধারণা নেই। তাই খারেজী মাদ্রাসা দিয়ে মাদ্রাসার সার্বিক সরলীকরণ হয়।

শিক্ষা বা কর্মক্ষেত্রে বাঁকা চাউনি :

কাজের ক্ষেত্রে যেখানে ফটো আইডি দেখা হয় না। সেইসব জায়গায় অমুসলিম পরিচয়ে কাজ করতে হয় নইলে কাজ মেলে না। বহু মুসলিম পরিচারিকা, আয়ারা শাঁখাসিঁদুর ব্যবহার করে মুসলিম পরিচয় লুকিয়ে কর্মস্থলে যান। এ এক অলিখিত নিয়মাবলী ধর্মনিরপেক্ষ দেশে। শুনতে অবিশ্বাস্য লাগলেও স্কুল-কলেজ-কর্মস্থলে কিছুক্ষেত্রে মুসলিম পরিচয় অনেকখানি ফ্যাক্টর। খবরের কাগজে সব ঘটনা প্রকাশ পায় না। যে শিক্ষিত মানুষটি বাড়িতে ভিন্নধর্মী পরিচারিকা রাখেন না, তিনিই ধর্ম নিরপেক্ষতার পাঠ দেন। জীবন এখানে এমনই দ্বিচারিতায় মোড়া।

দলিতদের ক্ষেত্রেও একই সমস্যা। বর্ণবৈষম্য, অনার কিলিং, অধিকারহীনতার শিকার হতে হয় প্রতিনিয়ত।

টুপি-দাড়িতে ভূতদর্শন :

শিখদের পাগড়ি এবং দাড়ি নিয়ে যে সমস্যা নেই কিন্তু একই পরিস্থিতিতে মুসলিম দাড়ি বা টুপি অদ্ভুতভাবে আজও একশ্রেণির কাছে অপাংক্তেয়।

একটা স্পষ্ট ছবি নির্মাণ হয়েছে ধার্মিক নামাজী দাড়িওয়ালা মুসলিমরা গোঁড়া, অথচ অধার্মিক দাড়িবিহীন মুসলিমরা উদার, মর্ডান, লিবেরাল। বিভাজনের এটাও একটি কৌশল। কার্ল মার্ক্স, লেনিন, এঙ্গেলস, লিঙ্কন, বার্নার্ড শ, চশার, শেক্সপিয়র, পাস্তুর, ডারউইন প্রমুখ সহ এদেশের প্রফুল্লচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ পরমহংস, থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কেউ দাড়ি রেখে নিন্দিত হননি। কিন্তু একজন সৎ মুসলমান দাড়ির কারণে বিভিন্ন জায়গায় অপদস্থ হন।

গোরক্ষা, লাভ জিহাদ, ল্যান্ড জিহাদের মতো নতুন ধর্মীয়-রাজনৈতিক শব্দমালার ব্যবহার করে মুসলিম খুনকে ডিফেন্ড করার ঘটনা দেখে বিস্মিত হতে হয়।

রাজনৈতিক স্বার্থে ঐতিহ্য ঢাকার অপচেষ্টা :

মূলত অবাঙালী পৃষ্টপোষকতায় বিভিন্ন বই, প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য সভার মাধ্যমে বাংলার সুমহান সর্বধর্ম সম্প্রীতির ঐতিহ্যকে বিকৃত করে বিভেদের সীমারেখা টানা হচ্ছে। ভুয়ো এবং বিকৃত ইতিহাস সম্বলিত বিভিন্ন বই ছড়িয়ে পড়ছে হাতে হাতে। নির্দিষ্ট প্রোপাগান্ডা মেনেই এটাই চলছে। বিভিন্ন সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণের নামে চলছে দাঙ্গাবাজির পাঠ। এই ধ্বংসকামী দৃষ্টিভঙ্গিকে রুখে দেওয়ার জন্য সরকারি পদক্ষেপ সেভাবে নেওয়া হয়নি। যার মূল কারণ অবশ্যই পারস্পরিক রাজনৈতিক সৌজন্যতা। যার ফল মারাত্মক হতে পারে। বাদুড়িয়ার ক্ষত এখনো দুঃস্বপ্ন হয়ে দেখা দেয়।

এই প্রসঙ্গে সোনারপুরের মিরাজ আজাদ ফেসবুকে অভিজ্ঞতা লিখেছেন - "গতকাল সোনারপুর বই মেলায় গিয়েছিলাম। বইয়ের খোঁজে এক স্টল থেকে আর এক স্টলে যেতে গিয়ে, অবশেষে বিজেপির স্টলে হাজির। ওঁদের স্টলে বিভিন্ন বই উল্টে পাল্টে দেখতে লাগলাম, একটার পর একটা বই দেখছি আর ভয়ে ও উত্তেজনায় শিউরে উঠছি!! কিন্ত আমার ভেতরের উত্তেজনাটা ওদের আদৌ বুঝতে দিইনি। স্টল জুড়ে কেবল ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে অকথ্য মিথ্যা ভাষায় অসংখ্য বই; যেমন ইসলামের স্বরূপ, ইসলামকে জানুন, শয়তানরা ঘুমায়না, নিঃশব্দ সন্ত্রাস, সম্প্রদায় সম্প্রীতির নামে বজ্জাতি,

ছাগলাদ্য নেতৃত্বএবং কাশ্মীর, ভারতে অন্ধকারময় মুসলিম শাসন, আরো নানান বই। বইগুলির প্রতিটি লাইনে কেবল মুসলিদের বিরুদ্ধে কুৎসা, মিথ্যা ও চরম অপপ্রচার। কোন সরল সাদা সিধে হিন্দু ভাই বোন বইগুলি পড়লে মুসলিমদের বিরুদ্ধে তার হিংসা ও ক্রোধ জন্মাবেই জন্মাবে।

বিবেকানন্দকে ওঁরা নিজেদের মত করে সাজিয়ে গুছিয়ে

কয়েকটি বই লিখে বাজারে ছেড়েছেন...”।

ইতিহাস অবলুপ্তির মাধ্যমে বিভেদ সংগঠন :

ভাগ্যের এমন নিষ্ঠুর পরিহাস যে, দেশ বিভাগের জন্য দায়ী করা হয়েছে মুসলমান জাতিকেই। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার যখন কংগ্রেসের কাছে জানতে চান দেশ বিভাগে তাঁদের সম্মতি আছে কিনা। তাতে কংগ্রেসের নেতাদের সম্মতি বিস্ময়কর। ঐ সভায় প্রতিনিধি হিসেবে নেহেরু হাত তুলে সম্মতি জানান।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, জওহরলাল নেহেরু, গান্ধীজী, রাজেন্দ্রপ্রাসাদ প্রমুখদের বিরোধিতা থাকলে জিন্নার শত চেষ্টাতেও দেশভাগ সম্ভব ছিলো না। কারণ জিন্নার প্রভাব কখনও সংশ্লিষ্ট নেতাদের সম্মিলিত ক্ষমতার কাছে নগন্য ছিলো। অথচ বোঝানো হয়েছে দেশভাগে শুধু জিন্না সাহেবরাই দায়ী ছিলেন।

ফাঁসি হওয়া আসফাকুল্লাহ, শের আলী, গোলাম মাসুম এবং প্রাণ দেওয়া আহমাদুল্লাহ, মজনুশাহ, টিপু সুলতান, বেরেলির সৈয়দ আহমদ, আজিমুল্লাহদের ইতিহাস রাজনৈতিক বিদ্বেষ জিইয়ে রাখার কারণেই সহজলভ্য নয়।

প্রাণদাতা মীরকাশিম, মীর নিশার আলী, কারাদন্ডে দণ্ডিত এবং কারাগারেই নিহত ওবাইদুল্লাহ সিন্ধী, সর্বভারতীয় নেতা সৈফুদ্দিন কিচলু, ব্রিটিশদের চিরশত্রু হায়দার আলী, টিপু সুলতানদের ছবি সহজলভ্য হলে শুধু ছাত্রছাত্রীদের অধ্যয়ন ও গবেষণায় সুবিধে হতো না। বরং বিভাজনের রাজনীতি এতো সহজে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারতো না।

জেলখাটা বিপ্লবী আসফ আলী, মাদ্রাজের মোপলা বিদ্রোহের মুসলমান বিপ্লবীরা যেভাবে কারাবরণ এবং মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করেছিলাম সেই রক্তাক্ত ইতিহাস সেভাবে স্বীকৃতি পায়নি।

এমনকি আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্ণেল শাহনাওয়াজ খান, আবিদ হাসান, কর্ণেল রাজা মহম্মদ আরশাদদের আড়াল করা হয়েছে।

গান্ধীবুড়ি মাতঙ্গিনী হাজরার পাশে মহিলা বিপ্লবী হজরতমহল, নেত্রী নুরুন্নিসা, আলী ভাতৃদ্বয়ের জননী আবিদা বিবির নাম উল্লেখযোগ্য হলেও উপেক্ষিত।

ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতার প্রলেপে লেখা ইতিহাসে মোঘল সম্রাটদের নিষ্ঠুর, হিন্দুবিদ্বেষী ইত্যাদি নেগেটিভ বিশেষণে ভরিয়ে দেওয়া ফল হিসেবে বর্তমান সময়ে ধর্মীয় জিগির তোলার জন্য সেই বিকৃত ইতিহাসকে তুলে ধরার প্রবণতা প্রকাশ্যে আসছে।

ইংরেজদের একসময় মোঘল দরবারে গিয়ে নতমস্তকে ব্যবসা করার অধিকার চাইতে হয়েছিলো। এই ঘটনা প্রমাণ করে মোঘলদের গ্রহণযোগ্যতা। অথচ এক মিথ্যে ইতিহাসের অক্ষরনামায় মোঘলরা নিন্দিত হন।

এই অর্ধসত্য আজও ভারতের একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে আক্রমণের বড় হাতিয়ার। যা ক্রমে রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডা হয়েছে। রামমন্দির,

তেজোমহল ইত্যাদির ভ্রান্ত প্রচার দিনদিন দেশের বিচ্ছিন্নকরণে মদত দিচ্ছে।

বিদ্বেষের সাথে পরিচয়, দ্বিচারিতার শহরে :

কলেজ জীবনের সেকেন্ড ইয়ার। ২০১২ নাগাদ বেলঘরিয়ায় মেস নেবো ঠিক করলাম। স্টেশনে সাঁটানো বিজ্ঞাপনে দেখে মেস খোঁজার সময় নজরে এলো এক মেসের বিজ্ঞাপনে লেখা আছে ‘হিন্দু মেস’। ‘কেবলমাত্র হিন্দু ছাত্রদের জন্য’ লাইনটি পড়ে সেই প্রথম প্রত্যক্ষভাবে মনেহয় কেউ যেন আমায় নিম্নশ্রেণির জীব বলে দেগে দিচ্ছে। আদর্শ হিন্দু হোটেলে রুইয়ের কালিয়া, বড়ি দিয়ে সব্জির তরকারি, এঁচোড়ের তরকারি বা মুড়িঘন্ট বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য নয়। কিন্তু এই ‘আদর্শ হিন্দু মেস’ কেবলমাত্র হিন্দু পরিচয়ে বিশ্বাসী। মানুষ শব্দটি পর্যন্ত তথাকথিত শিক্ষিতদের চিন্তাভাবনা এগোয়নি।

মেস খুঁজতে দরজায় দরজায় ঘুরে চরম অপমানিত হওয়ার দিন আমায় অন্য ভারতবর্ষকে চেনার শুরু। যেখানে মুসলিম বা নিম্নবর্ণের মানুষদের জন্য আলাদা সামাজিক সংবিধান হয়।

সহবস্থান মেনে নিয়েও এক অদ্ভুত মানতে না চাওয়ার আবহে ধর্ম তুলে সিনিয়রদের নানানভাবে অপদস্থ করার চেষ্টাগুলোকে যুক্তি দিয়ে প্রতিহত করলেও ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে সবাই চেয়ে থাকতো আমার অভিব্যক্তির উপর। উমর আকমল ছয় মারলে আমি লাফিয়ে উঠি কিনা এই সন্দেহ ছিলো সহনাগরিকদের মধ্যে। পাকিস্তানকে গালাগালি দিতেই হবে নইলে তুমি দেশপ্রেমী নয়। এমন ভ্রান্ত দেশপ্রেম সুলভে

প্রতিপালিত হতে দেখি।

ব্যাপারগুলো ঠিকঠাক অনুভব করতে পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে সংখ্যালঘু জন্ম আবশ্যক।

আত্মীয়তা আঁকড়ে থাকাই সমাধান :

মুসলিম দেখে নাক সিটকানো মনোভাবের পাশাপাশি ছোটবেলা থেকে প্রচুর মানুষের ভালোবাসা পেয়েছি। ধর্মীয় পরিচয়টা সেখানে প্রভাব ফেলেনি। এক থালায় খাওয়া, এমনকি বন্ধুর শার্ট পরে কলেজ যাওয়ার মতো অতি সাধারণ ঘটনাও সামাজিক মেলামেশার জায়গাটা পোক্ত করেছে। মাধ্যমিকের 'জাতীয় সংহতি' প্রবন্ধ তখন খাতার পাতায় আবদ্ধ থাকেনি। নানা ভাষা নানা মতের সংঘবদ্ধকরণ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

পরস্পরকে 'ভাই' ভাবতে পারার মধ্যেই সবকিছু মিটে যায়। তখন কোনও লাভজিহাদ নেই, ল্যান্ড জিহাদ নেই। এগুলো উদারতার ব্যাপার। অর্জনসাপেক্ষ।

ধর্ম, রাজনীতি ইত্যাদির পরিকল্পিত বিদ্বেষকারী মানসিকতা এড়িয়ে আরো বন্ধুত্বপূর্ণভাবে সহাবস্থানই 'সংখ্যালঘু' ট্যাগের উর্ধ্বে মানুষ ভাবতে সাহায্য করবে। ধর্মের উর্ধ্বে গিয়ে বৈবাহিক সম্পর্ক, মেলামেশার পাশাপাশি সম্প্রীতির সিনেমা, কবিতা, গান আমাদের ঘিরে থাক। লালন শাহ, রবিঠাকুর, নজরুলরা সুস্থচিন্তার পয়গম্বর হয়ে থাকুন।

সংখ্যালঘুদের মানুষ ভাবতে না পারলে দেশের একটা অংশ 'সংখ্যালঘু' শব্দেই থমকে থাকবে। বিদ্বেষকে রুখে দিতে না পারলে দেশটাই থাকবে না।

কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা , ২০১৭

ওপার নামা

এই ধারাবিবরণী গুলি কাঁটাতারের অন্য পারের। পড়লেই বোঝা যাবে, এভাবে লাইন টেনে এপার ওপার ভাগ করা আসলে অসম্ভব, কিন্তু এভাবেই তো লাইন টানা হয়েছিল বাস্তবে।

জগতের সকল প্রাণী সুখি হোক

কাবেরী গায়েন

না, আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিচার চাইছি না। বিচার চাইছি না জাতিসংঘের কাছে, বিশ্বনন্দিত কোনো মানবাধিকার সংগঠনের কাছে কিংবা বিশ্ববিবেক নামের কোনো অলীক অস্তিত্বের কাছে। সারা দিন কেটেছে বিভাগের পরীক্ষা নিয়ে, সহকর্মীর জন্মদিনে হাসি-আনন্দে, তারপর সমাজ-রূপান্তর অধ্যয়ন কেন্দ্রের আয়োজনে ড. স্বপন আদনানের সেমিনারে উপস্থিত থেকে, তারও পর আমার বন্ধু, হলজীবনের সাথি, ছাত্র ইউনিয়নের একসময়ের মিছিলে-স্লোগানে-গণসংগীতে প্রিয় সহযোদ্ধা ক্যামেলিয়া রহমানের অপরিণত মৃত্যুর খবরে ছুটে গিয়ে দেখা হয়ে যাওয়া একসময়ের কাছের বন্ধুদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ দু-তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে রাতে বাসায় ফেরার তুমুল ব্যস্ততার মধ্যে।

এই সারাটা দিনের ভেতর আমি পত্রিকা দেখার সুযোগ পাইনি, পেলেও লাভ হতো কি না জানি না। বন্ধু-সহকর্মী রোবায়েত ফেরদৌস একবার ফোন করে বলেছিলেন বটে যে রামুতে বৌদ্ধদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে তিনি যাচ্ছেন প্রেসক্লাবের সামনের জমায়েতে অংশ নিতে। কিন্তু খুব যে মনোযোগ দিতে পেরেছি বলা যাবে না, কারণ, তখন ছুটছি ক্যামেলিয়ার মৃতদেহ যদি একবার দেখা যায়, সেই ব্যগ্রতায়। কিন্তু এই সারা দিনে আমাদের যাপিত জীবনের কোথাও কোনো ব্যত্যয় হয়েছে, মনে হয়নি। যদি হতো, তা হলে রামুতে ঘটে যাওয়া এই তাণ্ডবই তো হওয়ার কথা ছিল সব অস্তিত্বের, সব আয়োজনের, সব বান্ধব-সমাবেশের মূল আলোচনা। এই ঘটনা তো কাউকে স্বস্তিতে না থাকতে দেওয়ার মতোই খবর। বিক্ষোভে, সহমর্মিতায় ফেটে পড়ার কথা এই দেশের প্রতিটি মানুষের। কিন্তু আমার প্রতিবেশে আমি কোনো তাপ-উত্তাপ-আলোচনা শুনিনি। রাত ১১টারও পরে আমার এক বন্ধু আমাকে ফোন করে জানালেন বলেই পত্রিকা খুললাম, ফেসবুকে ঢুকলাম। হায়! এই দেশে যাঁরা ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ নন, তাঁদের জীবন, সম্পদ, ধর্ম আর বিশ্বাসের ওপর যত বড় আঘাতই আসুক না কেন, যত বড় আগুনের শিখাই পুড়িয়ে দিক না কেন, তাঁদের জীবন-বসত-দেবতা যত অমূলক কারণেই হোক না কেন, তা আমাদের সুখি-সন্তুষ্ট জীবনে কোনো দাগ কাটে না। জনপরিসরে কোনো তরঙ্গ তোলে না। আমাদের অনিঃশেষ সুখি জীবন সুখেই থাকে। জগতের সকল প্রাণী সুখি হোক তথাগত!

পত্রিকান্তরে যা দেখলাম, দেখলাম যা ব্লগে, ফেসবুকের ব্যক্তিগত ট্যাগে—যে আগুন, যে বেদনা, যে তাণ্ডব, যে ধ্বংস এবং তার যে কারণ, আমার চামড়া পুড়ে যাচ্ছে, ঘৃণার এই উৎসব দেখে। কত হাজার মানুষের মধ্যে কত কত বছর ধরে, কত বড় ঘৃণার নিত্য চাষাবাদ থাকলে কেবল কোনো এক উত্তম বড়ুয়ার ফেসবুকে অন্য কারও ট্যাগ করা কোনো ছবি বা বক্তব্যকে কেন্দ্র করে জ্বালিয়ে দেওয়া যেতে পারে সাতটি বৌদ্ধমন্দির, ১০টি বৌদ্ধ গ্রাম আর পূর্ব মেরাংগোলা জনপদ। যখন আগুন জ্বলেছে 'সাদা চিং', 'লাল চিং', চেরাংঘাটা বারাক্যং মন্দির, রামু মৈত্রী বিহার, রামি সিনা বিহার, জাদিপাড়া বৌদ্ধবিহার, ধূলিসাৎ করা হয়েছে নির্মাণাধীন ১০০ ফুট উঁচু বুদ্ধবিগ্রহ, তখন নিশ্চয়ই সুখি হয়েছেন ধর্মের ধ্বজাধারী সেই সব মানুষ, যাঁরা পুড়িয়েছেন এসব দেবালয়। যখন ১০টি বৌদ্ধ গ্রামে আর পূর্ব মেরাংগোলা জনপদে আগুন জ্বলেছে মানুষের হিংসার সমান উঁচু লেলিহান শিখা নিয়ে, তখন সেই হিংস্র মানুষেরা নিশ্চয়ই সুখি হয়েছেন। যে আগুন জ্বালানো শুরু হয়েছে রাত সাড়ে ১১টায় বৌদ্ধপাড়ায়, আহা নিশুতি গাঢ় ঘুমের সময়, রাত সাড়ে তিনটা পর্যন্ত আগুন লাগিয়ে সেই সব অতৃপ্ত মানুষ সুখি হয়েছেন নিশ্চয়ই? যাঁরা আগুন লাগিয়েছেন, বাংলাদেশের শাসনসীমার মধ্যেই তাঁরা বসবাস করেন এবং এই সীমার মধ্যে বসবাস করেও যেহেতু তাঁরা নির্বিঘ্নে আগুন লাগাতে পেরেছেন, আমরা ধরে নিতে পারি, তাঁরাই কেবল প্রকৃত অধিবাসী এ দেশের। তাঁদেরই কেবল ধর্ম পালনের অধিকার এ দেশে, তাঁদেরই কেবল অধিকার তাঁদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দেওয়ার অজুহাতে উত্তম বড়ুয়ার ফেসবুকে অন্য কারও ট্যাগ করা কোনো মেসেজের কারণে জীবন-জনপদ-দেবালয়-দেবতাকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার। তাঁদের অহং নিশ্চয়ই তৃপ্ত হয়েছে। তাই বলি, মৃত্যু-ধ্বংস-কান্না-লুট করেও যাঁরা বহাল তবিয়তে জানিয়ে দিতে পেরেছেন

বাংলাদেশের বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীকে, এর আগে সাতক্ষীরায়, হাটহাজারীতে হিন্দু জনগোষ্ঠীকে, নিশ্চয়ই তাঁরাই কেবল এ দেশের অধিবাসী। এ দেশের সুরক্ষা কেবল তাঁদের জন্যই। অন্যরা এসব মানুষকে সুখি করার প্রয়োজনীয় ক্ষয়ক্ষতি মাত্র। এইসব মানুষেরা সুখি হোক।

আমি জানি না, যে ১০টি বৌদ্ধ গ্রামে আগুন লাগানো হলো, লুট করা হলো, কত মানুষ মারা গেলেন বুঝি জানা যাবে না কোনো দিন, সেই সব বৌদ্ধ জনপদের কতজনের বাড়িতে ফেসবুক আছে। জানি না, যাঁরা দফায় দফায় মিছিল করে আগুন লাগালেন, ধ্বংস করলেন, লুট করলেন, দেবতাকে তুচ্ছ করলেন, তাঁদের কতজনের বাড়িতে ফেসবুক আছে এবং তাঁদের কতজন সেই সব ফেসবুকে উত্তম বড়ুয়ার দেয়ালের ট্যাগ পড়েছিলেন! কিন্তু আগুন যে জ্বলল, মানুষের জীবন-জনপদ-বিশ্বাস-স্বপ্ন লুণ্ঠন হলো, গুঁড়িয়ে গেল—সে তো আমরা দেখলাম!! কোনো দিন কি জানতে পারা যাবে, কোন বেহেশতের লোভ দেখিয়ে এই মানুষগুলোকে উদ্দীপ্ত করেছে কে? যদি জানা না যায়, জানানোতে বাধ্য না করা যায়, তবে বুঝতে হবে এই আগুন লাগিয়েছি আমরা সবাই। শুধু রাষ্ট্রযন্ত্র নয়, শুধু ধর্মান্ধ রাজনীতি নয়, এ দায় আমাদের সবার।

'টাইরানি অব অ্যাপাথি' বলে একটি কথা আছে। এই অ্যাপাথি এক দিনে তৈরি হয় না। সয়ে যেতে যেতে, সয়ে যাওয়ার রাজনীতিতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে যাই। আলথুজার কথিত রাষ্ট্রীয় মতাদর্শিক হাতিয়ারগুলো আমাদের সয়ে যেতে শেখায়। এসব হাতিয়ার একই রাষ্ট্রের মধ্যে এক ধর্মের চেয়ে অন্য ধর্মকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। এক নৃগোষ্ঠীর মানুষের চেয়ে অন্য নৃগোষ্ঠীর, এক ধর্মের মানুষের চেয়ে অন্য ধর্মের মানুষকে হীনতর করে দেখার সংকেত সমাজে দাপটের সঙ্গে বজায় রাখে বলেই, আক্রান্ত বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর ওপর বা সাতক্ষীরার হিন্দু জনগোষ্ঠীর ওপর নিপীড়ন সত্ত্বেও নিপীড়নকারী দোষী সাব্যস্ত হন না। রাষ্ট্র বড়জোর তাদের ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি তুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েই কর্তব্য সাধন করে। এবং এসব করা হয় তো সমাজের অনুভব কাঠামোকে ভোঁতা করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে। টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে তন্নতন্ন করে খুঁজেও এই ঘটনার কোনো রেশ পাওয়া গেল না। কোনো টক শো হলো না। অর্থাৎ মূল ধারার জনপরিসরে ঘটনাটি গুরুত্বই পেল না। এটি শুধু ঘটনাটিকে গুরুত্বহীন করে ফেলার প্রক্রিয়া নয়, এটি অদৃশ্য বা অনুপস্থিত করে ফেলার প্রক্রিয়া।

আমাদের দিন শেষে বাড়ি ফিরে তাই সিরিয়াল দেখায় কোনো সমস্যা হয়নি। শাহবাগে কোনো যানজট তৈরি হয়নি। টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর কোনায় একরত্তি কালো কাপড়ের শোকচিহ্ন দেখা যায়নি। কোনো পত্রিকায় 'বাংলাদেশ রুখিয়া দাঁড়াও' মর্মে কোনো ব্যানার-শিরোনাম প্রকাশিত হয়নি। আসলে আমাদের কোনো অস্বস্তি তৈরি হয়নি। আমাদের কোনো ক্ষোভ নেই। বৌদ্ধ জনপদের ওপর নেমে আসা এই বর্বর ঘটনাযজ্ঞের প্রতিবাদে কেবল হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদেরই একটি সমাবেশ হয়েছে বলে জাতি হিসেবে আমরা লজ্জিতও হইনি। আর যাঁরা একটু বেশি সংবেদনশীল বলে ভাবতে ভালোবাসি নিজেদের, বড়জোর ফেসবুককে শেষ ভরসা মেনে একটা স্ট্যাটাস দিয়েই সুখি হয়েছি, ভাতঘুমের রেশ না কাটিয়েও সেই স্ট্যাটাসটি দেওয়া সম্ভব। কেনই বা না? জগতের সকল প্রাণীরই সুখি হওয়ার অধিকার আছে। ঘরপোড়া হাজারো মানুষের প্রাণের আতঙ্ক আমাদের সুখকে টলাতে পারবে, সে ভরসা কম। রামু-উখিয়ার যে শিশুটির চোখের সামনে তার দেবতা-মন্দির ধূলিসাৎ হয়ে গেল, বাড়িঘর পুড়ে গেল, বাঁচার শেষ সম্বল লুট হয়ে গেল আর তাঁর নিরাপদ আশ্রয়ের প্রতীক মা-বাবার পরাজিত অসহায়ত্বই একমাত্র সত্য হয়ে উঠল তার জীবনে, তার 'নিজ দেশে', সেই শিশু আমাদের তৃপ্ত অস্তিত্বে এতটুকু চিড় ধরাতে পারেনি। র্যা ব-পুলিশ-মন্ত্রী-প্রশাসনের কাছে তাই আমার কোনো চাওয়া নেই।

আসুন, আমরা কেবল আমাদের সুখকে নিশ্চিত করি। আমরাই সকল। জগতের 'সকল' প্রাণী সুখি হোক, আমাদের সুখ অক্ষয় হোক।

সংযোজন :

হে হে...হিন্দুর দেবতা যদি সত্যি থাকবে তয় হেগো দেবী ঠেকায় না ক্যান? মানুষ ভাঙ্গে ক্যামনে? কই মুসলমানের মসজিদ কেউ তো ভাঙ্গতে পারে না?' শিক্ষক-খেলার সাথী-সহকর্মী অনেকের মুখেই এসব কথা শুনে বড় হয়েছি এবং এখন মধ্যবয়সেও একই কথা শুনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বাসে প্রবীণ শিক্ষক অনায়াসে বলে ফেলেন, 'ভালোই তো হইছে, রামুর ভাঙ্গা-চুরা কয়খান টিনের ঘর ভাঙ্গনের

পর সেইহানে নতুন বিল্ডিং হইছে। হ্যাগো তো লাভই হইছে। লাভ হইছে না?' এসব শুনেও না শোনার ভান করে থাকার অভ্যাস আজন্মের। কিল খেয়ে কিল চুরি করে থাকার মতো। ভারতের আখলাকরা নিশ্চয়ই জানেন এই কিল খেয়ে কিল চুরি করার বিষয়টা। শহরে থাকার কারণে মা পূজা করেছেন ফুল, উলুধ্বনি এবং ঘণ্টা না বাজিয়েই। তাঁর বামপন্থী সন্তানেরাও পাত্তা দেয়নি কোনদিন।

নিত্য বছর প্রতিমা ভাঙ্গে। আমাদের অধিকাংশ সাংবাদিক অবশ্য গণমাধ্যমে 'মূর্তি ভাঙ্গা'র খবর দেন। সম্ভবত 'প্রতিমা' আর 'মূর্তি'র পার্থক্য তাঁরা জানেন না, তাঁদের হাউস থেকেও শেখানো হয় না। শুনেছি ১৯৭২ সালেও অষ্টমী পূজার দিন কোথাও প্রতিমা বিসর্জন দিতে হয়েছিলো। তবুও হিন্দুরা পূজা করেন। কোন প্রতিবাদ ছাড়াই। তাঁদের অনেকেই মনে করেন, প্রতিমা আসলে ভাঙ্গা যায় না। যাঁরা বিশ্বাসী, প্রতিমা তাঁরা অন্তরে ধারণ করেন। তাই প্রতিমা ভাঙ্গলেও তাঁরা পূজা চালিয়ে যেতে পারেন। অনেক পরিবারে দুর্গা তাঁদের মেয়ে। বৎসরান্তে বাপের বাড়িতে বেড়াতে আসে।

পাবনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ার সময় হিন্দু ধর্মের ক্লাস নিতেন যে অপর্ণাদি, তাঁর পৈতৃক বাড়ির পূজা দেখতে গিয়ে সে'কথা বুঝেছিলাম। আমাদের বাসায় অবশ্য সরস্বতী পূজা ছাড়া অন্য পূজার তেমন কোন আয়োজন ছিলো না। অতি সৎ সরকারি চাকুরে বাবা সব ভাইবোনকে দুর্গা পূজায় নতুন জামা দিতে পারতেন না। তখনো পূজার বোনাস শুরু হয়নি। আমরা ছোট দুই বোন জামা পেতাম, দিদি হাতে সেলাই করতো। একদিন বড় ভাইবোনদের প্রহরায় পূজা দেখতে যাওয়া ঘণ্টা দুয়েকের জন্য, আর পূজার খাওয়া-দাওয়া একদিন, বিশেষ করে বাবার অফিসের সহকর্মী এবং পাড়াপড়শিদের । এর বাইরে পূজা আমাদের কাছে তেমন তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি। অবশ্য দিদি আর দাদারা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল আর বুয়েট থেকে বাসায় ফিরতো। পূজা বলতে ওদের ঘরে ফেরার আনন্দটুকুই। আর পূজাসংখ্যা আনন্দবাজার, শারদীয় দেশ। এই তো!

প্রতিমা ভাঙ্গার অভিযোগে কোন মানববন্ধনে কোনদিন দাঁড়ানোর তাড়না বোধ করিনি। তবে, সাতক্ষীরা, পাথরঘাটা, বেগমগঞ্জ, কর্ণেই-গড়েয়া, দিনাজপুর, নাটোরে মানুষের জীবনের উপরে যখন শুধু একটি ধর্মে বিশ্বাসী হবার কারণে অমানবিক নির্যাতন নেমে এসেছে গত বছরগুলোতে, তখন সেইসব জনপদে গেছি, দেখে এসেছি নিজের চোখে তাঁদের ভয়। লিখেছিও এক-আধটু, তবে রামুর ঘটনার পরে যেভাবে লিখেছি, অতোটা নয়। ভেবেছি, আমি কেনো লিখবো এবিষয়ে? আমার বন্ধু, সহযোদ্ধারা লিখবেন।

একটা সময়ে বিশ্বাস করতাম, যাঁদের সাথে চলি-ফিরি, যাঁদের সাথে দেশের মানুষের তাবৎ দুঃখে পীড়িত হয়ে রাস্তায় দাঁড়াই, তাঁরা নিশ্চয় সমব্যথী। আমার সেই ঘোর ভুল ভেঙ্গেছে নিজের পয়সায়, কখনো সাথে বন্ধু-সহকর্মী রোবায়েত ফেরদৌসের পয়সায় আর উদ্যোগে মঞ্চ বানিয়ে লোক ডেকে নেমন্তন্ন করে বক্তৃতা দিতে ডাকার পর। তাঁরা বেশ গলা কাঁপিয়ে বক্তৃতা করেছেন, 'বাংলাদেশ অসাম্প্রদায়িক দেশ। জামাত-শিবির এদেশে ঘৃণ্য রাজনীতি করেছে। তাদের বিরুদ্ধে আমরা জয়লাভ করবোই। ওরা গুটিকয়েক। এই দেশ ধর্মনিরপেক্ষ' ইত্যাদি। কানে ধরেছি, আমি আর কোন মঞ্চ বানিয়ে কাউকে বক্তৃতা করার সুযোগ করে দেয়া তো দূরে থাক, আমাকে ডাকলেও আমি এধরণের কোন বক্তৃতামঞ্চের আশেপাশে যাই না অনেকদিন হলো। আমি পরিষ্কারভাবে বুঝেছি, গুটিকয়েক ধর্মান্ধ মানুষের কাজ এগুলো নয়।

আমাদের সমাজে-রাজনীতিতে-কাছের মানুষদের মধ্যেও এসব ঘটানোর পৃষ্ঠপোষকতা আছে বলেই বছরের পর বছর এগুলো হতে পারছে। আর কিছু না হোক, বছরের পর বছর সব দেখেশুনেও যে নির্লিপ্তি এবং হাসিঠাট্টা করে পার করে দিচ্ছেন আমাদের বিদ্বৎ সমাজ, এটি প্রশ্রয়ের চেয়ে কিছু কম নয়। যাঁদের দেখছি প্রতিবাদ করছেন দীর্ঘকাল ধরে, এসব ঘটনা ঘটার পরে, দেশের শীর্ষ বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে তৈরি এমনই এক বিখ্যাত প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেছিলাম একবার, 'আপনারা এদেশে থাকতে, এমন অবস্থায় এলো কীভাবে দেশ? যে প্রতিবাদ বছরের পর বছর চলার পরেও কোন পরিবর্তন হয় না, সেই প্রতিবাদ নিয়ে আমি সন্দিহান।' সেই প্ল্যাটফর্মের সব বক্তারা নিজেদের অক্ষমতার কথা স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু এই স্বীকারে কী হয়? তাঁদের সমর্থিত রাজনৈতিক শক্তি-ই তো ক্ষমতায়। তবু কেনো এই নিরন্তর বলপ্রয়োগ থামে না?

আমি সত্যি-ই বিশ্বাস করি না, কোনদেশে রাষ্ট্রধর্ম বহাল রেখে, অর্পিত সম্পত্তি আইন বহাল রেখে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা মুখে বলা চলে। এদেশের হিন্দুসহ অন্যান্য ধর্মীয় ও জাতিগত মানুষেরা বেঁচে আছেন এদেশের ধর্মীয়

সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বদান্যতায়। যতদিন পর্যন্ত তাঁরা পাশের বাড়ির হিন্দু ব্যক্তির জমি বা দোকানের দিকে নজর না দিচ্ছেন, মন্দিরটা ভাঙ্গতে না চাইছেন, ততোদিন ঠিক আছে। কিন্তু একবার নজর দিলে আর রক্ষা নাই। রাষ্ট্রের কোন সুরক্ষা নেই। একটা সময়ে হিন্দু ভোটের দরকার হতো। জনসংখ্যা যখন ২৯ শতাংশ থেকে ৮ শতাংশে পৌঁছাতে পেরেছে, তখন তাঁদের ভোট কিছু মূল্য আর বহন করে না। এই পরিস্থিতিতে হিন্দু-বৌদ্ধ-সাঁওতাল-চাকমা-গারো-মারমারা কী ভাবছেন, কিছু আসে যায় না। আমি বরাবর বলে এসেছি, এখনো মনে করি, এই দেশের ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষেরা এই দেশে অন্য ধর্মের, অন্য জাতিসত্তার মানুষদের দেখতে চান কি না, দেখতে চাইলে কীভাবে কতোটা দেখতে চান, তার উপরেই নির্ভর করছে এখনো যাঁরা আছেন, তাঁরা থাকবেন, না কি এই দেশটি এক ধর্মাবলম্বী মানুষের দেশ হবে। কয়েকদিন আগে মহালয়া গেলো। যতোজন পোস্ট দিয়েছেন, প্রায় সবাই লিখেছেন, এটা একটা শৈশবস্মৃতি মাত্র। এই প্রজন্মের পরে স্মৃতিটুকুও আর থাকবে না। তখন দুখজাগানিয়া পোস্টও আর কেউ দেবে না।

আমাদের এতো এতো বুদ্ধিজীবী, নোবেল পাওয়া শান্তিবাদী, পদকপ্রাপ্ত শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী-মানবাধিকার কর্মী কেউ কিছু বললেন না। এই বিষয়ে লেখাও বাদ দিয়েছি কয়েক বছর হলো, এমনকি খবরগুলোর দিকে তাকাই না পর্যন্ত। কারণ সাংবাদিকতার শিক্ষার্থী হিসেবে জানি, স্ট্যান্ডিং ম্যাটার পড়ার জিনিস না। তবুও আজ বোনপ্রতিম বন্ধু অদিতি কবির খেয়ার ফেসবুক দেয়ালে কয়েকদিন আগে শেয়ার করা দেবাশীষ দাসের এক পোস্ট দেখে দু'মিনিট সময় দিলাম।

তিনি লিখেছেন:

"আসুন গেল দুই মাসের প্রতিমা ভাঙার লিস্ট দেখুন ; উৎসব এর পরেও কি মনে আসে?

১.শেরপুরে ৪০ বছরের পুরনো মন্দিরের আসন্ন দুর্গাপূজার ৩ টি প্রতিমা ভাংচুর করেছে দুর্বৃত্তরা। (শেরপুর নিউজ২৪ / তারিখ ১৩ই অক্টোবর ১৫)

২.ডিমলায় মন্দিরের মূর্তি ভাংচুর (দৈনিক যুগান্তর/ ২রা সেপ্টেম্বর ২০১৫)

৩.মধুখালীতে মন্দিরের মূর্তি ভাংচুর (দৈনিক যুগান্তর/ ২৩শে সেপ্টেম্বর ২০১৫)

৪.সাভারে একটি মন্দিরের কয়েকটি মূর্তি ভাংচুর (শীর্ষ নিউজ ডট কম ১লা সেপ্টেম্বর ২০১৫)

৫.হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জ উপজেলা রামকৃষ্ণ সেবা আশ্রমের দুর্গাপূজার দু'টি মূর্তি ভাংচুর করেছে দুর্বৃত্তরা। (একুশে টেলিভিশন)

৬.নাটোরে মন্দিরের ৫টি মূর্তি ভাংচুর (মানব কণ্ঠ ১০ অক্টোবর ২০১৫)

৭.ফরিদপুরে প্রতিমা ভাংচুর (বিডি নিউজ ২৪/ ২২ সেপ্টেম্বর)

৮.সাতক্ষীরার আশাশুনি উপজেলায় আসন্ন দুর্গা পূজার জন্য তৈরি ১৫টি প্রতিমা

৯.ভেঙে ফেলেছে দুর্বৃত্তরা। (বিডি নিউজ ২৪/ ৭ অক্টোবর ২০১৫)

১০.বড়লেখায় দুর্গা প্রতিমা ভাংচুর করেছে দুর্বৃত্তরা (সিলেটটুডে ২৪/ ১৩ অক্টোবর ২০১৫)

১১.নাটোরের বড়াইগ্রামে দুর্গা প্রতিমা ভাংচুর (আমাদের সময়ডট কম / ১০/১০/২০১৫)

১২.পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার পশ্চিম অলিপুরা গ্রামের একটি মন্দিরে দুর্গা প্রতিমা ভাংচুর করেছে দুর্বৃত্তরা। (হিন্দু ওয়াপ ডট কম/১১/১০/২০১৫)

১৩.সিরাজগঞ্জে মন্দিরের প্রতিমা ভাংচুর (বিএম দ্য রিপোর্ট ডট কম ০১/১০/২০১৫)

১৪. হিন্দু মন্দিরে হামলা,বগুড়ার গাবতলীতে কালি মন্দিরের প্রতিমা ভাংচুর (০২/০৯/২০১৫)

১৫.ভালুকায় মন্দিরে প্রতিমা ভাংচুর (ভালুকা নিউজ ২৪ডট কম ১৩/১০/২০১৫)

১৬. কালিয়াকৈরে প্রতিমা ভাংচুর (চ্যানেল সেভেন ডট কম ১৩/১০/১৫)

১৭.রায়গঞ্জে প্রতিমা ভাংচুর (অনাবিল ডট কম ১৩/১০/২০১৫)

১৮. মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার নবগ্রাম ইউনিয়নের পাঁছ বারইল গ্রামে মন্দিরের মূর্তি ভাংচুর করেছে দুর্বৃত্তরা -(বিডি লাভ ২৪ / অগাস্ট ২০১৫)

১৯. মঙ্গলবার দিবাগত রাতে ঝিনাইদহের শৈলকূপা উপজেলার বগুড়া ইউনিয়নে প্রতাবনগর গ্রামে সার্বজনীন শিব মন্দিরের দু'টি মূর্তি ভাংচুর করেছে দুর্বৃত্তরা (বাংলাদেশ প্রতিদিন অগাস্ট ২০১৫)

২০. মঙ্গলবার দিবাগত রাতে ঝিনাইদহের শৈলকূপা উপজেলার বগুড়া ইউনিয়নে প্রতাবনগর গ্রামে সার্বজনীন শিব মন্দিরের দু'টি মূর্তি ভাংচুর করেছে দুর্বৃত্তরা (খবর বিতান ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৫)

২১. বাগেরহাটে সার্বজনীন দুর্গা মন্দিরের প্রতিমা ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা (বাংলা পোস্ট ২৪ ১৩ অক্টোবর ২০১৫)

২২. দাকোপে দুর্গা প্রতিমা ভাংচুর (বিডি নিউজ ২৪)

২৩. বাগেরহাটের মোল্লাহাটে হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি ঐতিহ্যবাহী সার্বজনীন দুর্গা মন্দিরের প্রতিমা ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা। (এপ্রিল ২০১৫, বাগেরহাট ইনফো)

২৪. দিনাজপুরে দুর্গা প্রতিমা ভাংচুর (২২ সেপ্টেম্বর ২০১৫ / উত্তর বাংলা ডট কম)

২৫. হালুয়াঘাটে দুর্গা প্রতিমা ভাংচুর (৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫/ ময়মনসিংহ বার্তা)

২৬. কাউনিয়ার অপরাজিতা কুঞ্জ মন্দিরের দুর্গা প্রতিমা ভাংচুর (বরিশাল ওয়াচ ডট কম / অক্টোবর ২০১৫) ."

আমরা জানি, এটি চলমান এক প্রক্রিয়া। এর পরেও আরো আরো কতো প্রতিমা, কতো মন্দির ভাংলো। এই লেখাটি যখন লিখছি তখনো চোখের সামনে সাতক্ষীরায় তিনটি মন্দির ভাঙ্গার খবর। পূজা আর প্রতিমা ভাঙ্গাকে সমার্থক জেনেই এদেশের হিন্দুরা পূজা করেন। এইসব মানুষদের কোন অনুভূতি থাকতে পারে, আমাদের রাষ্ট্র আর সমাজ সে'কথা মনে করে না। যাঁরা সহানুভূতিশীল বলে দাবি করেন, তাঁরা বড়জোর ফেসবুকে একটা স্ট্যাটাস দিয়েছেন। অনেকের ফেসবুকেই দেখছি লিখছেন, 'নিন্দা জানাই'। কার কাছে জানাচ্ছেন তাঁরা নিন্দা? তবুও এই নোটটি লিখতাম না, দিন তিন/চারেক আগে একটি চিঠি না পেলে।

আমার এক প্রাক্তন ছাত্রী লিখেছেন আমাকে ইনবক্সে, "ম্যাডাম, আমাদের বংশানুক্রমে চলে আসা পারিবারিক পূজা এবার আর করা হলো না। এতো বেশি চাঁদা চাইছে এলাকার লোকজন, নানাভাবে ডিস্টার্ব করছে। মহালয়ার দুই সপ্তাহ আগে আমাদের ভূঁই-এর সব কলাগাছ কেটে রেখে গেছে। আমার ভাইটা বড় হয়েছে, ওর প্রাণের ভয়ও আছে। নিজেরা ঘরেই ঘট পাতবো ঠিক করেছি। বড়মা বলেছেন, পূজা তো পুষ্পকর্ম। দেবীর শ্রদ্ধা তো কমে যাবে না। উৎসব না হয় না-ই হলো। বাবা তো আগেই গেছেন আপনি জানেন, বড় জ্যেঠুও দেহ রেখেছেন বছর তিনেক হলো। কাকারা মনখারাপ করলেও মেনে নিয়েছেন। ভাইটাকে নিয়ে বড় চিন্তা হয়। একটাই ভাই। কথায় কথায় থ্রেট দেয় ওকে। ভারতে চলে যেতে বলে।" চিঠিটা পড়ার পর খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ছিলাম। আমার এই স্তব্ধ হয়ে থাকাটাও এক বিরাট ন্যাকামি। যেনো এই প্রথম শুনলাম এমন ঘটনা! নিজের ন্যাকামিতে লজ্জা পেয়ে একটু পরেই কলিম শরাফীর গান শুনে লজ্জা কাটিয়েছি সেদিন।

পূজা আসলেই পুষ্পকর্ম। ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো। শুধু ফুলটা মলিন হয়ে গেছে। এই মলিন ফুলে শুভেচ্ছা জানানো যায় কি না, সত্যিই আর ঠিক বুঝতে পারছি না।

ঢাকা, ২০১৩ ও ২০১৫

প্রথম প্রকাশ : তারিখ: ০২-১০-২০১২ , প্রথম আলো, পুনর্মুদ্রিত। সংযোজন অংশের প্রথম প্রকাশ : *http://www.sylhet-today24.com/opinion/details/8/251*, পুনর্মুদ্রিত।

লজ্জার ২৫ বছর

মহম্মদ সাদেকুজ্জামান শরীফ

২৫ বছর পূর্তি। আমাদের লজ্জার ২৫ বছর পূর্তি। আমাদের মূর্খতার ২৫ বছর পূর্তি। আমাদের চোখ বন্ধ করে রক্ত নিয়ে হোলি খেলার ২৫ বছর পূর্তি। আজকে ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার ২৫ বছর পূর্তি হল। ধর্মের নামে, ধর্মের লেবাস পরে অধর্ম সে দিন পৃথিবীর বুকে দারুণ ভাবে নেমে এসেছিল। হাজার মাইল দূরে কিছু মানুষ নামের অমানুষ হঠাৎ ধর্ম রক্ষার মিশনে নেমে গিয়েছিল সেদিন। আর তার মূল্য চুকাতে হয়েছিল বাংলাদেশ নামক গরিব এক দেশের পল্লিতে বাস করা হাজার হাজার হিন্দু পরিবারকে। আমরা আজকে জানি সেদিন কোন কিছুই হঠাৎ করে হয়নি। সুপরিকল্পিত দাঙ্গা তৈরি করা হয়েছিল সেদিন। বাবরি মসজিদের পাশে সমাবেশ করার কথা বলে মসজিদকেই গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাদের হিসাব ছিল ভিন্ন, তাদের হিসেবের বাহিরে ছিল ভারত বাংলাদেশের হাজার হাজার হিন্দু মুসলমান পরিবার।

আমাদের শান্ত শীতল মফস্বল শহরেও সেদিন আলোড়ন তৈরি করেছিল দারুণ ভাবে। বয়স ছিল অল্প, কিন্তু দিব্যি মনে আছে শেরপুরের প্রায় সমস্ত মন্দির গুঁড়িয়ে দেওয়ার কথা। সবার মুখে মুখে গল্প। কোন মন্দির কিভাবে ভাঙ্গা হলো। এ যেন খুব স্বাভাবিক ঘটনা। দুই মিনিটে নুডুলস রান্নার মত। প্রাচীন মন্দির নিমিষে ফিনিশ। আজকে আমি নাম ধরে ধরে বলে দিতে পারব সেদিন কারা কারা জড়িত ছিল মন্দির ভাঙ্গার ঘটনায়। কারা নেতৃত্ব দিয়েছিল এক অদ্ভুত একপেশে দাঙ্গার। মানুষরূপী পিশাচরা আজও সমাজে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। অনেকে নদী পার হয়ে ওই পারে হিসেব দিচ্ছে হয়ত কৃত পাপের।

যে সব জায়গায় হিন্দু পরিবারগুলো একসাথে থাকে, হিন্দু পাড়াগুলো অনেক নিরাপদ ছিল সেদিন। তারা রাত জেগে পাহারার ব্যবস্থা করে। পালা করে টহল দিয়ে পরিবার সমাজকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছে, রক্ষা করেছেও। আতঙ্ক কাকে বলে তা বুঝতে পেরেছিল যে হিন্দু পরিবারগুলো হিন্দু পাড়ার বাইরে থাকত, তারা। শেরপুরে তেমন কিছু হয়নি তবে দেশের অনেক জায়গায়ই এই রকম পরিবার গুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। মসজিদ ভাঙ্গার পরের দিন আমি যখন স্কুলে গেলাম তখন স্কুলের সামনের সুকুমারদার দোকানের সামনে জটলা দেখেছিলাম। কাছে যাওয়ার পরে শুনলাম সুকুমারদার ভাই হরিদাস দা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে সবার কাছে - "আসলে ভারতে তেমন কিছু হয়নি, বাবরি মসজিদের দুই একটা ইট টান দিয়েছে শুধু, না, এটা করাও ঠিক হয়নি, কিন্তু তার জন্য এই ভাবে সব মন্দির.... " সেদিন বুঝিনি, ভাবছি এ্যাহ, মসজিদ ভাঙ্গছে আবার তার সাফাই গাইছে!! কিন্তু আজকে বুঝি উনি আসলে কি বলতে চাচ্ছিলেন। আজকে যখন দেখি সুকুমারদার দোকানটা আর সেই জায়গায় নাই তখন বুঝি, হরিদাসদা কেন সাফাই দিচ্ছিলেন আজকে বুঝি যখন দেখি তারা কেউই আর দেশে নাই, পুরো পরিবারই সীমান্ত পাড়ি দিয়েছে কোন এক তীব্র আতঙ্কে, যা আমার মত মুসলমানের বোঝা সম্ভব না হয়ত কোন দিনই।

বিপদের সময় মানুষ চেনা যায়। অতি পুরাতন কথা। শেরপুরের বুকেও সেদিন মানুষ মানুষ চিনেছিল। প্রায় দুইশ বছর পুরাতন মন্দির হচ্ছে আখড়া বাড়ি মন্দির। সেই মন্দির একাই রক্ষা করেছিলেন একজন। নিজের বন্দুক হাতে মন্দিরের গেটে দাঁড়িয়ে ছিলেন। নেকি লোভী কাউকে কাছে ঘেঁসতে দেননি। রক্ষা পেয়ে যায় আখড়া-বাড়ি মন্দির। নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভাল থাকার কারণে বেঁচে যায় মহিলা কলেজ মন্দির। ধুলায় মিশে যায় শনিবাড়ি মন্দির, মূর্তি ভেঙ্গে তার উপরে উঠে নেচেছে রঘুনাথ বাজার কালি মন্দিরে। তবে যেটা বললাম, প্রচুর মুসলিম পরিবার হিন্দু পরিবারকে বাড়িতে এনে নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিল সেদিন। আসলে মুসলিম পরিবার হিন্দু পরিবারকে না, মানুষ মানুষ কে সাহায্য করে ছিল সেদিন।

এত বছর পরেও হিন্দুদের কাছে আতঙ্কের নাম ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর। আমার সমবয়সী যারা তাদের স্মৃতিতে যা আছে তা হচ্ছে নিখাদ আতঙ্ক। একজন বলছিল তাদেরকে রাতে ঘুমাতে দিত না তাদের অভিভাবক। কখন ঘরে কেউ আবার আগুন দিয়ে দেয়!! আরেক জন বলেছিল ওর বেশি কিছু মনে নাই, ওদের বাসা ছিল শহরের মাঝখানে, ও গেটের

ফাঁক দিয়ে অনেক মানুষ দেখেছিল, সবার মাথায় টুপি আর গায়ে পাঞ্জাবি, তারা যাচ্ছিল আর তাদের বাড়ির উপরে ঢিল ছুড়ছিল, লাঠি দিয়ে বাড়ি দিচ্ছিল। আহ! আমার শান্তির ধর্মের লেবাস!! মোল্লারা যার জন্য নিত্য কথা শোনায় আমাদেরকে!

আমাদের শহরে মন্দির ভাঙ্গা হলেও প্রাণহানি বা অন্য কোন নাশকতা হয়নি। তবে সবাই আমাদের শহরের মত ভাগ্যবান ছিল না। সারা বাংলাদেশে ৬ এবং ৭ তারিখের দাঙ্গায় প্রাণ যায় ২০/২৫ জনের মত। ধর্ষণ হয় হাজার হাজার নারী। বাস্তুহারা হয় হাজার হাজার পরিবার। বাংলাদেশের এমন অনেক এলাকা হিন্দুশূন্য হয়ে যায়। বাড়ি ঘর আগুনে পুড়িয়ে দেশছাড়া করা হয় অসংখ্য পরিবারকে। প্রিয় মাতৃভূমির প্রতি একরাশ ঘৃণা নিয়ে পাড়ি জমায় ভারতে।

বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মের এজেন্ট, যারা ইসলামের ফ্রাঞ্চাইজ বলে মনে করে নিজেদের। সেই জামাতের পত্রিকা দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় প্রকাশ করে বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার ফলে ঢাকায় হিন্দুদের মিষ্টি বিতরণ। ফলাফল হাতে হাতে, নিমিষে রণক্ষেত্র তৈরি হয়ে যায় ঢাকা। জাস্ট ঝাঁপিয়ে পড়ে হিন্দুদের উপরে। ঠিক কত মানুষের কেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তার কোন পরিষ্কার ধারণা নেই কারো। দেশের প্রধান মন্দির, জাতীয় মন্দির সেই ঢাকেশ্বরী মন্দিরও সেদিন রক্ষা পায়নি। বিএনপি নামক যে দলটা তখন ক্ষমতায় ছিল তারা আবার বাবরি মসজিদ তৈরি করে দিতে হবে বলে প্রতিক্রিয়া জানালেও নিজ দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্ত নিয়ে যে হোলি খেলা শুরু হয়ে গেছে তার ব্যাপারে কোন টুঁ শব্দ করেনি। এত এত প্রাণহানি হলো, ক্ষয় ক্ষতি হলো আজ পর্যন্ত শুনলাম না ওইদিনের ওই ঘটনার ফলে কোন বিচার হয়েছে বা কেউ সাজা পেয়েছিল। অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়ার খেসারত বাংলাদেশ কে দিতে হয়েছে বহুবার, অনেকবার করে। আমার প্রাণপ্রিয় পত্রিকা ইনকিলাব পরের দিন ভুল সংবাদ ছাপা হয়েছে বলে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন!! ইনকিলাবের ভুল সংবাদ ছাপিয়ে একটা ঝামেলা বাঁধিয়ে পরে ক্ষমা চাওয়া এর পরেও ঘটেছে। ইন্ডিয়ান আর্মি বাংলাদেশের ভিতরে এসে অভিযান চালিয়েছে বলে সংবাদ ছাপিয়েছিল তারা এই কিছু দিন আগে। পরে ক্ষমা চাইলেও এবার আর ক্ষমতায় বিএনপি ছিল না বলে প্রিন্ট নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল সরকার।

ঢাকায় সেদিন আরেক লজ্জার জন্ম হয়েছিল। সার্ক চার জাতি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট চলছিল তৎকালীন ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে। মানুষ দা লাঠি লোহার রড সহ নানা অস্ত্রপাতি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্টেডিয়ামে, খেলা চলছিল বাংলাদেশ এ টিমের সাথে ভারত এ টিমের। পুলিশ লাঠি চার্জ করে কাঁদানে গ্যাস ছুড়েও অবস্থার পরিবর্তন করতে পারেনি। সেই খেলা আর হতেই পারেনি। এরপরের খেলাগুলাও বাতিল করা হয়। ক্রিকইনফোতে সেই লজ্জার কথা আজো দেখতে পারা যায়। চমৎকার করে লেখা আছে "Match halted by rioting and due to replayed on 10 December with final to be played on 11 December, but these games were never played." আমরা ক্রিকেটপাগল জাতি তয় আগে মালুয়ান ঠেঙ্গানি।

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপরে অত্যাচার ৯২ সালের আগেও হয়েছে। ৭১ সালে হিন্দুদের টার্গেট করে করে মারা হয়েছিল। এক মহা ভণ্ড যখন দেশ চালাচ্ছিল আর দেশ কে মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করল তখন আবার হিন্দুরা শিকার হলো নির্যাতনের। আগের সব অত্যাচার নির্যাতন আতঙ্ক পার করে যারা প্রিয় দেশকে ছেড়ে যায়নি তাদের কাছে আবার নতুন করে দেশের অর্থ বদলে গেলো। অনেকেই আর পারলেন না যুদ্ধ করে টিকে থাকতে। পরিবার নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে পা বাড়ান অনেক পরিবার। এই সব এক একটা পরিবারের কাছে দেশ মানে প্রহসন হয়ে থেকে গেছে হয়ত সারা জীবন। বাংলাদেশ আমার কলিজার ভিতরে অথচ তারা নিয়ে বসে আছে হয়ত জিহ্বায়। আমরা উত্তর প্রজন্ম অসহায়, আমরা নতশিরে মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোন রাস্তা দেখি না এখন আর। কিন্তু আমরাই এখন কতটুকু নিরাপদে রাখতে পারছি আমার প্রতিবেশীকে?

সেই কালো সময়ের উপরে লজ্জা লিখে লজ্জা পেয়ে দেশ ছাড়তে হয়ে ছিল তসলিমা নাসরিনকে। সেখানেও এমন এক পরিবারের কথা বলা হয়েছিল যারা শত বাধা পেরিয়েও দেশ ত্যাগ করে না। বাড়ির প্রধান একজন ভাষা সৈনিক এবং মুক্তিযোদ্ধাও। নিজের মেয়েকে যখন ধর্ষণ হতে দেখে তখন তাদের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। দেশ কাকে বলে তা নিয়ে জীবনের সবচেয়ে কঠিন প্রশ্নের সামনে দাঁড়ায় তারা। আমরা ভদ্রলোক মানুষ, আমরা এই সব নষ্ট কথা আমরা আমাদের সাহিত্যে মেনে নিতে পারি না। লজ্জা আসলে কার এই রকম একটা কঠিন প্রশ্ন সহ্য করা আমাদের দেশের মানুষের পক্ষে সম্ভব না। লজ্জা যখন বলে - "ধার্মিকেরা কি কখনও

পারে বিধর্মীর সম্পদ লুট করে নিজের ধর্ম রক্ষা করতে? এতো আসলে ধার্মিকের কাজ নয়। এ হচ্ছে গুণ্ডা বদমাশের কাজ।" তখন সম্ভবত কোন উত্তর থাকে না জিহাদি জুলুসে জ্বলতে থাকা আমার ভাইয়েদের কাছে। আর তাই দেশ থেকে বাহিরে তসলিমা।

তৎকালীন সময়ের সরকার বা মিডিয়া সারা দেশ জুড়ে যে তাণ্ডব চলেছিল তা বলতে গেলে এক প্রকার চেপেই গিয়েছিল। আজ পর্যন্তও যারা জানতে চায় সে সময় নিয়ে তাদের কে অসহায় হয়ে থাকতে হয়। কারণ বাংলাদেশে ওই সময় নিয়ে বলতে গেলে কোন লেখাই নাই। সম্ভবত তসলিমার পরিণতি দেখে সবাই সাবধান হয়ে গেছে। আজকে ২৫ বছর পূর্ণ হচ্ছে অথচ কোথাও কোন জায়গায় এই সংবাদটাও তেমন করে নাই। যারা করেছে তারা বাবরি মসজিদ কিভাবে ভাঙ্গা হলো, কোথায় কে কে জড়িত সেই ঘটনার সাথে তা নিয়েই তাদের মূল আগ্রহ। দেশের যে একটা কালো দিন তা সম্ভবত তাদের ২৫ বছরেও মনে হয়নি। আর তাই হয়ত আমাদের আকাশের উপরে কালো ছায়া কাটছে না কিছুতেই।

যে বিষ প্রয়োগ হয়েছিল অযোধ্যায় তার ফল ভোগ করেছে পুরো ভারতীয় উপমহাদেশ। বাংলাদেশে যেমন হিন্দু পরিবারকে ভোগ করতে হয়েছে নির্যাতন তেমনই ভারতে মুসলমানরা। সরকারি হিসেবেই দুই হাজার মানুষ মারা যায় মসজিদ ভাঙ্গা পরবর্তী দাঙ্গায়। যেখানে একটা প্রাণের সমানও হতে পারে না কোন মসজিদ বা মন্দির। সেখানে সেই মসজিদ ভাঙ্গার জন্য হত্যা, সেই মন্দির তৈরির জন্য হত্যা। রক্ত ঝরা চলছে আজো। আমরা কবে বুঝতে পারব "তবু জগতের যত পবিত্র গ্রন্থ ভজানালয়, ঐ একখানি ক্ষুদ্র দেহের সম পবিত্র নয়!" কবে আমাদের মাথায় ঢুকবে "মানুষ এনেছে গ্রন্থ, গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো।"

শেরপুর , ২০১৭

ঈদের রঙ

রুখসানা কাজল

তখনো আমাদের বাড়িতে ঈদ মানে খুশি ছিল। ঘরের মেইন দরোজাগুলোতে কাগজের ফুলে সাজানো হত। টেবিলে থাকত আসল ফুল। বড় পর্দার উপর ঝুলিয়ে দেওয়া হত বেতের তৈরি শিকল। দু একটা জরিরমালা। বাপি তার সর্বোচ্চ শিল্পপ্রীতি থেকে ঘর সাজাত আমাদের সবাইকে নিয়ে। মা রান্নার বই হাতে ঈদের আগে থেকেই বাছাই করতে বসত কোন রান্নাটা করবে । মাঝে মাঝে বাপিও যোগ দিয়ে মাকে জানাত, একটু ব্যতিক্রমি করো রাবি। একই রান্না সবার বাসায়। মা দীর্ঘ আলোচনায় বসে নতুন কিছু রান্নার রেসিপি খুঁজে বের করে ফেলত। আর সেই রান্না খেতে আমরা স্বপ্নের ভেতরেও জিভ চেটে নিতাম। ঈদের জামা জুতো নিয়ে আমি কখনো ভাবিই নি। জানতাম ওগুলো হয়েই আছে। মাথার উপর দু দুটো মহা ইস্টাইলিশ দিদি। দিভাই একটা বানালে আপুলি আরেকটা বানিয়ে রাখবে। আর মা তো আছেই। মার দেওয়া জামা হবে, লাল, লালচে, না হয় কমলা, হলুদ মানে সবসময় এই রঙ। তার কালো মেয়েটা যেনো সবার ভেতর হারিয়ে না যায় । আরো ছোট থাকতে দিভাই আপুলির বান্ধবিরা এলে আমি নতুন জামা উচু করে মাঝে মাঝেই হাঁটতাম। আমার লেস লাগানো নতুন প্যান্ট গেস্টদের দেখানোর জন্যে। উঁচু না করলে দেখবে কি করে !

সে বয়সে আমি শুধু ঈদটাই বুঝতাম । ধর্ম নিয়ে আমাদের বাসায় কখনো কোনদিন বাড়াবাড়ি হয়নি। না মা , না আমার বাপি। বাসায় যেকোনো সময় যেকোন হিন্দু খৃস্টান ছেলেমেয়েরা এসে খেয়ে যেত। থাকার জায়গা নেই এমন কেউ কেউ সামনের ঘরে দু একদিনের জন্যে থেকেও যেত। ভেতর বাড়ি থেকে খাবার দিয়ে আসত রেনুদি বা হেমদি। কতদিন জানালা বেয়ে উঠে দেখেছি বিছানার উপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসে পইতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মন্ত্র পড়ছে কেউ কেউ। শুধু আমাদের বাড়ি নয়। শহরের কয়েকটি বাড়ি ছাড়া অধিকাংশ বাড়িতে এরকম দৃশ্য ছিল। পুজোয় জামা শাড়ি পাঠাত। ঈদে মাও শাড়ি কিনত আত্মীয়দের সাথে বান্ধবী বৌদিদের জন্যে। আমাদের শহর এক আশ্চর্য মায়াবী শহর ছিল। ঈদ কুরাবানীতে হিন্দু বন্ধু, প্রতিবেশীদের কথা ভেবে খাসি জবাই করা হত। শহরের প্রায় সবাই এই অলিখিত নিয়ম মেনে চলত। থাকত আলাদা হাড়ি কড়াই। সামান্য সন্দেহ বা অবিশ্বাস ছিল না কারো ভেতর। আর খাওয়া দাওয়া শেষে গল্প, আড্ডা, গান কবিতা এমনকি অনায়াস গল্পের মত উঠে আসত ইসলাম ধর্মের কোনো কোনো মানুষের কথার পাশে সনাতন হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন দেবদেবীর কাহিনি বা প্রিয় যীশু খ্রিস্টের কথা।

বাড়িতে বটি ছিল তিনটা। ফল কাটার বটির কাঠ ছিল রঙিন। তরকারী কাটাকুটি আর মাছের বটি একদম আলাদা ছিল। মাকে দেখেছি মাঝে মাঝেই বটি দুটোকে নিয়ে ইঁদারার পাড়ে ফেলে ভালো করে ধুয়ে নিতে । অন্যের ধোয়া কিছুতেই পছন্দ হত না মহিলার। ঈদ এলে এগুলো দ্বিজবর কাকুর কামারশালায় পাঠিয়ে ঝকঝকে করে আনা হত। দ্বিজবরকাকু নাটক করত। নিজেই বটি দিয়ে যেত আর যাওয়ার সময় হাঁক দিত, কয়ডা নারকেল পাড়ি নি গেলাম ও বউদি। তোমাদের বউমা বলি দিয়েছে।

ঈদের সকালে লালটালি আর এসব্যাস্টাস টিনের রান্না ঘরের বারান্দায় হইচই লেগে যেত। আমি আর ভাইয়া পেস্তা, কাজু, কিসমিশ, দারচিনি খাওয়ার লোভে ঘুরঘুর করতাম। এগুলো কাঁচা খেতেই যত মজা। রান্নার পর থুথু। কয়েক রকমের সুবাসিত রঙিন সেমাই জর্দা আর নানা রকম ফল কেটে বড় থালায় বিরাট বিরাট পাতার জালি দিয়ে ঢেকে রাখা হত। মাছি ছিল আমার মা বাপির ঘোষিত শত্রু। ট্রে ভর্তি খাবার ড্রয়িং রুমে যেত আর খাওয়া শেষে সাথে সাথে এঁটো ধুয়ে ফেলা হত।

সকালের দিকে বাপির বন্ধুরা চলে আসত নামাজ পড়ে। তাদের সাথে আসত নিতাই কাকু, কেশব কাকু, বরুন চাচা, বাংলার প্রফেসর মহেন্দ্রকাকু, কাকিমা, কাশিশ্বর কাকু। সোনার চশমা চোখে, ধোপদুরস্ত পরিপাটী পোশাক, মৃদুভাষী, ক্ষীরোদ সাহা আমার মা বাপির প্রিয় মানুষ ছিলেন। পরবর্তি সময়ে এই কাকুর ছেলে আর আমার আপুলি বিয়ে করায় শহরে প্রায় দাঙ্গা লেগে গেছিল। সে অন্য গল্প। বাপির বন্ধুরা এলে মাকে একবার তখন রান্না ছেড়ে আসতেই হত। পাতলা কাঁচের গ্লাসে নতুন রেসিপির কোনো শরবত নিয়ে মা আসত। তখন অন্য মার মত লাগত মাকে। কি মিষ্টি,

সুন্দর।

তবে সব চে মজা হত দুর্যোধনদাদু যখন আসতেন তখন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে দাদুর পায়ে গুলি লেগেছিল। লাঠি নিয়ে হাঁটতেন। দাদু ছিলেন বাপির বাবার বন্ধু। বাপিকে সন্তানের মত ভালোবাসতেন। দাদুর পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে মা সেমাই আর ক্ষীরের পায়েস খুব যত্ন করে দাদুর সামনে নিচু টেবিলে রেখে দিত। দাদু ক্ষীর সরিয়ে রেখে সেমাই খেতে খেতে চাটাম চাটাম শব্দ করত আনন্দে। ততক্ষনে মা জোড়া পান বানিয়ে পিরিচে রেখে দিত। একসাথে দুটো পান মুখে দিয়ে দাদু আমাদের সাথে নিয়ে বাপির বাগান দেখতে উঠে যেত।

দলবেঁধে আসত দিভাই আপুলি দাদুর বন্ধুরা। কে হিন্দু কে মুসলিম এরকম অনেককেই আমি সত্যি জানতাম না। ওদিকে রান্নাঘরে তখন মা ক্ষেপে গেছে। অসম্ভব। আমি কারো জাত নষ্ট করতে দিতে পারব না। টিকিয়া কিছুতেই মা দেবে না। আর এরা খাবেই। শেষ পর্যন্ত মিথ্যে বলে তবে টিকিয়া বের করা হত। আমি আর ভাইয়া ঘুরঘুর করতাম সেলামি নেওয়ার জন্যে। ব্যাগ ভরে টাকা পয়সা নিয়ে আমরা ছুটে যেতাম আইসক্রিমের দোকানে। তখন নতুন নতুন আইসক্রিম আসছে মার্কেটে। বিরতিহীন খেয়ে যেতাম আমরা ছোটরা। জিভ ভারি হয়ে কথা আটকে যেত। অইদিন গরিবদের ছেলেমেয়েরাও আইসক্রিম কিনতে আসত। তারাও সস্তা কাপড়ের নতুন জামাকাপড় পরে আনন্দ করত। কিন্তু এত আনন্দের ভেতরেও খারাপ লাগত যখন দেখতাম এই ঈদের দিনেও কেউ ভিক্ষে করছে বা ছেঁড়াফাটা পুরান জামা পরে মুখ কালো করে এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের শহরে হামবড়ামি করত যারা তাদের কেউ কেউ এদের তাড়িয়ে দিত। কেউ কেউ আবার দুষ্টুমি করে আমাদের বাড়ি দেখিয়ে দিত। মা যতটা পারত দিত। বাপি মাকে শিখিয়েছিল, দিও কিঞ্চিত না করে বঞ্চিত। আমরা তো অই হামবড়ামি টাইপের ধনীলোক ছিলাম না। ওদের গেট বন্ধ থাকত, শবে বরাত, ঈদ , কুরবানির দিনগুলোতে। গরীবরা কিছু না পেয়ে কত কি যে অভিশাপ দিত। শেষবারের মত বলত, আল্লাহ বিচার করবিনে, একদিন আমাগের মত ভিক্ষে করতি হবিনে ওগের। এই ধনসম্পদ কিছুই থাকপি নানে তহন। আল্লাহ কিন্তু ওদের ছাপ্পড় ফুঁড়ে দিয়েছে, দিয়েই গেছে। গরীব আরো গরীব হয়েছে। আমি আর ভাইয়া এগুলো ভালো করে দেখে টেখে ঠিক করেছিলাম, কাউকে মুখে কিছু বলব না। সুযোগ পেলে মেরে দেবো।

অনেক বছর পরে সেই শহরে গিয়ে আমি পুরনো সেই আমেজ সেই ভালোবাসাকে কিছুটা হলেও খুঁজে পেয়েছি। যদিও হিন্দু পাড়াগুলো ফাঁকা। বেশিরভাগ হিন্দুরাই চলে গেছে দেশ ছেড়ে। যারা আছে ভাইবোনের মত , বন্ধুর মত ঈদের সকালে ফোন করেছে, উইশ করেছে হ্যাপি ঈদ। কিন্তু এই কি নিয়তি ? একটি স্বাধীন সার্বভৌম ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে নিরাপত্তাহীনতার সমূহ সম্ভাবনায় শঙ্কিত হয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে রাষ্ট্রের বৈধ নাগরিক হিন্দু সম্প্রদায়।

আমি এসেছি জেনে সাত মাইল বাস, টেম্পু চড়ে দেখতে এসেছিলেন আমার স্যার। স্যারের ছেলেমেয়ে সবাই ইন্ডিয়া থাকে। এবার উনিও চলে যাচ্ছেন। বার বার বলছিলেন দিন ভালো নয়। আসছে দিন ভালো নয়। ওপারে মুসলিম মার খাচ্ছে, এপারে হিন্দু। দিন খারাপ, বড় খারাপ দিন আসছে রে কাজল। ঠিক এরকম কথা বলেই আমাদের খুব কাছের এক বন্ধু পরিবারসহ চলে গেছে কানাডা। প্রতি ঈদে সুভাষদার জন্যে টিকিয়া বানিয়ে বক্স করে দিতে হত। আর ছোট্ট পাপ্পু ডাইনিং টেবিল ছেড়ে উঠতেই চাইত না। পোলাউয়ের গন্ধে ওর নাকি খালি ক্ষুধা পেয়ে যেত। কি যে মিষ্টি করে বলত, মামি মামি আর একটা রোষ্ট কি হবে? পাপ্পু খুব ঈদ মিস করে। ঈদ এলে আমার ছেলেকে কানাডা থেকেই হুমকি দেয়, আমি নেই তাই খুব খাচ্ছিস তাই না ?

রঘুনাথপুরের বুড়িরথানে বসে মনে হচ্ছিল আমরা ক্রমশ মুসলিম আর হিন্দু হয়ে যাচ্ছি। মানুষ থাকছি না।

ঢাকা, ২০১৭

পাহাড়ে বেদনাবিধুর ঈদ

পল্লব চাকমা

আজ ঈদ। মদিনার ঘরে ঘরে আনন্দ ...।

ঈদ আসলেই ক্লাস টু'তে পড়া বাংলা বইয়ের এই লাইনগুলির কথা মনে পড়ে। আর মনে হয় চারিদিকে শুধু আনন্দ আর আনন্দ। তাই এই খুশির দিনে অন্য কিছু না বলে আজ ভালবাসার কথা বলি। এ ভালবাসা এক অন্যরকম ভালবাসা।

সময়টা ১৯৮৬। উত্তাল পার্বত্য চট্টগ্রাম।

চলছে ইন্সার্জেন্সি, কাউন্টার ইন্সার্জেন্সি। একটার পর একটা জ্বলে যাচ্ছে পাহাড়ি গ্রাম। হাজার হাজার মানুষ উদ্ভাস্তু হচ্ছে। নিরাপত্তার কারণে শত শত পাহাড়ি মানুষ সীমান্ত পাড়ি দিচ্ছে। আমরা তখন ছিলাম দীঘিনালা সদরের বাবুপাড়ায়। প্রতিবেশি অনেকেই রাতের অন্ধকারে চলে গেছে কোথাও। অন্যরাও চলে যাবে নিরাপদ কোন পাহাড়ে। আমাদের পরিবার এই পরিস্থিতিতে কী করবে যখন ভেবে কোন কূলকিনারা করতে পারছেনা ঠিক সেই মূহুর্তে বাবার পরিচিত এক আদি বাঙালি মেম্বার তাঁদের বাঙালি পাড়ায় আশ্রয় নিতে বল্লেন। জানালেন জীবন দিয়ে হলেও আমাদের রক্ষা করবেন। সেই কথা মত আমরা ৩টি পাহাড়ি পরিবার আশ্রয় নিলাম পুরাতন বোয়ালখালি বাজারের পশ্চিমের বাঙালি পাড়ায়। এই পাড়াটি মূলত আদি ও স্থায়ী বাঙালিদের একটা পাড়া। প্রথমে কয়েকটা দিন ভয়ে ভয়ে কাটলেও ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে থাকে। এই টালমাটাল সময়ে চলে আসলো ঈদ। আমার জীবনের প্রথম ঈদ উদযাপন। তাও আবার কোন বাঙালি পাড়ায়! আমার বয়সী মেম্বার কাকার দুই ছেলের সাথে আমরা দুই ভাই অনেক মজা করলাম। দুই টাকার প্লাস্টিকের রঙ্গিন চশমা কিনলাম। সেই চশমা পড়ে হাঁটতে গিয়ে কয়েকবার হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম। তাও মজা। বেশ আনন্দে কেটে গেল ঈদ।

ঈদের ঠিক দুই দিন পরের ঘটনা।

বিকেল বেলা। হঠাৎ দৌড়ে এসে একজন খবর দিয়ে গেল পাড়ার দিকে আর্মি আসছে। আমাদের মনে হল নিশ্চিত আর্মি জেনে গেছে আমরা এই গ্রামে আশ্রয় নিয়েছি। মা-বাবা সবাই হতবিহবল হয়ে পড়ে। মেম্বার কাকার অস্থিরতা বাড়ে। তড়িঘড়ি করে আমাদেরকে লুকিয়ে রাখার আয়োজন চলে। মূহুর্তের মধ্যে আমরা কেউ খাটের নিচে, কেউ কাপড়ের আড়ালে কেউবা সিলিঙের উপর একটা কিছুর আড়ালে লুকিয়ে পড়ি।

১৫/২০ নিমিটের মধ্যে আর্মির অগ্রবর্তী দলটি চলে আসে মেম্বার কাকার বাড়ির উঠানে।

নিঃশ্বাস বন্ধ করে আড়াল থেকে শুনতে থাকি কথোপকথন।

মেম্বার কাকাকে জিগ্যেস করা হয় - 'আমরা খবর পেয়েছি আপনাদের পাড়ায় নাকি পাহাড়িরা আশ্রয় নিয়েছে, এটা কি সত্যি মেম্বার সাহেব?'

কাকা উত্তর দেন - 'না না স্যার। তবে ৩/৪ দিন আগে কয়েক পরিবার এসেছিল আমরা রাখি নাই, তাড়িয়ে দিয়েছি। তাদেরকে রাখা তো বিপদ। আমরা তাদেরকে এই গ্রামে রাখবো কেন?'

আমাদের জন্য মেম্বার কাকা সেদিন নির্দ্বিধায় মিথ্যা বলেছিলেন নিজের সমূহ বিপদ জেনেও। এই মিথ্যা না বললে আমাদের যে কী দশা হত!

অথবা আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন তা যদি আর্মিরা কোনভাবে জানতে পারতো তাহলে কী বিপদই না হতো তার নিজেরও।

পরের দিন ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই চোখের জলে আমাদের তিন পরিবারকে বিদায় দিয়ে নিরাপদ জায়গায় চলে যেতে সাহায্য করেছিলেন সেই মেম্বার কাকাসহ আরও কয়েকজন বাঙালি।

আমাদের জন্য তাঁদের সেই ভালবাসার কথা, বিপদে বুক দিয়ে আগলে রাখার কথা হয়তো কোথাও লেখা থাকবেনা। কিন্তু মেম্বার কাকার পরিবার আজীবন আমাদের শ্রদ্ধায় ও ভালবাসায় বেঁচে থাকবেন।

প্রতি বছর ঈদ আসে।

আমারও মনে পড়ে সেই প্রথম ঈদ উদযাপনের ঘটনা। আর চোখে ভাসে কিছু পাহাড়ির জন্য কয়েকজন বাঙালির অনন্য এই ভালবাসার কথা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম, ২০১৭

ভাতের থালা

সমর মাইকেল সরেন

অবিরাম বৃষ্টি। অনেকদিন পর গ্রামের বাড়িতে যাচ্ছি। গ্রামের রাস্তায় কাদার মধ্যে পা ডুবিয়ে হাটার মত অন্যরকম আনন্দটা একটু অন্যরকমই। এক হাতে চটি আর এক হাতে ছাতা। আসলেই অন্যরকম।

গত শুক্রবার সরাসরি কোন বাস না পাওয়ায় লোকাল বাস ধরেই গ্রামের বাড়ির দিকে যাত্রা শুরু করেছিলাম আর কি। মুন্ডুমালা আমনুরা হয়ে বাড়ি যাওয়ার রাস্তাটাকে একটু বেশি রকমই পছন্দ করি এই বৃষ্টির সময়। যদিওবা চাপাইনবাবগঞ্জ দিয়ে যাওয়া যেতো আমার রহনপুরে। তবুও এই রাস্তাটা আমার ভীষণ প্রিয়।

প্রথম বাসটা আমাকে নামিয়ে দিল তানোরের মুন্ডুমালা মোড়ে।তখন দুপুর একটা। আমার ক্ষিদেও পেয়েছে বেশ। মুসলিম সম্প্রদায়ের রোজার মাস চললেও আমারতো আর রোজার মাস নয়। তাই হোটেল খোঁজা শুরু করলাম। ভাত খাব বলে। রাস্তায় পানিও জমেছে। মাঝে মাঝে হাতে স্যান্ডেল ধরতে হয়। কিন্তু শুক্রবার বলে কথা। রাস্তার মোড়ে হোটেল থাকলেও হোটেল কোথাও খোলা নেই।

সামনে একটা পর্দা টাঙ্গানো চা বিড়ির দোকান। বেশ কিছু লোক ওখানে পর্দার আড়ালে বিড়ি টানছে। ওরা মনে হয় বৃষ্টি থামার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে বৃষ্টির বেগও ঝম ঝম। থামবে না মনে হয়। আমাকে না খেয়েই হয়তোবা দ্বিতীয় বাসে উঠতে হবে। এখনও আরও তিন ঘন্টার রাস্তা পার করতে হবে আমাকে।

ওই লোকদের ভীড় থেকে কে যেন বলে উঠল। সমর নাকি। আমিও দোকানটার দিকে এগিয়ে গেলাম। চিনতে পেরেছি। উনি সম্পর্কে আমার দুলাভাই হবেন। এখানেই থাকেন। আমার এক বড় বোনকে বিয়ে করে তিনি দুলাভাই হয়েছেন। আমি তার দিকে এগিয়ে যেতেই তিনি বললেন, কি ব্যাপার এই বৃষ্টির দিনে কোত্থেকে?

না এইতো আর কি , বাড়ি যাচ্ছি। আমি বললাম।

পর্দার ভেতরে ঢুকে যাওয়ার পর উনাকে আমার অবস্থাটা জানালাম। খুব ক্ষিদে পেয়েছে একটি হোটেলও খোলা নেই।

আমার অবস্থা বর্ণনা করতেই তিনিও যেন পারফেক্ট টাইমিংএ চান্স পেয়ে গেলেন ! একেবারে নাছোড়বান্দা। তার বাসায় আমাকে যেতেই হবে। উপায় নেই। অনেকদিন পর আমাকে পেয়েছেন। আচ্ছা ঝামেলা দেখি। আর এদিকে বাসায় আমার মা আমার জন্য অপেক্ষায় আছে। কখন বাসায় পৌছাব। নাহ নানারকম ব্যস্ততা দেখিয়ে কোনরকমে মুক্তি পেলাম। তো কি আর করা জয় আমারই হল। তিনি আমাকে মানচিত্র বোঝাতে শুরু করলেন। শুক্রবারদিন সব হোটেল বন্ধ থাকলেও একটি হোটেল খোলা থাকে এখানে। মুন্ডুমালা মোড়ের মানচিত্রে সেই হোটেলের অবস্থান আমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু নাহ আমি বুঝছি না। এই মোড়ের উত্তর দক্ষিণ কোনটাই না। অগত্যা তিনিই আমাকে নিয়ে গেলেন হোটেলটিতে। একটা চিপা গলির ভেতরে।

হাত মুখ ধুয়ে হোটেলে বসলাম। কোণার একটি টেবিলে তিনটে চেয়ার ছিল। সেখানের একটিতে বসলাম। দুলাভাইকেও বসালাম। বসার পর তিনি আমাকে বললেন,

বাবু তুমি এখানে খেতে পারবেতো?

কেন দাদা? এখানের রান্না কি ভাল নয়? আমি বললাম।

না সেটা না

তাহলে কি?

আগে দেখই না

কিছুক্ষণ পর হোটেলের একটি ছোট্ট ছেলে। বয়স বারো বছরের বেশি হবে না মনে হয়। আমি ভাবছিলাম হায়রে শিশুশ্রম!

ছেলেটা আমাদের জন্য ভাত নিয়ে আসল। আসলেই কথা ঠিক। প্লেট আর গ্লাসের যে অবস্থা! কবে থেকে যে ধোয়া হয় না।

এবার অন্যদের থালার দিকে তাকালাম। ওদেরটা ঝকঝকে পরিস্কার ম্যালামাইনের থালা। আমি ছেলেটাকে তখন বললাম। পরিস্কার থালা এনে দিতে। ছেলেটা তখন যা উত্তর দিল তখন আমার মেজাজ ফোরটি নাইনে না উঠে পারলো না।

ছেলেটি বলল, ভাই হাঁরঘে আর দুই নম্বর পিলেট নাই। এইটাতেই খাইয়ে লেন না জি। (ভাই আমাদের আর দুই নম্বর প্লেট নাই। এটাতেই খেয়ে নেন।)

আমি তখন বললাম, এক নম্বরটা দিলে সমস্যা কি?

এক নম্বর পিলেটতো তোমারঘে না। মালিকের মানা আছে জি-ই-ই খাইয়ে লেন। (এক নম্বর প্লেটতো আপনাদের জন্য না। মালিকের মানা আছে।)

কথাটা বলেই ছেলেটা ওর কাজে ফিরে গেল।

আমি তখন আমার দুলাভাইকে বললাম।

কী ব্যাপার বলুনতো, কিছুদিন আগেই না জাতীয় আদিবাসী পরিষদ তারপর বিভিন্ন এনজিও আদিবাসীদের ওপর এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে মানববন্ধন, মিছিল করেছিল। এখনও কি আদিবাসীদের ওপর এমন বৈষম্য বন্ধ হয় নি?

কি বলব আর? বন্ধ হয় নি বললে ভুল হবে। হয়েছিলও। তবে কিছু কিছু হোটেলে আবার শুরু হয়েছে এই বৈষম্য। এখনতো ওরা আরও লাই পেয়ে যাচ্ছে।

কেন বলুনতো?

সরকারতো এখন আর আদিবাসীদের পক্ষে কাজ করছে না। এদিকেও আদিবাসী বাঙ্গালী বিতর্কটা আবার ভালভাবেই শুরু হয়েছে।

তো আপনারা কি করছেন?

কি আর করব? সবাই একসাথে কাজ না করলে কি কিছু করা যায়? একা একা কতদুরই বা করা যাবে ? আর সংগঠনগুলোর মধ্যেও যে একতা ! এনজিও গুলোও এখন কেমন যেন নীরব। আদিবাসীদের নামে ডোনেশন আসলেও কাজ কতটুকুইবা করেন!

কি আর করা। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম, চলেন উঠি।

হোটেলে না খেয়েই অনেক বাক বিতন্ডা সেরে হোটেলের ক্যাশে ভাতের টাকাটা দিয়ে বের হয়ে আসলাম হোটেল থেকে। সে মুহূর্তে আর কী বা করার ছিল।

উত্তরবংগ, ২০১১

বাংলাদেশে সমকামিদের আত্মপ্রকাশ: অধিকার বনাম সহিংসতা

সাখাওয়াত হোসেন রাজীব

জুলহাজ মান্নান আর মাহবুব রাব্বি তনয়ের হত্যাবার্ষিকী আর কিছুদিন পরেই। ২৫শে এপ্রিল। ভাবছিলাম এই দিবসটিতে ঘিরে কিছু করবো কিনা। কিছু করা উচিত হবে কিনা, কিছু করা আদৌ সম্ভব কিনা।

দু'জন মানুষ তাদের আদর্শের জন্য লড়াই করতে গিয়ে প্রাণ দিয়ে দিলো, তাদের স্মরণে কিছু একটা করাই তো সমুচিন। শোক সভা? ফেইসবুক লাইভ? টক শো? হত্যার বিচার চেয়ে মানববন্ধন? প্রেস কনফারেন্স? ওদের জায়গায় অন্য কেউ হলে হয়তো সবই সম্ভব হতো। অন্য যে কেউ। ঘুষখোর, খুনি, মাতাল, নেশাখোর, ধর্ষক ... জীবদ্দশায় যাই করুক না কেন মরে গেলে সাধু আর বাকি সবাই তাদের মুরিদ। কিন্তু জুলহাজ আর তনয় তো সমকামী ছিল। সমকামীদের অধিকার আদায়ের জন্য কাজ করত। সুতরাং তারা নরকের নিকৃষ্ট কীটের চাইতেও অধম এবং তাদের স্মরণ করা মানে সেই পাপকে নিজের গায়ে মাখানো।

আর আমরা সমকামীরা কি পাগল নাকি? এমন বিতর্কিত ব্যক্তিদের লাশ নিয়ে টানাটানি করলে তো নিজেরাই লাশ হয়ে যাবো। প্রশ্নই আসে না কোন সভা সমিতি করার। কোন বিচার চাওয়ার। যেখানে কোন মানবাধিকার সংগঠন কিছু বলছে না, জুলহাজ-তনয় এর পরিবার কিছু বলছে না, জুলহাজের কর্মস্থল আমেরিকান এমব্যাসি কিছু বলছে না, সেখানে আমরা কোন ছাড়! আর তার চাইতে বড় কথা আমরা চাইলেও কিছু করতে পারবো কিনা। সরকার আর সমাজ কি আমাদের করতে দিবে কিছু?

কদিন আগে এক ব্যক্তি গিয়েছিলেন প্রেসক্লাবের সামনে ব্যানার নিয়ে। পুলিশ তাকে দাঁড়াতে দেয়নি। পত্রপত্রিকা, টিভি চ্যানেল এক পরোক্ষ নিষেধাজ্ঞার কারণে সমকামিতা সম্পর্কিত কোন কিছু নিয়ে কথা বলছে না। কিছুদিন আগে এক পত্রিকাতে একটা লেখা পাঠিয়েছিলাম। ছাপায়নি। বলেছে উপর মহলের না আছে। জাতীয় মানবাধিকার সংস্থা কয়েকটা মিটিং করেছে চার দেয়ালের মাঝে। কিন্তু প্রকাশ্যে তারা কিছু বলতে নারাজ। অনেকেই ই-মেইল করেন, ফেইসবুকে ম্যাসেজ পাঠান সহমর্মিতা জানিয়ে কিন্তু তারাও কোন অবস্থান নিতে পারছেন না।

আমরা বুঝি আমাদের সবারই অদৃশ্য এক শৃঙ্খলে হাত-পা বাঁধা। জানা-অজানা ভয়, শঙ্কা, চক্ষুলজ্জা, বিধি-নিষেধ আমাদের তাড়া করে। হাজার চাইলেও কিছু করতে না পারার অসহায়ত্ব, নিজের বিবেক আর অনুভূতির সাথে বিরামহীন লড়াই, নিজের পরিচয় লুকিয়ে মিথ্যার বেসাতি দিয়ে গড়া জীবন। চাপাতির কোপের চাইতেও এই শৃঙ্খল যেন অনেক বেশি বেদনাদায়ক, অনেক বেশি যন্ত্রনাময়।

জুলহাজ আর তনয়ের মৃত্যুর সংবাদ শুনে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেছিল যে বাংলাদেশেও সমকামীরা আছে আর তারা ধীরে ধীরে সংগঠিত হচ্ছে। অবাক হওয়া স্বাভাবিক। অন্যান্য উন্নত দেশের মতো সমকামিতা তো অতোটা প্রকাশ্য নয় বাংলাদেশে। এমন বহুবার ঘটেছে আমাকে এসে কেউ বলেছে যে তার জীবনে দেখা আমিই প্রথম সমকামী!

২০০৯ সালে বাংলাদেশ সরকারও একই কথা বলেছিল। জাতিসংঘে যখন প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির পর্যালোচনা করা হয়, তখন বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র সুপারিশ করেছিল আইনের ৩৭৭ ধারা বাতিল করতে এবং সমকামীদের মানবাধিকার সমুন্নত রাখতে। আর তার প্রেক্ষিতে সরকার বলেছিল বাংলাদেশে কোন সমকামী নেই কারণ বাংলাদেশ একটি রক্ষণশীল, প্রথাগত মুসলিম প্রধান দেশ। বলেছিল এই সুপারিশগুলো বেমানান কারণ কোন দল বা গোষ্ঠী এই নিয়ে দেশে কোন আওয়াজ তুলেনি। মিটিং শেষে বেড়িয়ে যাওয়ার সময় ভীষণ কেতাদুরস্ত এক সরকারি আমলা আমাকে বলেছিলেন, আপনারা কেন এসব 'controversial issue' নিয়ে এখানে আসেন, দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার তো দেশেই মিটমাট করা ভালো।

আমাকে প্রায়ই জিগ্যেস করা হয় বাংলাদেশে সমকামীদের সংখ্যা কতো। ভালো মনেই অনেকে প্রশ্ন করেন। যখন বলি যে এই সংখ্যা আমার অজানা তখন হয়তো অনেকেই মনে মনে অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু সংখ্যার এই রাজনীতি খুবই বিপদজনক। যদি আমরা সংখ্যায় বেশি হই তাহলে কি আমাদের দাবিগুলো মেনে নেওয়া হবে? ঠিক কতজন হলে আমরা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ

হবো? মানুষকে, মানুষের অধিকারকে সংখ্যায় নিরূপণের এই চক্রান্ত কার স্বার্থ হাসিলের জন্য? বাংলাদেশে যদি নিদেনপক্ষে একজন সমকামী থাকেন, একজন আদিবাসি থাকেন, একজন দলিত বা একজন হিন্দু থাকেন তারপরেও সরকারের উচিত সেই একজনের অধিকার সমুন্নত রাখা। কারণ আমাদের সংবিধান তাই বলে।

আর যদি সংখ্যার এই রাজনীতি শুরু করি তাহলে বলতে হয় আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত গবেষণায় দেখা গেছে কোন দেশের জনসংখ্যার ৫-১০% সমকামী হয়ে থাকে। আমাদের জনসংখ্যা যদি ১৬ কোটি হয় তাহলে ভাবুন সমকামীদের সংখ্যা কতো! সমকামীরা আছেন সবখানে। আপনার বাসায়, আপনার অফিসে, রাস্তায়, শপিংমলে, মন্দির, মসজিদ, গির্জা, পাহাড়ে, সমতলে, বঙ্গভবনে, জাতীয় সংসদে। অনেকে প্রকাশ্যে, অনেকে গোপনে। আমরা দেখি না। রক্ষণশীল পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় দেখার সেই চোখ আমাদের তৈরি হয়নি। আর তার উপর আছে আমাদের কপটতা। আমরা সবাই আমাদের জগতে উটপাখি।

আমরা চাই আমাদের অস্তিত্ব জানান দিতে। কারণ পরিবার ও সমাজের গ্রহণযোগ্যতাই আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু যখন পরিবার আমাদের করে ত্যাজ্য, আইন করে অপরাধী আর ধর্ম বলে পাপিষ্ঠ তখন আমাদের এই অস্তিত্ব হয়ে ওঠে এক বিরাট দায়বদ্ধতা। প্রকাশ্যে আসার পরিণতি কি তা তো জুলহাজ আর তনয় তাদের জীবন দিয়েই প্রমাণ করে গেলো।

এ এক ভয়ংকর দুষ্টচক্র। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় "politics of visibility" বা দৃষ্টিগ্রাহ্যতার রাজনীতি। সকল সংখ্যালঘুদের জন্যই এটা প্রযোজ্য কিন্তু অধিকাংশ সমকামিদের যেহেতু বাহ্যিক কোন নিদর্শন নেই তাই তাদের জন্য যেন 'come out' করা ফরজ। কে তার যৌন পরিচয় প্রকাশ করবে আর কে করবে না সেটা একান্তই সেই ব্যক্তির ব্যাপার। এর সাথে জড়িয়ে আছে তার আত্মস্বীকৃতি, শিক্ষাগত উৎকর্ষতা, সামাজিক অবস্থান ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো প্রভাবিত করার ক্ষমতা। কিন্তু মোটা দাগে বলতে গেলে আমরা সমকামীরা আমাদের চেহারা দেখাতে চাই না কারণ ফলাফল। ঘৃণা, তুচ্ছতাচ্ছিল্য, বর্বরতা, হিংস্রতা, নৃশংসতা এগুলোর পেছনে আছে সমকামিতা নিয়ে মানুষের অজানা ভয়, অজ্ঞতা, ধর্মীয় কুসংস্কার আর পুরুষতান্ত্রিকতা। আমরা নিরুৎসাহিত হই। হয়ে যাই আরও নিভৃতচারী। আর প্রকারান্তরে আমাদের লুকিয়ে থাকা এই অজ্ঞতাকে আরও উসকে দেয়।

সবাই বলে 'closet' থেকে বের হও, লোকজন জানুক, দেখুক, তারপর একদিন গ্রহণ করে নিবে। কিন্তু এই যে ক্লজেট বা আলমিরা সেটা কিসের এবং কাদের তৈরি সেটা নিয়ে কথা হয় না। সবার আগে ত এই আলমিরা হটাতে হবে। এবং সেটা করার দায়িত্ব একা সমকামিদের নয়। শুরুটা করতে হবে পরিবারকে। আধুনিক শিক্ষায় নিজেদের শিক্ষিত করতে হবে। তারপর হয়ত আমরা বুঝতে পারবো বাংলাদেশে সমকামী আছে কি না সেই আলোচনা মুখ্য নয়। মুখ্য হচ্ছে বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, লিঙ্গ, যৌন পরিচয় ইত্যাদি নির্বিশেষে সমান অধিকার ভোগ করছে কিনা সেটা নিশ্চিত করা।

২০০৯ সালে যখন সরকার বলেছিল দেশে কোন সমকামী নেই তারপর থেকে আমাদের চেষ্টা ছিল এর পরেরবার যেন একই কথা না বলে। আমরা অনেক দৌড়ঝাপ করেছি এর পরের চার বছর। ২০১৩ সালে দ্বিতীয়বার বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হোল জাতিসংঘে। এবারও সুপারিশ এসেছিল সমকামীদের বিরুদ্ধে নির্যাতন বন্ধ করার। কিন্তু এবার সরকার ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে সমকামীদের অস্তিত্ব মেনে নিলো বটে তবে সাথে এও বলল আইন থাকবে আইনের জায়গায়। তার মানে সমকামীরা আইনের চোখে অপরাধী সেটার কোন হেরফের হবে না। কিন্তু কোন আইনের কথা বলছে সরকার?

বাংলাদেশ ফৌজদারি দন্ডবিধির ৩৭৭ ধারা তো আমাদের নিজেদের বানানো কোন আইন নয়। ১৮৬০ সালে ভিক্টোরিয়ান ব্রিটিশ শাসকদের তৈরি এই আইন উপমহাদেশে আমদানি করা হয়। ৩৭৭ ধারা 'প্রকৃতিবিরুদ্ধ যৌন ক্রিয়ার'-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং সেখানে সরাসরি সমকামিতা নিয়ে কিছু বলা নেই। কোন যৌন আচরণ প্রকৃতিসুদ্ধ আর কোনটা নয় সেটা নির্ধারণ করা রাষ্ট্রের কাজ নয়। বিজ্ঞান অনেক আগেই প্রমাণ করে দিয়েছে সমকামিতা সম্পুর্ণ স্বাভাবিক। আমাদের পূর্বপুরুষরা ইংরেজ তাড়িয়েছে বটে কিন্তু তাদের ফেলে যাওয়া যুগের সাথে অসামঞ্জস্য কিছু আইন এখনও আকঁড়ে আছি আমরা। যদিও এই আইনে এখন পর্যন্ত কোন সমকামী ব্যক্তির সাজা হয়নি, কিন্তু যদ্দিন এটা থাকবে ততদিন আমরা অপরাধী হয়েই থাকবো। আর যেভাবে উগ্র প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এই আইনের প্রয়োগ দাবি করছে তাতে খুব শীঘ্রই হয়ত আমাদের কারও যাবজ্জীবন হয়ে যাবে।

গত বছর যখন উগ্রপন্থী ইসলামি জঙ্গিদের হাতে খুন হোল আমাদের বন্ধুরা, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বানী দিলেন যে খুন করা ভালো নয়, কিন্তু ধর্মের বিরুদ্ধে যায় এমন কিছু উনি মেনে নিবেন না। কি যায় ধর্মের বিরুদ্ধে? সমকামিতা। আর কোনটা যায় ধর্মের পক্ষে? সমকামীদের খুন করা। তাহলে উনি কোনটা মেনে নিলেন? মদিনার সনদের রক্ষক বলে কথা! কিন্তু সমকামিতার ব্যাপারে ইসলাম ধর্মের অবস্থান নিয়েও রয়েছে বিস্তর মতভেদ এবং ব্যাখ্যা। অনেক প্রগতিশীল ইসলামিক পন্ডিতদের মতে ইসলাম সমকামী ভালোবাসার পক্ষে।

আমাদের সংগ্রাম আমাদের অস্তিত্বের মতোই সুপ্রাচীন। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে গত ১০০ বছরে এই আন্দোলনের একটি স্বরূপ তৈরি হয়েছে। হয়েছে যৌনতা আর লিঙ্গ নিয়ে বিস্তর গবেষণা, মূল্যায়ন আর আন্দোলন। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় অন্য যে কোন সামাজিক আন্দোলনের তুলনায় LGBT আন্দোলন এগিয়েছে সবচেয়ে দ্রুত কারণ ভালোবাসার আবেদন মানুষের কাছে পৌঁছায় সবচেয়ে সহজে।

ব্রিটিশ-পুর্ব ভারতীয় উপমহাদেশে সমকামিতা কোন অচ্ছুৎ বিষয় ছিল না যদিও যৌনতা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা বরাবরই ছিল ট্যাবু। হিন্দু পূরাণে সমকামিতার বিস্তর নিদর্শন মেলে। এত শত বছরের মুসলিম শাসন আমলেও সমকামিতার বিরুদ্ধে কোন আইনের উল্লেখ নেই। বরং যৌন ও লিংগ বৈচিত্রের অধিকারীদের ছিল একটা সম্মানজনক অবস্থান। সুফীবাদেও রয়েছে সমকামী ভালোবাসার জয়কীর্তন। তারপর কোথায় যেন একটা ছন্দপতন। ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে পুর্ব পাকিস্তান তারপর স্বাধীন বাংলাদেশ। এই পথচলায় রপ্তানি হোল ধর্মপরায়ণ সাধারণ মানুষ আর আমদানি হোল ওয়াহাবী ইসলাম। আশির দশক থেকে শুরু প্রাতিষ্ঠানিক ইসলামিকীকরণের এই জয়যাত্রায় বলি হচ্ছে দেশ, ইতিহাস, ঐতিহ্য, মানবতা।

দ্বন্দ্বটা সেখানেই। আমরা যারা নানাত্ববাদী, প্রগতিশীল, সমদর্শী এক সমাজ ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখি তাদের জন্য সমকামীদের অধিকার এক বৃহৎ আন্দোলনের একটি শাখামাত্র। অন্যান্য সামাজিক আন্দোলনের সাথে আমাদের আদর্শিক কোন ফারাক নেই। আমাদের কাজের ধরণ, প্রক্রিয়া, স্বরূপ এগুলো হয়ত আলাদা কিন্তু দিন শেষে আমাদের লক্ষ্য জ্ঞান আর যুক্তির উৎকর্ষসাধন। আমরা চেয়েছিলাম সমকামিতা নিয়ে নিরবতার অবসান ঘটাতে। অজ্ঞতা আর ধর্মীয় কুসংস্কারের লেবাসে মোড়ানো এই রুগ্ন সমাজকে বোঝাতে যে সমকামীরা প্রকৃতি, সমাজ বা ধর্মের শত্রু নয়।

বাংলাদেশে LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender) আন্দোলনের বয়স খুব বেশি নয়। উনবিংশ শতকে পৃথিবী জুড়ে HIV/AIDSকে ঘিরে যে জাগরণ তৈরি হয় তার রেশ বাংলাদেশে পৌঁছায় ৯০এর শেষের দিকে। অন্য অনেক দেশের মতোই বাংলাদেশেও শুরুর দিকে HIV/AIDS এক বড় ভূমিকা রেখেছে সমকামী পুরুষদের, নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে MSM'দের (men who have sex with men), বাস্তবতা নিয়ে কাজ করতে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে বেশ কিছু বড় বড় NGO এখন তাদের HIV/AIDS প্রজেক্টে MSM-দের নিয়ে কাজ করেন।

এখানে সরকারের দ্বিমুখী নীতির কথা না বললেই নয়। একদিকে HIV/AIDS এর বরাত দিয়ে সরকার কোটি কোটি টাকার প্রোজেক্ট চালাচ্ছে অপর দিকে বলছে দেশে কোন সমকামী নেই। MSM বললে আবার ঠিক আছে। এ সবই হচ্ছে শব্দের রাজনীতি। MSM মূলত একটি ক্লিনিক্যাল পরিভাষা যার দ্বারা একজন পুরুষের যৌন আচরণ বুঝায়। অপরদিকে সমকামী, উভকামী, গে বা LGBT শব্দগুলো শুধুমাত্র যৌন আচরণ নির্দেশ করে না। এর সাথে জড়িয়ে আছে প্রেম-ভালোবাসা, আত্মপরিচয় এবং অধিকারজনিত ব্যাপারগুলো। ঠিক যেমন সরকার আদিবাসি আর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী শব্দগুলো নিয়ে খেলছে।

শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবশ্য বাংলাদেশ সরকার অনেক বেশি সচেতন আজকাল। এই যে IS'কে কেমন Neo-JMB বানিয়ে ফেলেছে রাতারাতি।

সে যাই হোক, জাতীয় HIV/AIDS কৌশলপত্রে MSM-এর অন্তর্ভুক্তি কিছুটা হলেও সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে যৌন সংখ্যালঘুদের নিয়ে কথা বলতে। নিরাপদ যৌনসম্পর্ক, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, HIV-পজিটিভ হলে কি করণীয়, কোথায় কি সেবা পাওয়া যাবে, সেবা পাওয়া না গেলে কি করতে হবে, সামাজিক ও ধর্মীয় বিধি নিষেধ ইত্যাদি এই কৌশলপত্রের মূলপাঠ। এর আসল সুবিধাভোগী হচ্ছে হিজড়া জনগোষ্ঠী এবং নিম্নবিত্ত সমকামী পুরুষ। মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত সমকামী সমাজেকে টানতে পারেনি এই রোগ কেন্দ্রিক এবং NGO- নির্ভর উন্নয়নকর্ম। এই দুই শ্রেণির জন্য ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হয় ইন্টারনেট।

নতুন সহস্রাব্দের গোড়াপত্তনের সাথে সাথে বাংলাদেশও খুব অল্প পরিসরে শুরু করে তার ডিজিটাল পদযাত্রা। সাথে যোগ দেয় দ্রুত বিকাশমান মুঠোফোনের কারাভ্যান। শুরু হয় অনলাইনে গুটিকয়েক শিক্ষিত, সুবিধাপ্রাপ্ত, উচ্চবিত্ত যুবকের LGBT আন্দোলন গড়ে তোলার দুঃসাহসিক স্বপ্নযাত্রা। গড়ে উঠে অনলাইন-ভিত্তিক কিছু অনানুষ্ঠানিক গ্রুপ, যাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল সমমনা লোকদের একই ছাতার নিচে সংগঠিত করা এবং বাংলাদেশে সমকামীদের একটা কমিউনিটি তৈরি করা।

খুব অল্প সময়েই এই গ্রুপগুলো দারুণ জমে উঠে। সদস্য সংখ্যা ছাড়িয়ে যায় কয়েক হাজার। ধীরে ধীরে অনলাইন থেকে কার্যক্রম ছড়িয়ে পড়ে অফলাইনে। অনুষ্ঠিত হতে থাকে নানাবিধ নিয়মিত কার্যক্রম। যোগাযোগ তৈরি হয় দেশ-বিদেশের অন্যান্য সামাজিক আন্দোলনের সাথে। সেমিনার, কনফারেন্স, গবেষণা, জরীপ, আড্ডা, র‍্যালি, নাটক, ডকুমেন্টারি, লেখালেখি, ওয়ার্কশপ এসবের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে চলতে থাকে সাধারণ মানুষের মাঝে পৌঁছানোর কাজ। সর্বশেষে সংযুক্তি ছিল ম্যাগাজিন আর কমিক বই প্রকাশ।

আর এসব কাজের পিছনে ছিল জুলহাজ আর তনয়ের মতো একদল অকুতোভয় ভালোবাসার ফেরিওয়ালারা যাদের ছিল মানুষের উপর অগাধ আস্থা। জুলহাজ আসলেই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতো সবাইকে ভালোবাসা, জ্ঞান আর যুক্তি-তর্ক দিয়ে বুঝানো সম্ভব। কি ছেলেমানুষি চিন্তাভাবনা!

আসলে এই গ্রুপগুলো পরিচালিতই হতো এমন কাঁচা আদর্শিক মতবাদ দ্বারা, যেন সবাই একটা ইউটোপিয়ান সাম্রাজ্যের বাসিন্দা। অনিবন্ধিত, তহবিলশূন্য ও দীর্ঘমেয়াদি কৌশলহীন এই গ্রুপগুলো মূলত স্বেচ্ছাসেবক নির্ভর। এদের নেই কোন প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো, নেই সংগঠন তৈরির অভিজ্ঞতা, নেই আন্দোলন চালানোর রসদ। কিন্তু আছে রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও আইনি হাজারো প্রতিবন্ধকতা। এত দূর্বল হয়ে কিভাবে পারতাম আমরা এমন শক্তিশালী প্রতিপক্ষের সামনে দাঁড়াতে? কিন্তু আমাদের এই দূর্বল, কাঁচা আদর্শকে ওদের এত কেন ভয়? কেন ভালোবাসার জবাব দেয় ওরা চাপাতি দিয়ে?

হয়তো এতো কিছু ছিল না বলেই আমরা আজ এই পর্যন্ত আসতে পেরেছি। ১৫ বছর আগে যখন শুরু করেছিলাম তখন যদি কেউ আমাকে বলতো ২০১৬ সালে দুজন প্রাণ দিবে এই আন্দোলনের জন্য তাহলে হয়তো আমি হেসে উড়িয়ে দিতাম। এত অল্প সময়ে এত কিছু হয়ে যাবে আমরা ভাবিনি। কিন্তু তার মানে কি এই হত্যাকে আমি আন্দোলনের এক প্রকার সফলতা বলতে চাইছি? হ্যাঁ এবং না। এটা দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার।

জুলহাজ আর তনয় এর মৃত্যু স্পষ্টভাবেই আন্দোলনের একটা পরিণাম। কেউ এটাকে ব্যর্থতা বলবে আবার কেউ হয়তো বলবে যে আন্দোলন একটা জায়গায় পৌঁছাতে পেরেছে বলেই এমনটা হয়েছে। অনেকটা 'কাদম্বরী মরিয়া প্রমাণ করিল সে মরে নাই' টাইপ ব্যাপার। দৃষ্টিগ্রাহ্যতার রাজনীতির একটি ক্লাসিক উদাহরণ।

ইতিহাস বলে যে কোন সামাজিক আন্দোলনের একটা 'tipping point' থাকে যখন সেই আন্দোলন হয় আরও বেগবান। জুলহাজ আর তনয়ের মৃত্যুর পর গত এক বছরে সেটা যে হয়নি তা শুরুতেই বলেছি। কিন্তু তাই বলে কি নিকট ভবিষ্যতে হবে না?

আমরা আশাবাদী। ঘটনার আকস্মিকতায় আমাদের পা একটু টলমলিয়ে গেছে বটে কিন্তু আমরা এখনও সেই ইউটোপিয়ান রাজ্যেই আছি আমাদের কাঁচা আদর্শিক মতবাদ নিয়ে। আমরা আশা করি একদিন জুলহাজ আর তনয়ের হত্যাকান্ডের বিচার হবে। ওদের অনুপ্রেরণায় তৈরি হবে আরও জুলহাজ, আরও তনয়। ভালোবাসার ফেরিওয়ালাদের হাঁকডাকে মুখর হয়ে উঠবে আমার ফেলে আসা অলি-গলি, রাজপথ, ৩৫ নর্থ ধানমন্ডি।

ঢাকা, ২০১৭

প্রথম প্রকাশ : *শুদ্ধস্বর*, April 20, 2017 Issue 2

সংখ্যালঘু : প্রবন্ধ

কোনটা ধারাবিবরণী আর কোনটা প্রবন্ধ, সে লাইন টানা মুশকিল। আমরা টানলাম একেবারেই আন্দাজ মতো, যেভাবে একদা টেনেছিলেন র‍্যাডক্লিফ।

রাষ্ট্রই যখন নাগরিকদের বিরোধী

ওয়াক্কাস মীর

পণ্ডিতেরা বলেন সংবিধানের একটা বড় কাজ হলো সাধারণ মানুষকে নিগ্রহের হাত থেকে রক্ষা করা। নিগ্রহ? কে করে মানুষকে এই নিগ্রহ? অন্য মানুষ। ।শুনতে অবাক লাগলেও এটাই সত্যি। মানুষেরই হাতে মানুষ লাঞ্ছিত হয় রোজ। মানুষেরই হাত থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্য সংবিধানের দরকার।

আমরা নিজেদের সমাজেই সংখ্যালঘুদের সাথে কি রকম বৈষম্যমূলক আচরণ করি তা ভাবতে লজ্জা লাগে। ভেবে দেখুন দূর সাগরপারের কোনো দেশে যদি কোনো মুসলমানকে খানাতল্লাশী করা হয়, অথবা তাঁর সাথে কোনরকম বৈষম্য হয়, সে খবর শোনামাত্র আমরা সমালোচনার ঝড় বইয়ে দিতে কসুর করিনা। কিন্তু সেই আমরাই নিজেদের দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানুষদের ওপর দিব্যি চোখ রাঙিয়ে ফতোয়া জারি করি যে আমাদের অনুমোদন ছাড়া কোনকিছু করার স্পর্ধাও যেন তাঁরা না দেখান।এর থেকে বড় দ্বিচারিতা আর কী হতে পারে?

কিছুদিন আগে লাহোরে আহমদী সম্প্রদায়ের সাথে জেরকম ব্যবহার করা হলো তা বড়ই দুঃখজনক। অনেকেই অভিযোগ জানিয়েছিলেন যে ওঁদের 'উপাসনার জায়গা'গুলো নাকি বড্ড বেশি মসজিদের মত দেখতে। সেই জন্য পুলিশ গিয়ে সেখানে চড়াও হয়ে দেওয়াল থেকে সমস্ত কোরাণের বাণী মুছে দিলো, আর প্রচুর ইস্তেহার ঝুলিয়ে দিয়ে এলো যাতে কোনমতেই আর উপাসনাগৃহগুলিকে মসজিদের মত না দেখায়। উপাসনার জায়গা কেমন দেখতে হওয়া উচিৎ বা তাকে কি নামে ডাকা উচিৎ সে সম্পর্কে নিশ্চয়ই ঈশ্বর কোনো বিধান দেননি। কিন্তু স্বর্গত জিয়া-উল-হক সাহেবের কৃপায় আমাদের পাকিস্তানে এইরকম হওয়াটাই বিধান।

সত্যি বলতে কি আহমদীদের সাথে এই ধরণের বৈষম্য সেই ১৯৪৭ সাল থেকেই চলে আসছে। কে যে মুসলমান আর কে নয় তার বিচার করা কোনমতেই রাষ্ট্রের কাজ হতে পারেনা। কিন্তু পাকিস্তানে এরকম হয়েছে, হয় আজও। এদেশের রাজনীতিতে জাফরুল্লা খান সাহেবের মত বিদগ্ধ মানুষের সংখ্যা অত্যন্ত কম। বরং উল্টোটার অভাব নেই। স্বর্গত ভুট্টো সাহেবকেই দেখুন না। রাজনৈতিক চাপে পড়ে উনি সংবিধানের দ্বিতীয় ধারাও ওপর জোর দিয়েছিলেন — আহমদীদের 'অমুসলমান' বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। অবশ্য তার মানেই এ নয় যে উনি আহমদীদের ওপর অত্যাচার করার ক্ষমতা রাষ্ট্রকে দিয়েছিলেন। আজ যে সমস্ত অত্যাচার হচ্ছে তার কারণ অন্য।

কারণ -- মূলত জিয়া-উল-হকের কার্য্যকলাপ।আহমদী ধর্মাচরণ আর এর প্রচারকে হক সাহেব অপরাধের গোত্রে ফেলে দিয়েছিলেন। ওঁদের 'উপাসনার জায়গা'কে মসজিদ বলে উল্লেখ করা চলবেনা এই ফতোয়াও তিনিই জারি করেছিলেন। পাকিস্তানের ইংলিশ প্রেস, যারা নিজেদের 'লিবার্যাল' বলে গর্ব করে লেখাপত্র ছাপিয়ে থাকে, তারাই ১৯৭৪ এ আহমদীদের 'অমুসলমান' বলে দাগিয়ে দেওয়া নিয়ে বেবাক খুশিতে মেতেছিলো। নামী খবরের কাগজগুলোতে লেখা হয়েছিলো যে ''আহমদী 'সমস্যা'র অন্তে দেশে গণতন্ত্র ফিরে এলো''। পাকিস্তানি সংবিধান কখনোই 'কনস্টিট্যুশন অফ ফীলিং' হিসেবে তৈরি হয়নি -- এই শব্দটা প্রোফেসর নোয়া ফেল্ডম্যানের থেকে ধার করলাম। মার্কিন সংবিধানে দেশে অন্য ধর্মের প্রতিষ্ঠা করাটাই নিষিদ্ধ। কাজেই অন্য ধর্মের লোকেরা কিছুটা অপাংক্তেয় অনুভব করতেই পারেন। আমাদের সংবিধানে অবশ্য সেরকম কোনো বিধান নেই। কিন্তু আমাদের নিজেদের এইসব বৈষম্যমূলক ব্যবহারই অন্য ধর্মের মানুষকে অপাংক্তেয় করে দিচ্ছে।এর মত খারাপ জিনিষ আর কি হতে পারে?

রাষ্ট্র সরাসরি ধর্মীয় বৈষম্যের আইন চালু করছে তা হয়তো বলা যাবেনা। কিন্তু দেশের মানুষ যখন নিজেদের মধ্যে ধর্মের ভেদাভেদ গড়ে তুলছে রাষ্ট্র যে তাতে মদত দিচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। লাহোরের ঘটনাটার কথাই ভেবে দেখুন না। পুলিশ বারেবারে আহমদী মসজিদ থেকে কোরানের শরিয়ত মুছে দিয়েছে। যদি আজ আহমদীরা বা অন্য ধর্মের কেউ এসে মসজিদের দেওয়াল থেকে কোরান শরিয়ত মুছে ফেলতে চায় তাহলে তাদের হাল কি হবে? শুধু মসজিদই কেন, যদি কেউ কোনো মন্দির বা গীর্জা থেকে ধর্মীয় বাণী মুছতে যায় তার

কি হবে? কোন সন্দেহ নেই যে ধর্মীয় অপরাধের তকমা দিয়ে তাকে শাস্তির কাঠগড়ায় তোলা হবে। মুসলিম দেশ হলে হয়তো বা তার প্রাণদন্ডই হয়ে যাবে। কিন্তু এইক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মকে 'রক্ষা' করার দোহাই দিয়ে এরকম বারবার করা হচ্ছে, কেউ একে অপরাধ বলে মনেও করছেন না। আমি শুধু পুলিশদের দোষ দিচ্ছিনা। দেশের জনমত আর আইন এই দ্বিচারিতার ভিত্তি গড়েছে, একা পুলিশকে দোষ দিয়ে কি লাভ?

পাকিস্তানীদের মধ্যে যাঁরা মুসলমান নন তাঁরা তো কোনরকম ধর্মীয় স্বাধীনতার আশাই করতে পারেননা। তাঁদের ধর্মের কোনো কিছু যদি কোনো গোঁড়া মুসলমানের চোখে 'বেচাল 'ঠেকে তো সেই মুসলমান ভাই সোজা গিয়ে থানায় নালিশ ঠুকে দিতে পিছপা হননা। আর পুলিশের কাছে সে নালিশ রীতিমতো গ্রাহ্যও হয়। নিজেদের দেশে আমরা আহমদীদের সাথে যদি এমন ব্যবহার করি তাহলে অন্য কোনো দেশে মুসলমানদের সাথে বিষম ব্যবহার করা হয়েছে বলে গলা ফাটাবার মুখ আমাদের কী করে থাকবে? আর সেই সব দেশে অন্তত পুলিশ ধর্মের ভিত্তিতে কারুর ওপর চোটপাট করাকে আইনী স্বীকৃতি দেয়না।

আমাদের আসল সমস্যা হলো যে ধর্ম নিয়ে ন্যূনতম সহিষ্ণুতা দেখাতেও আমরা অরাজী। পাকিস্তানে যাঁরা মুসলমান হয়ে জন্মাননি বা কোনভাবে 'অমুসলমান'এর তকমা পেয়েছেন তাঁদের নির্বিচারে হুমকি দিয়ে কোণঠাসা করে রাখতে আমাদের এতটুকু বাধেনা। নিজেরই দেশে এঁরা রাতদিন ভয়ে ভয়ে কাটান। পাকিস্তানের আহমদীদের দেখুন, শিয়া সম্প্রদায়কে দেখুন, হিন্দুদের দেখুন, খৃষ্টানদের দেখুন, ছবিটা সর্বত্রই এক। অথচ ইসলাম ধর্মের কোথাও কি এমন নির্দেশ আছে যে অন্য ধর্মের লোকদের ওপর অত্যাচার করতে হবে? আমরা নিজেদের নৈতিকতায় জলাঞ্জলি দিয়ে সেটাই করে চলেছি। আমার পাকিস্তানি ভাইবেরাদরেরা এ'কথা শুনলেই ইজরায়েলের কথা তুলে কত কিছু বলবেন। ইজরায়েলাকে 'দুষ্টুলোক' বলে দেখাতে পাকিস্তান ভারি পটু। কিন্তু আমি জোর দিয়ে বলবো যে ইজরায়েল অন্তত ধর্মের দোহাই দিয়ে নিজেদের নাগরিকদের ওপর বৈষম্য দেখায়না। সে দেশটা ইহুদী, কিন্তু ওখানে ইহুদী নাগরিক আর খৃষ্টান নাগরিকেরা সমাজের কাছে একই ব্যবহার পেয়ে থাকে। ইজরায়েলের অন্যন্য নীতিতে কী খারাপ আছে কী ভালো আছে সেই নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই। আমরা এখানে ধর্ম ও নাগরিকতা নিয়েই কথা বলতে বসেছি।

কিন্তু ভেবে দেখুন আমাদের যে কারুর সাথেই তো এমন হতে পারতো। ঘটনাক্রমে যদি আমি বা আপনি আহমদী বা অন্য কোনো ধর্মের পরিবারে জন্মাতাম তাহলে এই আমাদেরই অত্যাচার, অনিশ্চয়তা, নিরাপত্তায়াহীনতায় দিন কাটতো। একজন মুসলমান নিজের ধর্মে ঠিক যতখানি বিশ্বাস, যতখানি আস্থা রেখে চলেন একজন অমুসলমানের কাছেও তাঁর ধর্ম তো ঠিক ততখানিই। তাহলে সেই বিশ্বাস, সেই আস্থার জন্য তাঁকে বারবার এমন হেনস্থা হতে হবে কেন? আমি জানি রাতারাতি সমস্ত আহমদী বিরোধী নিয়ম কানুন দেশ থেকে উবে যেতে পারেনা। আর নিয়ম কানুন গেলেও মানুষের মন থেকে খুব সহজে এই বৈষম্য মুছে যাবে সে আশাও আমার নেই। কিন্তু অন্তত একটা কাজ আমাদের করতেই হবে।যাঁদের মধ্যে সামান্যতম নৈতিকতা, মানবিকতা আছে তাঁদের আজ এগিয়ে এসে এই ধর্মীয় বৈষম্যের প্রতিবাদ করতে হবে।লাহোরে যা ঘটেছে, সারাদেশেই যা ঘটছে তার প্রতিবাদ করতে হবে। নেই।আজ এই যে আহমদীদের পক্ষ নিয়ে এতগুলো কথা বললাম এর জন্য পাকিস্তানে আমায় কত সমালোচিত হতে হবে তা আমার অজানা নেই।তবু এই কথা আমি বারবার বলে যাবো। কারণ ,এর মত সত্যি কথা আর কিছু নেই।

পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমরা কেমন আছেন?

সৌভিক ঘোষাল

মুসলিমদের কাজকর্মের চালচিত্র

পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমদের অবস্থা শীর্ষক যে খসড়া রিপোর্টটি ২০১৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল তাতে আমরা দেখেছি মুসলিম জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে গরিষ্ঠ অংশটি, গোটা জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক দিন মজুর হিসেবে জীবিকা অর্জন করতে বাধ্য হন। ৪৭.০৪ শতাংশ মানুষ দিনমজুর। এর পরে রয়েছে নিজের জমিতে চাষের কাজ। ১৫.৪২ শতাংশ মুসলমান নিজের জমিতে চাষাবাদ করেন। এছাড়া ক্ষেতমজুর হিসেবে অন্যের জমিতে চাষের কাজ করেন আরো ১০.১১ শতাংশ মানুষ। ছোট বড় ব্যবসার কাজে যুক্ত মানুষের সংখ্যা ২.৫৯ শতাংশ মাত্র আর বেতনভোগী হিসেবে পরিষেবা ক্ষেত্রে বা অন্যান্য ক্ষেত্রে যুক্ত আছেন ৫.৪৯ শতাংশ মানুষ।

সারণি – ১ এর দিকে লক্ষ্য করা যাক

এই সারণী থেকে বোঝা যায় মুসলিম জনগোষ্ঠীর বেশীরভাগ মানুষই অত্যন্ত নিম্ন আয়ের কাজের সঙ্গে যুক্ত। আমরা এর আগের এক পরিসংখ্যানে লক্ষ্য করেছিলাম উচ্চবর্ণের হিন্দুদের তুলনায় মুসলিমদের মধ্যে স্বাক্ষর শিক্ষিত এবং উচ্চশিক্ষিতদের হার অনেকটাই কম। ফলে সমীক্ষাকৃত পরিবারগুলির মধ্যে মাত্র ১০ শতাংশ মানুষ রয়েছেন, যেগুলিকে সুরক্ষিত এবং সামাজিকভাবে কাম্য বলা যেতে পারে। ছোট ও বড় ব্যবসা মিলিয়ে মাত্র ৬.৭ শতাংশ মানুষ ব্যবসায় নিয়োজিত। অন্যদিকে নিয়মিত পরিষেবা ক্ষেত্র বা বেতনভোগী পরিবার মাত্র ৪ শতাংশ। উচ্চ আয়ের পেশা, যেমন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার উকিল ইত্যাদিতে নিযুক্ত রয়েছেন মাত্র ০.৪ শতাংশ মানুষ, যা মুসলিম জনগোষ্ঠীর এক অতি ক্ষুদ্র অংশ।

পেশার বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে জেলাওয়ারি পার্থক্য খুব ব্যাপক। কৃষি মজুরির ওপর নির্ভরশীল পরিবারগুলির সংখ্যা উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোয় এবং নদীয়ায় খুব বেশি। এক্ষেত্রে রাজ্যের গড় হচ্ছে ৮.৭ শতাংশ। বিভিন্ন জেলার পরিসংখ্যান এরকম। নদীয়া – ১৯.৯%, কোচবিহার ১৯.২%, জলপাইগুড়ি ১৭.৩%, উত্তর দিনাজপুর ১৩.৫%, দক্ষিণ দিনাজপুর ১২.৩%, বাঁকুড়া ১১.৬%, মালদা ১১%, মুর্শিদাবাদ ১০.১%, পশ্চিম মেদিনীপুর ১০.৩%।

যারা পেশাগতভাবে চাষের ওপর নির্ভরশীল, তাদের ক্ষেত্রেও জেলাওয়ারি পার্থক্য দেখা যায়। বর্ধমানে চাষের ওপর নির্ভরশীল ২৪.৪ শতাংশ পরিবার। এটা রাজ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ। সর্বনিম্ন পুরুলিয়ায় – ৮.৪%। বিভিন্ন জেলায় এই গড় হল – উত্তর দিনাজপুর ১৭.৯%, মালদা ১৭.৮%, দক্ষিণ দিনাজপুর ১৭.৫%, মুর্শিদাবাদ ১৭.৪%, পশ্চিম মেদিনীপুর ১৬.১%, বীরভূম ১৪.৫%, জলপাইগুড়ি ১৪ এবং বাঁকুড়া ১৩.৫%। এক্ষেত্রে রাজ্যের গড় ১৩.৫%।

কৃষক ও ক্ষেতমজুর পেশায় বিভিন্ন জেলার মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায় তার থেকে কতগুলো চোখে পড়ার মত বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। যেমন বর্ধমান জেলায় কৃষকদের শতাংশ রাজ্যগত গড়ের চেয়ে অনেকটা বেশি কিন্তু ক্ষেতমজুরের শতাংশমাত্রা কম। এ থেকে বোঝা যায় বর্ধমান জেলায় মুসলমানদের মধ্যে ভূমিহীনতার মাত্রা অন্যান্য জেলা অপেক্ষা কম।

এছাড়াও ঠিকা শ্রমিক ও কৃষি বহির্ভূত বিভিন্ন কাজ যেমন নির্মাণ শ্রমিক, গৃহ শ্রমিক, কুলি, ঝাড়ুদার, কাগজ কুড়ানি ইত্যাদিতে যুক্ত লোকের শতাংশ রাজ্যগতভাবে ৪২.৬। তবে এক্ষেত্রেও জেলাগত বিভিন্নতা খুব স্পষ্ট। যেমন দক্ষিণ দিনাজপুরে এটি ৫৭.৩%, কোলকাতায় ১৭%।

ছোটখাট কাজে স্বনিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে আছেন দোকানদার, হকার, ভেন্ডার, সিকিউরিটি গার্ড, বিড়ি শ্রমিক ও অন্যান্যরা। এই ধরণের কাজে নিযুক্ত লোকেদের সর্বোচ্চ সংখ্যা পুরুলিয়ায় (২২.৭%) ও সর্বনিম্ন দক্ষিণ দিনাজপুরে (২.১%)। রাজ্যগতভাবে এক্ষেত্রে গড় হল ৮.৩৪ %।

রাজ্যের মুসলমান পরিবারগুলোর মধ্যে ৫.১২ % নানা ধরণের পরিবহন শ্রমের সঙ্গে যুক্ত। এঁদের মধ্যে পড়েন ড্রাইভার, কনডাক্টার, খালাসি, রিক্সাচালক, ভ্যানচালক প্রভৃতি। এই কাজে দার্জিলিং এ লিপ্ত ১২.৯%, কোচবিহারে ৯.৪%, কোলকাতায় ৮.৭% মুসলিম মানুষ।

ব্যবসা বাণিজ্যে নিযুক্ত পরিবারের সংখ্যা কোলকাতায় সবচেয়ে বেশি (১৭.৫%), তারপর উত্তর ২৪ পরগণা

(৫.৮%), দক্ষিণ ২৪ পরগণাতে (৫.৫%)। নদীয়ায় এটা সবচেয়ে কম – ১.৭%। সমীক্ষাকৃত পরিবারগুলির মধ্যে বেতনভোগী পেশা, সরকারি কাজকর্মে মাত্র ০.৩৬ শতাংশ মানুষ যুক্ত, এদের বেশীরভাগটাও কোলকাতায়।

মুসলিম জীবনযাত্রা সম্পর্কিত পরিসংখ্যানগুলি থেকে এটাই বেরিয়ে আসে যে জীবনধারণের জন্য এ রাজ্যের মুসলিমদের কঠোর দৈহিক শ্রমের ওপরেই মূলত নির্ভর করতে হয়। বৌদ্ধিক শ্রমে নিয়োজিত মানুষের সংখ্যা খুবই কম। তবে বিভিন্ন জেলায় পেশাগত বৈচিত্র্য আছে। মুসলিমদের জীবন যাপনের মানোন্নয়নের জন্য এই পার্থক্যের দিকগুলিকে মাথায় রেখে পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজনিয়তা আছে।

এই রাজ্যের মুসলমানদের সঙ্গে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে মুসলিমদের দুটি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে। সর্বভারতীয় চিত্রের বিপরীতে এই রাজ্যে গ্রামে বাস করা মুসলমানদের সংখ্যা যথেষ্ট বেশি। দ্বিতীয়ত সর্বভারতীয় মানের তুলনায় এ রাজ্যে কর্মনিযুক্তির প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে কম। এই দুটি ক্ষেত্র মিলিয়ে সামাজিক কর্মনীতি এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা কাঠামোয় তাদের ভূমিকাও তুলনামূলকভাবে ন্যূন হয়। এই অবস্থার কোনও মৌলিক পরিবর্তনের দিকে নজর দেওয়ার পরিবর্তে বর্তমান শাসকদের লক্ষ্য মুসলিম সমাজের ধর্মীয় শিরোমণিদের কিছু সুযোগ সুবিধে পাইয়ে দিয়ে সংখ্যালঘু ভোট করায়ত্ত করা এবং সাধারণ সমাজ কাঠামোয় যথাস্থিতি বজায় রাখা। মুসলিম সমাজের ব্যাপক মানুষ অবশ্যই শাসকের এই সুবিধাবাদী কৌশলের মোকাবিলা করবেন এবং সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে উপযুক্ত রাজনৈতিক-সামাজিক কর্মকাণ্ড গ্রহণ করবেন। সেই বিকাশের প্রধানতম রাস্তাটি নিঃসন্দেহে শিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়ন।

মালোপাড়ার বাংলাদেশ

ফিরোজ আহমেদ

সাম্প্রদায়িকতা রাজনীতির জটিলতম প্রশ্ন। সাম্প্রদায়িকতাকে ব্যবহার করে ক্ষমতায় যাওয়া যেতে পারে, সাম্প্রদায়িক শক্তিকে সক্রিয় রাখার বন্দোবস্ত করেও রাজনীতির ফায়দা হাসিল হতে পারে। বাংলাদেশের বুর্জোয়া রাজনীতি বহুবিচিত্র উপায়ে সাম্প্রদায়িকতার রাজনৈতিক ব্যবহার করতে যে সক্ষম হচ্ছে, তার উৎস তো নিহিত আছে জনগণের মাঝে টিকে থাকা শক্তিশালী সাম্প্রদায়িক ভাবমানসের মাঝেই...। সম্প্রতি বাংলাদেশের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক হামলায় হিন্দু অধ্যুষিত বিধ্বস্ত জনপদ যশোর ঘুরে লেখক লিখছেন এর আদ্যোপান্ত।

ক. বিদ্বেষের তত্ত্বতালাশ

"একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন, ব্রিটিশরা যেটাকে সাম্প্রদায়িকতা বলছে, হিন্দু-মুসলমান বিভেদ বলছে, যার ভিত্তিতে ভারত পাকিস্তান ভাগ হলো, সেই জিনিসটা কিন্তু ব্রিটিশ আসার আগে এ দেশে ছিলো না।" ব্রাত্য রাইসুকে দেয়া সাক্ষাতকারে সলিমউল্লা খানের বরাতে পাওয়া অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের এই মতামতটি গ্রহণ করা কঠিন। সাম্প্রদায়িকতা কিংবা হিন্দু মুসলমান বিভেদের সামাজিক কারণগুলো উপস্থিত ছিলো, শুধু তাই নয়, ব্রিটিশদের আগমনের আগে থেকেই যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। মঙ্গল কাব্যের বহু লেখকই দুই সম্প্রদায়ের সংঘর্ষ সম্পর্কে একটি পরিচ্ছদ রাখতেন, অন্যান্য সূত্রগুলোতেও (elaboration required) এমন নিদর্শন ঢের আছে।

সুলতানী আমলে লিখিত বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলের বর্ণনায় মুসলমান কাজী হিন্দুর আচারাদি পালনে কোনো আপত্তি করেননি। মোল্লা কিন্তু সর্পদেবীর পূজানুষ্ঠানের অনুমতি দেয়ায় কাজীকে ভর্ৎসনা করেন। কাজী আর মোল্লার মাঝে ফারাকটি জরুরি, একজন রাজমতাকে প্রতিনিধিত্ব করছেন, অন্যজন সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করছেন। রাজার লক্ষ্য কর আদায়, মতার বিকাশ এবং স্থায়িত্ব সাধন, তাই প্রয়োজন যথাসম্ভব সাম্প্রদায়িক স্থিতাবস্থা বজায় রাখা। এসবের স্বার্থেই তিনি সাধ্যানুযায়ী সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসকে নিরুৎসাহিত করবেন, কিন্তু নিজ ধর্মের লোকদের কাছে 'ধার্মিক' সাজারও যথাসম্ভব চেষ্টা করে যাবেন। রাজার বিপদ একদিকে সংখ্যাগুরু ভিন্ন ধর্মাবলম্বী প্রজাকে ক্ষিপ্ত করতে সাহস না করা, অন্যদিকে তার শেষ ভরসা এবং মতার ভিত্তি নিজ ধর্মাবলম্বীদের সমর্থন হারানোর আশঙ্কা। সুলতানী আমল পরবর্তী মোঘল আমলেও রাষ্ট্রক্ষমতা এবং সম্প্রদায়ের প্রতি পপাত প্রদর্শন করা না করার এই জটিলতার আভাস পাওয়া যাবে ১৬৪০ সালের একটি বিচারের ঘটনার বর্ণনায়, যেখানে আধুনিক মেদিনীপুর জেলায় একজন বাঙালী মুসলিমের বিচার করছিলেন আরেকজন বাঙালী মুসলিম কাজী। অপরাধ ছিল হিন্দুগ্রামে এক জোড়া ময়ূর হত্যা ও ভক্ষণ, কাজী অভিযুক্তকে চাবকানোর হুকুম দিয়ে রায়ের ব্যাখ্যায় বলেন ছেষট্টি বছর আগে বঙ্গবিজয়ের সময়ে সম্রাট আকবর কথা দিয়েছিলেন যে বাঙালীদের তাদের প্রথা আর আইন অনুসরণ করতে দেয়া হবে। ফলে হিন্দুগ্রামে প্রাণীহত্যা করে মুসলমান প্রজাটি আইন ভঙ্গ করেছেন।

কিন্তু রাজনীতি সর্বদা মতার বাধা নিয়মে চলেন না, দাঙ্গাটা হঠাৎ হঠাৎ লাগতো। বিপুল সংখ্যাগুরু হলেও রাজক্ষমতারহিত হিন্দু জনগোষ্ঠীই এই দাঙ্গার শিকার হতেন এবং তাদের জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হতো, কবি বিজয়গুপ্তের বর্ণনায় —

"যাহার মস্তকে দেখে তুলসীর পাত।
হাতে গলায় বাঁধি লয় কাজির সাক্ষাৎ।
কক্ষতলে মাথা থুইয়া বজ্র মারে কিল।
পাথর প্রমাণ যেন ঝড়ে পড়ে শিল।
পরের মারিতে পরের কিবা লাগে ব্যথা।"

এই 'পর' তো শুধু ব্যক্তিগতভাবেই পর না, তুলসীধারণকারী সম্প্রদায়গত পরও বটে। কিন্তু এরপরও রাজক্ষমতা দাঙ্গা এড়িয়ে চলতে চাইতো, চৈতন্যদেবের

প্রতি বিদ্বিষ্ট কাজীও মহাসঙ্কীর্তন রুদ্ধ করতে এসে শেষ পর্যন্ত তার প্রেমভাবে মুগ্ধ হয়ে তাকে আলীঙ্গন করেন, এমন বর্ণনাও পাওয়া যাবে চৈতন্যের জীবনীতেই। আবার মোঘল সাম্রাজ্যেও একটা প্রকাশ্য সম্প্রীতির ভাব থাকলেও পারিবারিক দ্বন্দ্বে জীর্ণ হবার পর আওরঙ্গজেবের আমলে ধর্মীয় চিহ্নগুলোই যে প্রধান হয়ে উঠলো তার কারণ তার ভিত্তিটা সর্বদাই অস্তিত্বশীল ছিল।

অধিকাংশ ইতিহাসবিদের মোটামুটি গ্রহণযোগ্য মত হলো সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সাধারণভাবে শান্তিপূর্ণই ছিলো, এমনকি হিন্দু-মুসলিম মিলন, পরস্পরের সংস্কৃতি সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও উপভোগের অজস্র দৃষ্টান্তও ইতিহাসে পাওয়া যায়। মমতাজুর রহমান তরফদার ভাষায় "হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সম্পর্ক ছিল আন্তরিকতাপূর্ণ এবং ধর্মান্ধতার ঘটনা ছিল বিরল।" যদিও "সতর্কতার সাথে এসব গ্রন্থ পড়লে মনে হয় যে কিছু কিছু মুসলমান কর্মকর্তার ব্যক্তিগত খেয়াল ও ধর্মান্ধতা এসব সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের জন্য দায়ী ছিল। আবার, সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার ঘটনাও ঘটেছিল" (হোসেনশাহী বেঙ্গল)। অর্থাৎ প্রাকবৃটিশ আমলে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের তুলনায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিই প্রধান প্রবণতা ছিলো, এই মতটি একভাবে মেনে নেয়া যায়, কিন্তু জিনিসটা ব্রিটিশরা আসার আগে এ দেশে ছিল না, এই মতটি মেনে নেওয়ার মত নয়।

তারপরও অধ্যাপক রাজ্জাকের বক্তব্যটির সারকথাটুকু গ্রহণ না করে উপায় থাকে না, কেননা আমাদের চেনা সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জন্ম এবং বিকাশ ঔপনিবেশিক শাসকদের আশ্রয়ে এবং মদতে; হিন্দু মধ্যবিত্তের বিকাশের আদিপর্বে আধুনিক সাম্প্রদায়িকতার সূচনা এবং তারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ পরবর্তীতে বিকশিত মুসলমান মধ্যবিত্তের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তার রমরমা। বিশেষ করে ব্রিটিশ আমলের শেষ পর্বটি এক রকম সাম্প্রদায়িক সংঘাতেরই ইতিহাসে পরিণত হয়, সাম্প্রদায়িকতার রাজনৈতিক ব্যবহার পরিণত হয় নৈমিত্তিক চর্চায়।

খ. বিদ্বেষের জের

ফরায়েজি আন্দোলন মুসলমান চাষা সম্প্রদায়ের ভেতর তৈরি হওয়া গোষ্ঠী অনুভূতির একটা বিশিষ্ট উদাহরণ, মর্মগত দিক দিয়ে পূববাঙলার নমঃশূদ্র চাষাদের মতুয়া ধর্মও তাই। একটি 'খাঁটি' ইসলাম কায়েমের ছলে দরিদ্র চাষীদের একজোট করেছিল, অন্যটি 'ভক্তি' আন্দোলনের ছলে বর্ণহিন্দু গোষ্ঠীর হিন্দুত্বের খাতা থেকে বাতিল হয়ে 'চণ্ডাল' তকমা পাওয়া জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করেছিল। একদা প্রভাবশালী এই দুটি ধর্মগোষ্ঠীই আজ কেবল ইতিহাসের বিষয়।

সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীস্বার্থে এককাট্টা জমায়েতে আসা মানুষেরা একই সময়ে ভিন্ন অনুভূতির প্রাবল্যে ভিন্ন নিশানেও এক হতে পারেন। একটা চমৎকার উদাহরণ দেওয়া যাক : "পূর্ববঙ্গের নমঃশূদ্র কৃষকদের একীভবনের আরও একটি স্তর ছিল। যারা হিন্দুকরণের রাজনীতিতে সাড়া দিচ্ছিলেন, তারাই কিন্তু আবার শ্রেণিভিত্তিক আন্দোলনেও যোগ দিচ্ছিলেন। ১৯৩৭ সালের মাঝামাঝি থেকেই খুলনা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি জেলায় 'কম্যুনিস্ট ধাঁচে কৃষক সমিতি' গড়ে উঠতে শুরু করে, আর এই জেলাগুলোতে হিন্দু কৃষকদের অধিকাংশই ছিলেন "নমঃশূদ্র" (*উন্নয়ন বিভাজন ও জাতি : বাংলায় নমঃশূদ্র আন্দোলন ১৮৭২-১৯৪৭*, শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়) । একই উদহারণটি একই সময়ের মুসলমান চাষাদের জন্যও খাটে, তেভাগা আন্দোলন আর পাকিস্তান আন্দোলনে মুসলমান চাষার হৃদয় যেভাবে সাড়া দিয়েছে, খোকা রায়ের স্মৃতি কথায় উদ্ধৃত একটি বাক্যে তার পুরো প্রেক্ষিতটি পরিষ্কার হয়। ময়মনসিংহের এক মুসলিম লীগ নেতা গিয়াস পাঠান চাষীদের বলছেন : 'মিয়া, পাকিস্তান হইলে তেভাগা না, চৌভাগা পাইবা!' এর সরল অর্থ হচ্ছে হিন্দু জমিদার না থাকলে মুসলমানদের রাজত্বে চৌভাগা, অর্থাৎ মালিকের স্বত্বটাই কৃষকরা পাবে এই প্রলোভনটাই চাষীদের সামনে হাজির করে দরিদ্র চাষীদের জড়ো করা সম্ভব হয় মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্ত নেতাদের পেছনে।

চাষার হৃদয়ে একইসাথে শ্রেণিদ্বন্দ্ব আর ধর্মীয় পরিচয়ের ঐক্যের টানাপোড়েন ঔপনেবিশক আমলে যেভাবে জারি ছিল, তারই চূড়ান্ত ফল হলো জাতীয়তাবাদী সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কাছে শ্রেণির রাজনীতির পর্যুদস্তই না কেবল, অনেকখানি অধীনস্তহওয়া। কোলকাতা থেকে শুরু করে নোয়াখালি পর্যন্ত ৪৭ এর রক্তস্নাত দিনগুলো তাই নিয়তির মতই নেমে এল।

গ. সাম্প্রদায়িকতার পাটাতন কি উচ্ছেদ হয়েছে?

পাকিস্তান আন্দোলনে পূর্ববাঙলাকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলো বাঙালি আশরাফ মুসলমান নেতৃত্ব, আর পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে বাঙালি আতরাফ মুসলমান নেতৃত্ব, রিচার্ড এম. ইটনের মূল্যায়নটি এমনই। কিন্তু এই সারসংক্ষেপের খাঁড়ার নিচে কাটা পড়ে যায় তৎকালীন পূর্ববাঙলারই বাসিন্দা বিশাল হিন্দু জনগোষ্ঠী, সাথে আর সব সংখ্যালঘু ধর্মসম্প্রদায়ও। বদরুদ্দীন উমরের মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কিত আলোচনাতেও এই সীমাবদ্ধতাটি প্রকাশিত; কিন্তু এ কথাও ঠিক যে মৌলবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতার পার্থক্য এবং বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন তিনিই প্রথম, এবং সবিস্তারে। কিন্তু যখন তিনি বলেন বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা নেই কারণ সাম্প্রদায়িকতার আর্থ-সামাজিক ভিত্তি নির্মূল হয়ে গিয়েছে, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বিষয়ে তার যুগান্তকারী আলোচনার পরও এই সারসংকলনটুকু অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদী সরলীকরণের দোষে দুষ্ট। হিন্দু জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগত উচ্ছেদের কারণে যদি সাম্প্রদায়িকতার আর্থ-সামাজিক ভিত্তি উচ্ছেদ হয়েই থাকে (কারণ কেড়ে নেওয়ার মতো আর কোনও সম্পদ বাংলাদেশের হিন্দু সমাজের নেই, যেটা আছে ভারতের কোনও কোনও অঞ্চলে মুসলমান জনগোষ্ঠীর হাতে এবং সেইটাই সেখানকার সাম্প্রদায়িকতার আর্থ-সামাজিক ভিত্তি)—এটা তো ভোলার উপায় নেই যে সাম্প্রদায়িকতার 'আর্থ-সামাজিক ভিত্তি' উচ্ছেদের এই প্রক্রিয়াটি ছিল নারকীয়, এবং এর নৃশংস রক্তপাতময় স্মৃতি এখনো যৌথস্মৃতিতে দগদগে ঘা এর মতোই বিকট। এর চেয়ে বড় কথা হলো, সাম্প্রদায়িকতার গভীর সাংস্কৃতিক আবহটি কোনও শিক্ষা-সংস্কৃতিগত সংগ্রাম ব্যতীত, পরমত সহিষ্ণুতার ক্ষেত্র প্রস্তুতি ব্যতীত শুধু অপরের শারীরিক উচ্ছেদ হবার মধ্য দিয়ে কিছুতেই দূরীভূত হয় না।

পাকিস্তান আমলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশের একটা বড় বৈশিষ্ট্য ছিল দ্বিজাতিতত্ত্বকে অস্বীকার করা, এই বিরোধিতার সারকথা ছিল ধর্মীয় ঐক্য নয়, বরং ভাষা, ঐতিহ্য এবং ইতিহাস জাতীয়তার ভিত্তি। তারপরও একদম বাহাত্তর সাল থেকে যে রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার শাসকেরা যে সাম্প্রদায়িকতার রাজনৈতিক সুবিধা গ্রহণে যথেষ্টই আগ্রহী ছিলেন, তার নিদর্শন বহু। একাত্তর পরবর্তী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীনদের রাজনৈতিক স্বার্থের সাথে পুরোপুরি যায়নি, এবং খুব দ্রুত ও নিশ্চিত গতিতেই অসাম্প্রদায়িক চেতনার পরাজয় ঘটতে থাকে বাংলাদেশে।

হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর সামাজিক নিপীড়ন ও চাপ সৃষ্টি করার প্রধান আইনী হাতিয়ার অর্পিত সম্পত্তি আইন বা শত্রু সম্পত্তি আইন দাপটের সাথেই চালু থাকে, রাষ্ট্রের মুসলমানীকরণও ধীরে হলেও অব্যাহত থাকে। এভাবে '৬৯ এবং '৭১ এর তীব্রতম সংগ্রামের পরও নানান ঐতিহাসিক পাকেচক্রে ক্ষমতায় আসীন হয় যে শ্রেণিটি, জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কোনও কার্যকর কর্মসূচির অভাবে এবং লুণ্ঠন তাদের সম্পদ উপার্জনের প্রধান তৎপরতা হবার কারণে আর সব প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর মতোই তারাও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ধারাকেই বাংলাদেশে স্থাপিত করার চেষ্টা করে।

বরং বলা যায়, পাকিস্তান আমলের যে গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার পাল্টা বিকাশ ঘটা শুরু করেছিল, জনগণের ভাবমানসের ওপর তার প্রভাবটুকু, ওই ছাপটুকুই বরং সমাজকে কিছুটা সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ মুক্ত করেছিলো, রাষ্ট্রকে বাধ্য করেছিলো বুলিবাগিশী হলেও অসাম্প্রদায়িক অলঙ্কারে ভূষিত হতে। শাসকদের কিন্তু সর্বদাই চেষ্টা ছিল সাধ্যানুযায়ী জনগণের মাঝে সাম্প্রদায়িক অনুভূতিটাকে প্রবলতর করার, সেটা শিক্ষা ব্যবস্থায় কোনও মৌলিক পরিবর্তন না করা থেকে শুরু করে রাষ্ট্র নানান ধর্মীয় আয়োজন নতুন করে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে করা থেকে ধীরে ধীরে পরিষ্কার হতে থাকে। সেই সাথে ভারতে আশ্রয় নেয়া হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্পত্তি দখল তীব্র আকার নেয়। এরই ধারবাহিকতায় জিয়াউর রহমান এই কাজটিকেই আরও পাকাপোক্তভাবে সম্পন্ন করেন এবং অলঙ্কারটুকুও বাদ দিয়ে রাষ্ট্রের ধর্মীয় চেহারা সুস্পষ্ট করেন।

সাম্প্রদায়িকতার সাংস্কৃতিক ভিত্তি নির্মূল হবার কোনও কারণ বাংলাদেশে ঘটেনি, সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের হীন দৃষ্টিভঙ্গির কোনও অবসান এখানে হয়নি। এবং এর ফলেই মতাসীন কোনও তরফ ভূসম্পত্তি দখল কিংবা উৎখাতের সহজ ল্য হিসেবে তাকে বেছে নিতে পারে, সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের ওপর ভিত্তি করে নারী নির্যাতনও পরিচালনা করতে পারে, যেটি আবার প্রতিপকে আরও দুর্বল করারই একটা অস্ত্র মাত্র। ধীরগতিতে সম্প্রদায়গত সংখ্যালঘুকে নির্মূল করার একটা শক্তিশালী সামাজিক-

রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এখানে কার্যকরভাবে জারি রয়েছে।

কিন্তু বিপরীতে এও সত্য যে রাষ্ট্র ও সমাজের বিকাশের সাথে সাথে, তার উৎপাদিকা শক্তির অগ্রগতি এবং মালিকানা সম্পর্কের বদলের সাথে সাথে আর সব সম্পর্কের মতো সম্প্রদায়গত সম্পর্কও পরিবর্তিত হয়। হিন্দু জমিদারের প্রতি বিদ্বেষের বাস্তব কারণ যখন অনুপস্থিত হয়, বাকি থাকে কেবল পারস্পরিক সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় অসূয়া। সেটাও খানিকটা দুর্বল হয়ে যাবার শর্ত তৈরি হয়েছে গ্রামীণ ও মফস্বলী ভেদরেখা মুছে ফেলা নাগরিক জীবনের বিস্তারে। আভিজাত্য-ধর্ম-সম্প্রদায় ইত্যাদির ভেদ মুছে প্রাত্যহিক লেনদেনের সম্পর্কই প্রবলতর হয়ে ওঠার সুযোগ তৈরি হয়। তারপরও সাম্প্রদায়িকতার এই সাংস্কৃতিক অবশেষও খুবই শক্তিশালী রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে কার্যকর আছে। কেননা সহজে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে এমন বিপুল ছিন্নমূল এবং রাজনৈতিক ভাবে অসংগঠিত শ্রমজীবী মানুষ আছেন, সংখ্যালঘুর সম্পত্তি দখলে আগ্রহী এমন মতাবান মধ্যবিত্ত আছেন এবং সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নটিকে ব্যবহার করে ভোট বাগাতে চান এমন রাজনৈতিক নেতাও আছেন।

ঘ. সাম্প্রদায়িকতা রোখা কার দায়?

বাধ্য না হলে রাষ্ট্র সংখ্যালঘুর স্বার্থরায় যে উদ্যোগী হবে না, তা শুধু ক্রমে ক্রমে হিন্দু জনগোষ্ঠীর ভূসম্পত্তি অর্পিতসম্পত্তি আইনের গ্যাড়াকলে বেহাত হয়ে যাওয়ায় না, চাকরি-বাকরিতে তার সংখ্যার প্রতিনিধিত্ব না ঘটনায় না, বাংলাদেশে হিন্দু নাগরিকের একটা বিশাল অংশ দেশান্তরী হওয়া থেকেও নয়, বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পরিচালিত স্রেফ একতরফা হামলাগুলো প্রতিরোধে সরকার বা প্রশাসনের তেমন কোনও ব্যবস্থা না নেয়া থেকেও পরিষ্কার। ন্যূনতম মজুরির দাবিতে আন্দোলনরত গার্মেন্ট শ্রমিকদের গুলি করতে তার বাধে না, সারের দাবিতে কৃষকের ওপর গুলি করার ঐতিহ্য যেমন এই রাষ্ট্রের আছে, আছে ভিয়েতনামে যুদ্ধের প্রতিবাদে সংহতি মিছিলে গুলি করার কৃতিত্বও, কিন্তু সাম্প্রদায়িক হানাহানি বন্ধে আজ পর্যন্ত আইনের হাতকে উত্তোলিত হতে আমরা দেখিনি কখনো। রাষ্ট্রে নিরাপত্তা আর নাশকতা দমনের নামে কত শত গণবিরোধী ফ্যাসিস্ট নীতি বাস্তবায়িত হয়, নিত্য নতুন বাহিনি গড়ে তোলা হয়, কিন্তু সাম্প্রদায়িক আক্রমণ বন্ধে তা কবে কোথায় কাজে লেগেছে?

সর্বশেষ নির্বাচনোত্তর সাম্প্রদায়িক হামলার সরকারি দল সমর্থকেরা তাদের পুরো আলোচনার কেন্দ্রে রাখছেন হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর বিএনপি- জামায়াতের হামলা, যদিও যশোরের অভয়নগরের বিজয়ী সরকার দলীয় সংসদ সদস্য প্রকাশ্যে অভিযোগ করেছেন ওই হামলায় পূর্বতন সংসদ সদস্য ইন্ধন জুগিয়েছেন, যিনি ছিলেন আওয়ামী লীগেরই হুইপ। রামুতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ওপর হামলায় একই দৃশ্য আমরা দেখছি, আমরা দেখেছি সাঁথিয়াতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপমন্ত্রীটির পাশে প্রধান হামলাকরীদের ভীড়। কিন্তু সাম্প্রদায়িক হামলা নিয়ে অনলাইন প্রচারণার প্রায় পুরোটা এবার গরম ছিল প্রথম আলোর কথিত 'ছবি জালিয়াতি' নিয়ে। এই প্রপাগাণ্ডার ডামাডোলটা বাজানো হয়েছে একটা ভয়ঙ্কর সত্যকে আড়াল করা হয়েছে, সেটা এই ঘটনারই অন্যপিঠ : এই হামলা ঠেকাবার দায়িত্ব কার ছিল? কেন থানা থেকে অল্প মিনিটের রাস্তায় শত শত ঘরবাড়ি ভেঙে ফেলা সম্ভব হয়? টিভিতে তা প্রায় লাইভ দেখানো হয় অথচ পুলিশ খবর পায় না! কে শপথবদ্ধ ছিল এই মানুষগুলোকে রায়? কে? কারা?

নির্বাচন কমিশনের শপথ নিয়েছিলো ভোটারদের রার এবং আইন শৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখার; স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ছিল নাগরিকদের রা করা। সেটা তারা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে, এই সত্যটা এনারা ভুলিয়ে দেয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। এই অর্ধসত্যের কারবারিরা সাম্প্রদায়িক হামলার সাংস্কৃতিক পরিবেশটা টিকিয়ে রেখে এর রাজনৈতিক ফলটা হজম করতে চায়, পুরো প্রক্রিয়ার তারা একটামাত্র উইংমাত্র, আর অল্পকিছু সরল বিশ্বাসে সেই ডামাডোলে যোগ দেন। সাম্প্রদায়িক হামলাকারীদের গ্রেফতার করা হয় না, বিচার হয় না, তদন্তও হয় না, ব্যর্থ প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের শাস্তিও হয় না; কিন্তু সেটাকে ব্যবহার করা হয় নিজেদের টিকে থাকাকে বৈধ করার জন্য। নব্য কিংবা ঝানু আওয়ামী সমর্থকেরা ক'জন সরকারের দায় নিয়ে কথা বলেছেন? প্রায় কেউ-ই না।

সাঈদীর ফাঁসির রায়ের ঘটনায় সাম্প্রদায়িক হামলা পরিচালনা করা হয়েছে গোটা হিন্দু সম্প্রদায়কে রাজনৈতিকভাবে জিম্মি করার জন্য, যুদ্ধাপরাধীর বিচারকে বানচাল করতে নিরপরাধ মানুষকে লক্ষ্যবস্তু করা। রামুতে

জমির লোভই প্রধান ভূমিকা রেখেছে। অভয়নগরে দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বীক ভোট দেয়ার প্রতিশোধ নেয়া হয়েছে। উল্টোদিকে, রামপালে ভারতীয় পুঁজির সহায়াতায় সুন্দরবনধ্বংসী কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্পের নামে যাদের জমি অধিগ্রহণ করছে আওয়ামী লীগ, সেই বসতভিটা-আবাদী জমিহারারা প্রায় সর্বাংশে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ। প্রকল্পের স্থান নির্বাচনে এই সাম্প্রদায়িক হিসাব নিকাশ খুব গূরুত্বপূর্ণ, এবং কেবল 'নোমো'রাই উচ্ছেদ হবে, কাজেই মুসলমানদের আপত্তি করার কিছু নাই, এমন প্রচার স্থানীয় লীগ নেতারা অকাতরেই চালাচ্ছে। বাংলাদেশের লুটেরা রাজনীতির দুটো দিক এ থেকে স্পষ্ট, এই ডাকাতরা কেউ জনসমর্থন আদায় করে ভিন্ন সম্প্রদায়ের ঘড়বাড়ি আগুনে পুড়িয়ে; কেউ সেই পোড়া ঘড়বাড়ি দেখিয়ে নিজের দলে ভোট টানায়। ফলে সাম্প্রদায়িকতা বন্ধে বাস্তব আগ্রহ দুই জোটের কারোরই নেই। আইনবিদ ব্যরিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়ার ভাষায়: "জামাত-শিবির-বিএনপি এলে দেশে অরাজকতা হবে, তাই আগামী পনের বছর আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় রাখতে হবে– তবে আমরাও বুঝতে চাই সেটি তারা আমাদের বাড়িঘর পুড়িয়েই করতে চান কিনা!"

ঙ. মালোপাড়ার বাংলাদেশ

যশোরের অভয়নগরের মালোপাড়ার সকলেই জেলে সম্প্রদায়ের মানুষ। পুরো পাড়ায় নাকি চাকরি করেন মাত্র দু'জন, একজন বিমান বাহিনিতে ছোটখাট একটা পদে, অন্যজন একটা স্থানীয় বিদ্যালয়ে। বিদ্যুৎ নেই, পাশের 'মুসলমান পাড়া' থেকে লাইন টেনে আলো জ্বালান। অবিশ্বাস্য হারে তাদের বিল দিতে হয় মূল গ্রাহককে : পাঁচটি বাতির জন্য ১৮শ' থেকে ২২ শ' টাকা। নিকটতম পাঠশালা তিন কিলোমিটার দূরে। ছোট্ট মালোপাড়াকে এক লহমায় বোঝার জন্য আর খুব বেশি লাগে না, এই মূহুর্তে যে মালোপাড়া আগুনে পোড়া, লুটপাটের শিকার হওয়া এক বিধ্বস্ত আতঙ্কিত জনপদ।

নির্বাচনের দিন সেখানে হামলা একবার না, তিন তিন দফায় ঘটে। প্রথম দু'বার তারা প্রতিহত করেছিলেন দুর্বৃত্তচক্রকে। একইসাথে বারংবার আবেদন জানিয়েছেন প্রশাসনের কাছে, তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার জন্য। কর্ণপাত করা হয়নি। এলাকাবাসী বরং অভিযোগ করেছেন ফায়ারব্রিগেড আর নিরাপত্তা বাহিনির একাধিক গাড়ি তাদের গ্রামের কাছাকাছি এসেও থেমে গিয়েছে, ফিরে গিয়েছে। বৈদ্যুতিক আলোর উৎসটির মালিক সাম্প্রদায়িক সহমর্মিতার বশেই নাকি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন রাতেরবেলা শেষবারের হামলার সময়। ফলে প্রতিবার শত্রু আরও বেশি শক্তি সঞ্চয় করে ফিরে আসায় অন্ধকার সেই রাতে তারা তৃতীয় বারের মত মোকাবিলার ঝুঁকি নেননি।

কেটে ফালা ফালা করে হয়েছে চাঁপাতলার টিনের চাল ও বেড়া। দরজা ভেঙে তছনছ করা হয়েছে আসবাব, সিন্দুক ভেঙে লুট করা হযেছে টাকা পয়সা আর অলঙ্কার। বিশেষ ক্ষোভ ছিল মাছ ধরার জালগুলোর ওপর। ছাই বানিয়ে দেয়া হয়েছে বইপত্র। নবম শ্রেণি পড়ুয়া এক শিক্ষার্থীর পোড়া বইপত্রের মাঝে দেখলাম *শ্রী কৃষ্ণ : তিনি কে ছিলেন, কি তাঁর উপদেশ* নামের একটা সম্পূর্ণ অক্ষত বই।

জামায়াতের ক্যাডাররা যে এই হামলায় প্রধান ভূমিকা রেখেছে, সেটা নিয়ে এলাকাবাসী সংশয় নেই কোন। কিন্তু শত শত মানুষ আকাশ থেকে এই হামলা চালাতে পারে না, তাদের সংগঠিত হতে হয়েছে, দলবদ্ধভাবে চাঁপাতলার মালোপাড়ায় আসতে হয়েছে। তাদের হাতে ছিল দা, বোমা আর রেললাইনের পাথর ভর্তি সিমেন্টের ব্যাগ-- এগুলো তারা ছুঁড়ে মেরে আহত করেছে নদীপথে পলায়নপর মানুষজনকে। কিন্তু প্রশাসন কেন নীরব ছিল? কেন তারা আক্রান্ত মানুষজনকে সাহায্য করতে যায়নি? ভোটকেন্দ্র রক্ষা করছিলেন তাঁরা! গণতন্ত্র রক্ষা করছিলেন তাঁরা! প্রশ্নের এই উত্তর। সাম্প্রদায়িক হামলাকে পুঁজি করে রাজনীতির ফায়দা হাসিল করা চলছে ষোল আনা, কিন্তু আক্রান্ত মানুষগুলোকে রক্ষা করতে তৎপরতা দেখাবার একটা মাত্র নিদর্শনও নেই। এলাকাবাসী কারও নাম প্রকাশে আগ্রহী না, যদিও অনেকেই তাদের 'মুখচেনা'।

এই আতঙ্কের কারণ সহজেই অনুমেয়। জামাত হোক, বিএনপি হোক, আওয়ামী লীগেরই কেউ হোক, মালোপাড়ার মানুষেরা তাদের হিংস্র প্রতিবেশীকে চটাতে চান না। ফলে প্রতিবারই আরও কিছু মানুষ ভিটেমাটি ছাড়া হন, কেউ কেউ হয়তো গঞ্জনাময় এই মাতৃভূমির মায়াই ত্যাগ করেন। বাকিরা বাধ্য হন সাংস্কৃতিক একটা অভিযোজনে, নিত্য অপমান-নিরাপত্তাহীনতা আর অধিকারহীনতায় টিকে থাকার কায়দা রপ্ত করে ফেলেন।

সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির একটা পাটাতন শক্তিশালীভাবে

কায়েম আছে বলেই সরকার হোক, বিরোধী দল হোক, প্রতিবেশী হোক, ভূমিদস্যু হোক, প্রশাসন হোক—সকলেই ধর্মীয় পরিচয়কে এত সহজে ব্যবহার করার সুযোগটি নিতে পারে। মানুষকে সাম্প্রদায়িকতার কলুষ থেকে মুক্ত করার চেষ্টাটা জরুরি, কিন্তু সেই সাংস্কৃতিক পরিবর্তনটা না ঘটে যাবার আগে কি আমাদের কিছু করার নেই? একটা দাবি এই মূহুর্তে তাই হওয়া উচিত সাম্প্রদায়িকতাকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে আইন প্রণয়ন, যেখানে সাধারণ অপরাধ থেকে সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হামলা, সংস্কৃতি, আচরণকে চিহ্নিত করা যাবে। প্রয়োজন একটি স্থায়ী সংস্থার যারা সাম্প্রদায়িক বৈষম্য এবং বিষবাষ্প নিরসনে কাজ করবে, সাম্প্রদায়িক আইনকানুনকে চিহ্নিত করা থেকে শুরু করে প্রাতিষ্ঠানিক আর সব ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করা। প্রয়োজন যে কোন সাম্প্রদায়িক ঘটনা রোধে ব্যর্থতার দায়ে প্রশাসনকি কর্মকর্তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা, আরও প্রয়োজন এ যাবত ঘটে যাওয়া সকল সাম্প্রদায়িক হামলার তদন্ত ও বিচার। সেটা করা সম্ভব হলে ভবিষ্যতে হামলাকারীরা যেমন সাহস হারাবে, তেমনি প্রশাসনও তৎপর থাকবে আক্রান্ত মানুষকে রক্ষায়। ক্ষমতার স্বার্থে উচ্চস্তর থেকে ঘটানো হামলা হোক আর স্থানীয় পর্যায়ের সাম্প্রদায়িক দুরভিসন্ধি হোক, কোনও ক্ষেত্রেই জনগণের দুর্বলতর অংশকে রায় রাষ্ট্রের কোনও ভূমিকা দৃশ্যমান হয় না। আমাদের সমাজে আপাতঅসংঘবদ্ধ অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তি ও সংগঠনসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করা, মাঠের লড়াইয়ে নামাই রাষ্ট্রকে সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত হতে বাধ্য করার পথ। সে রকমের একটি সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াস এই মূহুর্তের দাবি, যারা যে কোনও সাম্প্রদায়িক হামলার সময়ে অনতিবিলম্বে ঘটনাস্থলে হাজির হবে, প্রতিহত করবে, ঘটনার তদন্ত করবে, জনগণের সামনে তার পর্যালোচনা হাজির করবে; এমন একটি সঙ্ঘ যার অস্তিত্ব ও কর্মকাণ্ডই যেমন একাধারে রাষ্ট্রকে দায়বদ্ধ হতে বাধ্য করবে, জনগণের অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল চেতনাকেও শক্তিশালী করবে, যূথবদ্ধ করবে। রাষ্ট্রের কাছ থেকে কার্যকর কিছু তখনই আশা করা যায় যখন বিচার আদায়ের মতো শক্তিও ফরিয়াদী অর্জন করে।

হুমায়ুনপুর

স্বাতী মৈত্র

আপনি কখনো হুমায়ুনপুর গেছেন?

হৌজ খাস ডিয়ার পার্কের পাশ দিয়ে সোজা সফদরজং এনক্লেভের এনসিসি গেটের দিকে চলে যান, তারপর বাঁ দিক নিলেই একটা সরু গলি। ভাঙ্গাচোরা রাস্তা, একটা বিশাল ময়লার ভ্যাট, অনেক সবুজ-হলুদ অটো, একজন নাপিত, একটা ছোট্ট ডিডিএ-র পার্ক। আশেপাশে সফদরজং এনক্লেভের একেকটা আলীশান বাংলো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এইগুলো পার করে সোজা গিয়ে যেখানে ধাক্কা খাবেন, সেটাই হচ্ছে হুমায়ুনপুর ভিলেজ, রাজধানী দিল্লীর অন্তর্গত বহু জাট গ্রামগুলোর একটা।

হুমায়ুনপুরের ইতিহাস নিয়ে অনেক গল্প আছে। শোনা যায় ১৬৭৫ সালে রূপা রাম আর রতিয়া সিং টোকাস এই গ্রাম স্থাপন করেন। আরও একটি কাহিনি বলে ১৬৭৫ নয়, ১৬৮৩ সালে চৌধুরী দেবী সিং ফোগাট এই গ্রামের পত্তন করেন। আরেকটা গল্প আছে, সে তো আরও রোমাঞ্চকর — বাদশা ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে জাট বিদ্রোহের নায়ক গোকুলা জাট স্বয়ং নাকি এই গ্রামের পত্তন করেন! তবে এ নেহাতই কিম্বদন্তী, লড়াকু জাট নেতা গোকুলা দিল্লীতে তাঁর জীবদ্দশায় কোনোদিন পা রাখেননি। ইতিহাস বলছে যে শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ার পরে আগ্রাতেই বাদশা ঔরঙ্গজেবের আদেশে তাঁকে হত্যা করা হয়। মূল ধারার ইতিহাসের বইয়ের পাতায় দিল্লী শহরের অলিগলির এ হেন লোকশ্রুতি-মিশ্রিত ইতিহাস কমই উঠে আসে।

হুমায়ুনপুরের জমির মালিক আজও কিছু জাট পরিবার। নগরায়নের কবলে পড়ে এক এক করে তাঁদের জমি চলে গেছে সফদরজং এনক্লেভের দখলে — বড় বড় অট্টালিকা উঠেছে, দক্ষিণ দিল্লীর অভিজাত মানুষজনের ঠাঁই হয়েছে সেখানে। পাশে গড়ে উঠেছে আরকে খান্না টেনিস স্টেডিয়াম, হৌজ খাস ডিসট্রিক্ট পার্ক, হৌজ খাস ডিয়ার পার্ক, অভিজাত দিল্লীবাসী সেখানে হাওয়া খেতে আর শরীরচর্চা করতে আসেন। কখনো কখনো ইতিহাসপ্রেমী কেউ হয়তো চলে আসেন হুমায়ুনপুরের পুরাতন ঐতিহ্যের টানেও, হৌজ খাসে ঘুরতে ঘুরতে ডিয়ার পার্কের ভিতরে কালি গুমটি বা বাগ-এ-আলম গুম্বদটাও দেখে যান। এইসবের মাঝে হুমায়ুনপুর গ্রামের এঁদো গলি বড় বেমানান, যেন অন্য একটা জগৎ। সন্ধ্যাবেলা গেলে এখনো দেখতে পাবেন খাটিয়ায় বসে হুঁকো টানছেন বিশাল পাগড়ি পরা একেকজন প্রৌঢ় চৌধুরী।

এ ছাড়াও হুমায়ুনপুরের একটা অন্য পরিচয় আছে, বিশেষ করে আমার কাছে : অভিজাত, কসমোপলিটান দক্ষিণ দিল্লীর বুকে এক টুকরো উত্তর পূর্ব, এই আমার হুমায়ুনপুর।

সত্যি বলতে কী, উত্তর পূর্বের জগতের সাথে আমার সত্যিকারের আলাপ হয় নেহাতই বাঙালিসুলভ উপায়ে, অর্থাৎ কিনা পেটপুজোর মাধ্যমে।

হস্টেলে থেকেছি দীর্ঘ নয় বছর, দেশ-বিদেশের অসংখ্য মানুষজনের সাথে। মাঝে মাঝে একটা অদ্ভুত গন্ধে সারা হস্টেল ম-ম করতো, বুঝতে পারতাম না কী বস্তু — শুধু দেখতাম কেউ কেউ মুখ বেঁকিয়ে ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে দিত। তারপরে একদিন পরিষ্কার হল, জানতে পারলাম সেটা আসলে ব্যাম্বু শুটের গন্ধ, উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলোয় অতি জনপ্রিয় খাদ্য বস্তু। তারও অনেক পরে ব্যাম্বু শুট রাঁধতে শিখলাম, রান্না করার পর সারাদিন বাড়িতে-হাতে গন্ধ লেগে থাকবে, এই ব্যাপারটা উপভোগ করতে শিখলাম — কিন্তু সে আমার হুমায়ুনপুর-উত্তর জীবন, সে কথায় পরে আসছি।

পাঠক হস্টেলে কখনো থেকে থাকলে সহজেই বুঝতে পারবেন যে পেটপুজো ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তা সহজে হয়ে ওঠেনা। অতএব পাশের ঘরের মেচনি — নাগাল্যান্ডের মেয়ে — যখন ভালোবেসে শুয়োরের মাংসের আচার খাওয়ায়, তাতে না বলি কেমন করে? টক-টক ঝাল-ঝাল, তার সাথে মাংসের ছোট ছোট টুকরোর অসামান্য মিশ্রণ, বিশ্বাস করুন তার সাথে হস্টেলের ট্যালট্যালে অড়হর ডালও অমৃতসমান।

অথবা বন্ধু দীপ —বাড়ি আসামে —যদি বলে, চল তোদের স্মোকড শুয়োর রান্না করে খাওয়াই, তাতেই বা কেমন করে আপত্তি করা যায়? দৃশ্যটা কল্পনা করে নিন : প্রাগৈতিহাসিক কয়েল হিটারে চড়ানো প্রেশার কুকার ও দেড় কিলো শুয়োর,

তার সাথে নানান সবজি এবং লঙ্কা, অনেক অনেক লঙ্কা। প্রথমে শুকনো লঙ্কা, তারপরে সবুজ কাঁচা লঙ্কা, আর তারও পর, সবার শেষে, আমার ক্রমাগত শুকিয়ে যেতে থাকা মুখ দেখে একটাই ভূত জোলকিয়া, যার আরেক নাম নাগা মিরচি বা রাজা মিরচি।

তারপরের দৃশ্য? নাক-চোখ-মুখ সব দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে, তাও হাভাতের মতন খেয়েই চলেছি, আর পাশ থেকে রাঁধুনি রান্নায় "ঝালের লেয়ার" সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা করছে সুবীরের সাথে।

তারপর ধরুন এরম্বা। বাবা বলে এক মণিপুরী ছেলে — তার আসল নাম কে জানে কী, সবাই তাকে বাবা বলেই ডাকতো — পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে গাঁজায় দম দিতে দিতে এমন এরম্বা বানাত মাঝে মাঝে যে আমাদের সেরকম আলাপ না থাকা সত্ত্বেও আরেক বন্ধুর ঘরে বসে দিব্য সোনামুখ করে খেয়ে নিতাম। কখনো তাতে শুধুই শুঁটকি আর আলু সেদ্ধ, কখনো শুঁটকি, ব্যাম্বু শুট, এবং আলু সেদ্ধ। সব সময়েই সেটা ঝাল, ভীষণ ঝাল। সব সময়েই সেটা অসম্ভব উপাদেয়, কবে যে ভূত জোলকিয়ার ঝাল খাওয়ার অভ্যাস হয়ে গেছে নিজেও বুঝতে পারিনি।

অথবা সোনালির রান্না করা শুঁটকি (ত্রিপুরায় মানুষ), তাতেই বা না বলি কেমন করে? হস্টেলে, তারপর মুনিরকা ভিলেজের ছোট্ট একটা ঘরে বসে বহুদিন পরম উপাদেয় রান্না খেয়েছি, তার সাথে উত্তর পূর্বের শুঁটকির সাথে দক্ষিণ ভারতের শুঁটকির ফারাক জেনেছি, জেনেছি কেমন করে আগরতলার রাস্তায় বাঁশের ভিতরে পুরে ভাত রান্না হয়, আর সাথে শুয়োর । কেভির মায়ের পাঠানো স্মোকড শুয়োর (রান্নার উনুনের ধোঁয়ায় তৈরি, বাড়িতেই) খেতে খেতে নাগা উপজাতি আইন ও তার সমস্যা নিয়ে অবহিত হয়েছি, কেভি আর কৌস্তুভের বিয়ে নিয়ে চার্চ আপত্তি করায় তাদের সাথে সাথে আমিও ক্ষুব্ধ, বিরক্ত হয়েছি।

এরকমভাবেই কেমন করে যেন প্রবাসী জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে জড়িয়ে গেছে উত্তর পূর্ব ও তার অসংখ্য মানুষ। শিক্ষা ও কর্মের দায়ে ঘর ছেড়ে বহু দূরে রুখাশুখা রাজধানী শহরটায় কোনভাবে নিজেদের জায়গা নিয়েছি আমরা সকলেই।

কলকাতায় কলেজে পড়ার সময় ক্লাসে প্রেরণা, পূজাদের 'চিঙ্কি' বলা হত — আর সবার মতন আমিও বলতাম। ওদের বাড়ি কোথায় কখনো জিজ্ঞেস করা হয়নি, শেরপা বা রোকা যে আমারই মতন পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা হতে পারে, এটা জানারও চেষ্টা করিনি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই বিশাল সবুজ ক্যাম্পাস আর লাল বাড়িগুলোয় ঢোকার পর এ হেন মূর্খামি আর করিনি কখনো, কিন্তু শিক্ষা অনেক বাকি ছিল তখনো। সেই ২০০৭ সালে দিল্লী পুলিশ যখন উত্তর পূর্বের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ বুকলেটে উপদেশ হিসেবে ছোট জামা পরতে আর দুর্গন্ধযুক্ত খাবার-দাবার রান্না করতে বারণ করলো, আমি বিরক্ত হয়েছিলাম মনে আছে। অল্প বয়স তখন, মরাল জেঠুগিরিটা ভালো লাগেনি। আর পাঁচটা ছাত্র সংগঠনের মতন যখন উত্তর পূর্বের সংগঠনগুলো প্যাম্ফলেট বার করতো, শুকনো রুটি আর আলু-করেলার বিস্বাদ তরকারি চিবোতে চিবোতে সেগুলোও মন দিয়ে পড়তাম। তবে কিনা যেখানে জীবনের অঙ্গ অ্যাডভেন্ট ক্রিসমাসের গান আর চন্দ্রালোকে থাবাল চংবার নাচ, যেখানে তামিল শিক্ষক ইস্টারিন কিরের ভক্ত, যেখানে সুবীরের ডুমডুমায় বড় হয়ে ওঠার গল্প শুনে কেটে গেছে অনেক সন্ধ্যা, যেখানে মৌসুমির রুমমেট মাপুই আর প্রিয়াঙ্কার রুমমেট মেচনি, যেখানে কনফ্লুএন্সে সবার সাথে গুঁতোগুঁতি করে খাবারের লাইনে দাঁড়িয়ে মনোজের কাছ থেকে একটু বেশি মাংস আদায় করে নেওয়াটাই আনন্দ, সেখানে খুব বেশি ভাবার অবকাশ হয়নি।

২০১২ সালে ব্যাঙ্গালোরে গুজব ছড়িয়ে রাজ্যছাড়া করা হল প্রায় হাজার ছয়েক উত্তর পূর্বের বাসিন্দাকে, ততদিনে অনেকটাই বয়স বেড়েছে। খবরের কাগজের পাতায় যে মাঝে মাঝেই উত্তর পূর্বের কারো না কারো ধর্ষিত, আহত, নিপীড়িত হওয়ার ঘটনা উঠে আসে, এটুকু খবর রাখি তখন। কিন্তু আমাকে — আমাদেরকে — ধাক্কা দিয়ে গেলো নিডো টানিয়া। ১৯ বছরের যুবক, অরুণাচলের নিডো টানিয়া! ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাস। লাজপত নগরের বহু পরিচিত রাস্তায় এক বচসার সূত্রে পিটিয়ে মেরেই ফেলা হল তাকে, নাকি তার চুলের ছাঁট নিয়ে বচসার সূত্রপাত! এই বয়সের অনেকগুলো ছেলেমেয়েকে আমি পড়াই সেই সময়, ওর মতই কেতামারা চুলের ছাঁট আর 'চিঙ্কি' চেহারা তাদের অনেকের — হিন্দি তেমন বোঝেনা বলে পাশের ক্লাসে হিন্দি ইংরেজি মিশিয়ে পড়াতে হয়, আর সব কটা ছেলে-মেয়ের মতন তাদেরও নানা

রকম আশা আকাঙ্ক্ষা।

হয়তো নিডো টানিয়ার বাবা অরুণাচল প্রদেশের এমএলএ ছিলেন বলেই সরকার বাহাদুর তড়িঘড়ি মাঠে নামলেন, বেজবরুয়া কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হল উত্তর পূর্বের প্রবাসী বাসিন্দাদের নানান সমস্যা বিচার করে তার কিছু সমাধান সূত্র বার করবার। ২০১৪র জুলাই মাসে এমপি বেজবরুয়া তাঁর ৮২ পাতার রিপোর্ট জমা করলেন, সাথে এক গুচ্ছ রেকমেন্ডেশন।

সমস্যা কত রকমের? সমস্যা অসংখ্য, বলছেন বেজবরুয়া কমিটি। প্রথমত, উত্তর পূর্বের অধিকাংশ মানুষের চেহারা (আসাম ও ত্রিপুরার কিছু মানুষকে বাদ দিলে) মঙ্গলয়েড। তাঁদের মধ্যে অসংখ্য ভাষা ও জনজাতি থাকা সত্ত্বেও তার কোনো স্বীকৃতি তো নেই-ই, উল্টে তাঁদেরকে 'উত্তর পূর্ব' বলে একটা হোমোজিনাস শ্রেণিতে ফেলে দেওয়া হয়।

দ্বিতীয়ত, উত্তর পূর্বে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অর্থনৈতিক দৈন্যর কারণে চাকরির সুযোগ সীমিত, সীমিত নামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাও। তাই বছর বছর অগণিত মানুষ শিক্ষা ও চাকরির সন্ধানে ভারতবর্ষের বাকি অংশে, বিশেষত মেট্রো শহরগুলোয়, ছড়িয়ে পড়েন। তাঁদের সব থেকে পছন্দের গন্তব্যস্থল রাজধানী দিল্লী। তথ্য বলছে যে ২০০৫ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে উত্তর পূর্ব থেকে চার লক্ষেরও উপর মানুষ দিল্লী আসেন নানান কারণে। এর মধ্যে প্রতি বছর প্রায় দশ হাজার ছাত্রছাত্রীই থাকে।

এই বহুভাষী, বহু জাতির মানুষদের হিন্দি ভাষার জ্ঞান ও বাকি ভারতবর্ষের সাথে পরিচয় সীমিত, অর্থনৈতিক অবস্থাও যে বেশির ভাগের খুব ভালো, তা নয়। তাঁরা নানা 'ওরিয়েন্টাল' রেস্তোরাঁয় ওয়েটারের কাজ করে, বিউটি পার্লারের কর্মী হয়ে, রাস্তার ধারে মোমোর স্টল দিয়ে বা খুব বেশি হলে বিপিওতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁদের স্থান হয় এমন সব পাড়ায় যেখানে ঘরভাড়া অপেক্ষাকৃত ভাবে সস্তা, এবং বাড়িওয়ালা ঘোরতর আমিষ-বিরোধী নন — ভিলেজ অঞ্চলগুলোয় বিশেষ করে। যেমন মুনিরকা, যেমন খিড়কি, যেমন কিষেণগড় বা হুমায়ুনপুর।

অপরিচিতি, যোগাযোগ ও কথোপকথনের অভাব, এই সব মিলিয়ে স্থানীয় মানুষজনের সাথে একের পর এক ভুল বোঝাবুঝি হতে থাকে। কখনো বা আপত্তি ওঠে রাতে দেরি করে বাড়ি ফেরা নিয়ে, কখনো বা কথা ওঠে মেয়েদের খোলামেলা পোশাক, গান বাজনা নিয়ে, কখনো অভিযোগ ওঠে নেশা করার। কখনো আবার শুধুই রান্নার গন্ধ নিয়ে আপত্তি জানানো হয়। শুধু কী তাই? এর সাথে আছে ঘর ভাড়ার সমস্যা — ভিলেজ অঞ্চলে ঘর ভাড়া অনেক সময়েই হয় লীজ বা কনট্র্যাক্ট ছাড়া। ভাড়া দিতে হয় নগদে, আর বাড়ির মালিক আপনাকে দু দিনের নোটিশে বাড়ি ছেড়ে দিতে বলতেই পারেন, আপনার কিচ্ছুটি বলার নেই। পুলিশও আপনার জন্য কুটোটি নাড়বেনা, উল্টে আবার কিছু উপদেশ দিয়ে ছেড়ে দিতে পারে। কর্মস্থলে ও দৈনন্দিন জীবনে জাতিভিত্তিক হেনস্থা তাঁদের নিত্যসঙ্গী, লাঞ্ছনা ও ভয় তাঁদের রোজকার অভ্যাস। এরকম ভাবেই তাঁদের অভিবাসী জীবন কাটে, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, শুধু মাঝে মাঝে কয়েকটা নিডো টানিয়া হারিয়ে যায়।

এই সকল সমস্যার সমাধান সূত্র হিসেবে বেজবরুয়া কমিটি অনেকগুলো রেকমেন্ডেশন প্রস্তুত করেছেন। তার মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সম্ভবত জাতিগত বৈষম্য-বিরোধী আইন নিয়ে আসার দাবি, যা উত্তর পূর্বের আরও অনেক সংগঠন বহুদিন ধরে করে এসেছে। কমিটির ভাষাতেই বলা যাক : "আমরা মনে করি যে আমাদের সাংবিধানিক পরিকাঠামোর মধ্যে একটি বর্ণ/জাতিগত বৈষম্য-বিরোধী আইনের তাত্ত্বিক, কৌশলগত, ও আইনি দিকগুলো বিবেচনা করে আলোচনা করা উচিত, এবং ভবিষ্যতে এই নিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন।"

পুলিশি অকর্মণ্যতার বিরুদ্ধেও সরব বেজবরুয়া কমিটি। যতদিন এই বৈষম্য-বিরোধী আইন নিয়ে আলোচনা চলে, ততদিন উত্তর পূর্বের অভিবাসীরা যেন আইনের সুরক্ষা ও ন্যায়বিচার পান, এই প্রসঙ্গে রিপোর্টে অনেক রকম বক্তব্য আছে। স্থানীয় মানুষের সাথে অভিবাসীদের যাতে যোগাযোগ বাড়ে, সেই নিয়েও আছে অনেক সমাধান সূত্র।

অবশ্য বেজবরুয়া কমিটির রিপোর্ট যতদিনে জমা পরে, ততদিনে নয়া দিল্লীর মসনদে পালাবদল হয়ে গেছে। শাসক দলের আগ্রাসী "লুক নর্থ ইস্ট" পলিসি সত্ত্বেও বেজবরুয়া কমিটির রিপোর্ট, আরও অনেক বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্টের মতন, রাইসিনা হিলের কোনো ক্যাবিনেটে তালাচাবি বন্ধ হয়ে পরে আছে, ফাইলে ধুলো জমছে।

২০১৪ থেকে ২০১৭র মধ্যে দিল্লী শহরে উত্তর পূর্বের মানুষদের বিরুদ্ধে অপরাধের দায়ে ৭০৪টি কেস রেজিস্টার করা হয়। সেই তিন বছরে হুমায়ুনপুর অনেক বদলেছে ঠিকই, অনেক দোকানপাট উঠে গিয়ে নতুন দোকান খুলেছে, অনেক জাট চৌধুরীর বাড়ি আরও বড় হয়েছে, তাও হুমায়ুনপুর আছে হুমায়ুনপুরেই।

প্রথমবার হুমায়ুনপুর পৌঁছেছিলাম আচারের সন্ধানে।

যে সে আচার নয় কিন্তু, ব্যাম্বু শুট আর ভূত জোলকিয়ার সংমিশ্রণে তৈরি সেই আচার। পাঠককে আগেই বলেছি, হস্টেলে থেকেছি দীর্ঘ নয় বছর। ট্যালট্যালে অড়হর ডাল/কালি ডাল, শুকনো রুটি আর আলু-করেলা/আলু-টিন্ডার বিস্বাদ তরকারি যিনি টানা কয়েক বছর অন্তত না খেয়েছেন, ব্যাম্বু শুট আর ভূত জোলকিয়ার আচারের মাহাত্ম্য হয়তো তাঁকে বলে বোঝানো সম্ভব না।

হৌজ খাস ডিয়ার পার্কের পাশ দিয়ে সোজা সফদরজং এনক্লেভের এনসিসি গেট, সেখান থেকে বাঁ দিক নিলেই একটা সরু গলি। ভাঙ্গাচোরা রাস্তা, একটা বিশাল ময়লার ভ্যাট, অনেক সবুজ-হলুদ অটো, একজন নাপিত, একটা ছোট্ট ডিডিএ-র পার্ক, এই সব কিছু পার করে হুমায়ুনপুরের এঁদো গলি। সেই গলি ধরে চলে গেলে — গাড়ি নিয়ে না ঢোকাই বাঞ্ছনীয়, যদিও জাট সুপুত্ররা যে সেখানে তাদের ইনোভা নিয়ে যায়না তা নয় — এক সময় বাঁ হাতে পড়বে আশার দোকান : আশা টাংখুল স্টোর।

দোকান নয় তো সে, যেন খাদ্য বা রান্নাপ্রেমী মানুষের জন্য তৈরি একটা ছোটখাটো স্বর্গ। ব্যাম্বু শুট পেয়ে যাবেন, ফারমেন্টেড এবং ফ্রেশ, যেরকমটি চাই। শুঁটকি পাবেন অনেক রকমের, কোন মাছ চাই? এর সাথে বাস্কেট ভর্তি আখুনি (ফারমেন্টেড সয়াবিন), আনিশি (ফারমেন্টেড কচু পাতা এক রকমের), এবং অবশ্যই লাল রঙের রাজা মিরচি, শুকনো, ফ্রেশ, দুটোই। বাড়িতে তৈরি ব্লাড সসেজ? সেটাও আছে, তার সাথে সারি সারি আচারের কৌটো, ইলিশ থেকে গো মাংস (বাফ বলে চালানো হয়), সবই পাবেন। তামুল চাই? নাগা আর অহমীয়াদের বড় প্রিয় এই পান সুপুরি, একদম সামনেই, ক্যাশ কাউন্টারের উপরে, রাখা থাকে। সন্ধ্যাবেলায় গেলে ডেকচি ভর্তি রান্না করা খাবারও পাবেন — উটি (এক রকমের সেদ্ধ ডাল), শুয়োর, বাফ, নাড়িভূরির এক সুস্বাদু ভাজা, কপাল ভালো থাকলে গেঁড়িগুগলির ঝোলও পেয়ে যেতে পারেন। ভারতবর্ষ আর বর্মার বর্ডারের কাছে আশার বাড়ি, টাংখুল উপজাতির বেশির ভাগ মানুষের বাড়িই সেখানে। মাঝে মাঝেই দোকান বন্ধ করে সে দেশে চলে যায়, ফিরে আসে নতুন জিনিসপত্রের সাপ্লাই নিয়ে।

উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটতে থাকুন, এক কোণায় পাবেন ব্যাংকক থেকে সস্তায় আমদানি করা জামা কাপড় আর জুতোর দোকান। আরেক কোণায় হয়তো পেয়ে গেলেন মিজো মহিলার ছোট্ট দোকান, পেট ভরে সোচিয়ার — সেদ্ধ ভাতের সাথে শুঁটকি মাছ ভাজার এক অদ্ভুত মিশ্রণ, ভারতের উত্তর পূর্ব এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশের প্রিয় খাদ্য — খেয়ে আসলেন তাঁর দোকানে, আইজলের রাস্তাঘাট নিয়ে একটু গল্পও হয়ে গেল। নেপালি থালি চাই? এই তো পাশের দোকানেই পেয়ে যাবেন, খোঁজ করলে জানবেন মালিকের বাড়ি কালিম্পং-এ। তার পাশের দোকানে আবার নানা রকম গান বাজনার সরঞ্জাম পেয়ে যাবেন। মণিপুরের রান্না চাই? তাড়াতাড়ি ইট ফ্যাম নামক রেস্তোরাঁটায় ঢুকে পড়ুন, রাত দশটার সময় বন্ধ হয়ে যায়। ভুটানের বিখ্যাত রান্না, এমা ডাশি খাওয়ার শখ হয়েছে? সেটাও পেয়ে যাবেন, ফ্রীডম কর্নারে চলে যান। এরই মাঝে কিছু তিব্বতের মানুষও কেমন করে যেন এসে পড়েছেন, ঝাল ঝাল লাফিং আর গরম মোমো পেয়ে যাবেন অনেকগুলো দোকানে, কোন মাংসের মোমো খাওয়া পছন্দ করবেন? এ ছাড়াও নাগা রান্না হুমায়ুনপুরের অলিতে গলিতে, অধুনা জোমাটো-খ্যাত হর্নবিল থেকে শুরু করে এই কদিন আগে খোলা ডাউন আন্ডার বা বেলি গিগলস, কোনো একটায় ঢুকে পড়লেই হল। ঝাল কেমন খাবেন বলে দিতে হবে, তারপর কেল্লা ফতে। আরও একটু হাঁটলে, কয়েকটা একেবারে উত্তর ভারতীয় মুদীর দোকানের পাশে, পেয়ে যাবেন কোরিজ — কোরিয়ান রেস্তোরাঁ! সস্তায় মন ভালো করা কিমবাপ বা রকমারি ডোসিরাক (কোরিয়ান থালি) খেয়ে আসবেন, সাথে ওদের বানানো অনবদ্য কফি।

আশার মতন বহু উদ্যমী মানুষ এসে পড়েছেন হুমায়ুনপুরের এই গলিঘুঁজিতে, জাট বাড়িওয়ালাদের সাথে কেমন করে যেন মানিয়েও নিয়েছেন। হুমায়ুনপুরের রাস্তায় তাই একটু হাঁটলেই আপনার কানে আসবে পাঁচ রকমের ভাষা, উত্তর পূর্বের একেকটা কোণা থেকে আসা নানান জাতি-

উপজাতির মানুষকে পেয়ে যাবেন এই স্বল্প পরিসরের মধ্যেই। ঝামেলা যে একেবারেই লাগে না তা নয় — এই তো কদিন আগে পুলিসের কাছে চিঠি গেলো হুমায়ুনপুর কল্যাণকারী সমিতির তরফ থেকে, অনেক রাত অবধি আওয়াজ ও গান-বাজনা নিয়ে। চিঠির ভাষা পড়ে আপনার এম পি বেজবরুয়া কমিটির রিপোর্ট মনে পরে যেতে বাধ্য, যেখানে বেজবরুয়া নিজেই লিখছেন যে বাড়ি থেকে দূরে থাকার কারণে অল্প বয়সী ছেলেমেয়েরা অনেক সময় জোরে জোরে রাত অবধি গান বাজনা করে, আড্ডা মারে, তাতে অন্য লোকজনের অসুবিধা হয়। ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়, তৈরি হয় সংঘাত। সেই সংঘাতের সমাধানসূত্র বেজবরুয়া কিছু ভেবে থাকলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। হুমায়ুনপুর স্বর্গ নয়, আধুনিক নাগরিক জীবনের কসমোপলিটান আদর্শ নয়, নেহাতই দিল্লী শহরের বুকে এক ছোট্ট অভিবাসী গ্রাম, ইংরেজিতে যাকে 'ঘেটো' বলা হয়।

আসবেন কখনো হুমায়ুনপুরে।

ঠিক সন্ধ্যা নামার মুখে, যখন রাজধানী দিল্লীর রুক্ষ ধোঁয়াশাময় রূপটা চাপা পরে যায় মায়াবী আলোয়, সেই সময়টা। চৌকে পৌঁছে মাতা রানীর মন্দিরটা বাঁ হাতে রেখে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যাবেন, পাশেই সবজিওয়ালা রকমারি সবজি নিয়ে বসেছে। চৌধুরী সাহেব বাড়ির সামনের সরু রাস্তাটাতেই চেয়ার পাতছেন, হুঁকোর আগুন গরম হচ্ছে। একটু পরেই আড্ডা বসবে। আশা ও তার বাড়ির বাকি মেয়েরা তখন ভীষণ ব্যস্ত, সব রান্না শেষ করে ফেলতে হবে সময় মতন, সিংজু বানানোর জন্য সব সবজি কেটে ফেলতে হবে। ডাউন আন্ডারের মালিক ছেলেটি সারাদিন দৌড়াদৌড়ি করেছে ল্যান্ডলাইনের কানেকশন নেওয়ার চক্করে, বিএসএনএল বারবার ঘুরিয়ে মারছে। তার দুই রাঁধুনি সহকর্মী গিটার নিয়ে বসেছে, গান হবে। এখনো তেমন কাস্টমার আসেনা তো, সদ্য খুলেছে তাদের দোকান। তার পাশের বাড়িটায় তখনো মিস্তিরিদের কাজ চলছে, নতুন চার তলা উঠছে, সাথে বিশাল কাঁচের দেওয়াল। মুদী দোকানে ডেভিড সুপুরি কাটছে। এক কোণায় দেওয়ালে কে যেন গ্রাফিত্তি এঁকে গেছে, "ফাক আফস্পা"। দু একটা কুকুর দৌড়াদৌড়ি করছে। ঘোমটা দেওয়া জাট রমণী দুধের ক্যান হাতে বাড়ি ফিরছেন, তারই পাশে পশ্চিমা ফ্যাশনে ধোপদুরস্ত দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসিখুশি ছাত্রী, বাড়ি তার মিজোরাম, অস্থায়ী ঠিকানা হুমায়ুনপুর।

নেলীর তিরিশ বছরে

দেবর্ষি দাস

বহুদিন ধরে নেলীর সাথে বসবাস করছি। ঝাপসা মনে পড়ে আসাম ট্রিবিউনের প্রথম পাতায় ছাপা নেলীর সাদা কালো ছবি। তখনকার দিনের খবরের কাগজের ছবি যেরকম হত, কনট্রাস্ট বেশি, অস্পষ্ট। ছবির বিষয়বস্তু হল শীতের ধানখেতে সারি সারি লাশ।

সে ছিল ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩। গোটা রাজ্য তিন বছরের বেশি ধরে বিক্ষোভ, বনধ, হত্যা, কার্ফিউয়ের ঘুর্ণীতে লাট খেয়ে যাচ্ছে। ইন্দিরা গান্ধীর কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছে ফেব্রুয়ারিতে একসাথে বিধানসভা আর লোকসভা নির্বাচন করতে হবে। অসমিয়া জাতীয়তাবাদী সংগঠণ আসু (All Assam Students' Union), অসম গণসংগ্রাম পরিষদ (All Assam Gana Sangram Parishad) আসাম আন্দোলনে (১৯৭৯-১৯৮৫) নেতৃত্ব দিচ্ছিল, তারা ভোট বয়কটের ডাক দিল। কারণ ভোটার লিস্টে নাকি বহু অবৈধ বিদেশি নাগরিক রয়েছে। ইতিমধ্যে ১৯৮০ সালে একই বিবাদের ফলে আসামে লোকসভা নির্বাচন করানো যায় নি। ভারতের কোনো রাজ্যের পক্ষে এরকম প্রথম ঘটনা। ১৯৮৩-র ভোটকে অন্যান্য দলগুলো কিন্তু স্বাগত জানিয়েছিল, কিছু বাঙালি ও বোড়ো গোষ্ঠীও। ফেব্রুয়ারির আগেই রাজ্যজুড়ে সংঘাতের ঘটনা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। ফ্রেব্রুয়ারিতে পরিস্থিতি চরমে পৌঁছেছে।

আসামের ট্রিবিউনের কথায় খবরের কাগজের কথা মনে পড়ল। খবরের কাগজ পাওয়া তখন রীতিমত ঝকমারির ব্যাপার। চার-পাঁচ দিনের কাগজ হয়তো এক লপ্তে শহরে এলো। কার্ফিউ চলত যখন লোকজন বিকেলের কার্ফিউ রিল্যাক্সেশনের সময় বেরুত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্তর চাল, ডাল, ডিম, দুধ কিনতে। আর তখন কাগজ নিয়ে আসত। খবরের আর বিশেষ উৎস ছিল না, রেডিও সিগন্যাল ভয়ানক বিচ্ছিরি, টিভি বিরল। কার্ফিউ রিল্যাক্সেশনের জিনিসপত্তর কেনা নিতান্ত সহজ ছিল না। কার্ফিউ আর বনধ সাধারনত একসাথে হয়; যখন রাজনৈতিক দল বনধ ডাকে ঝামেলার আশঙ্কায় প্রশাসন কার্ফিউ ঘোষণা করে দেয়। বনধের দিনে যদি দোকান খোলা রাখেন দোকানের সুরক্ষার গ্যারান্টি কেউ দেবে না। আমাদের চৌমাথার বাজারের দোকানদাররা মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছিল। দোকানের পাট নামিয়ে ভেতরে নিঃশব্দে বসে থাকত, গ্রাহক পাশের ছোট্ট দরজাতে টোকা দিলে সন্তর্পনে মাল বেচাকেনা চলত।

এইসবের মধ্যে নেলী ঘটে গেল। নেলী গুয়াহাটির পূর্বদিকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি ছোট শহর। ফেব্রুয়ারির ১৮ তারিখে নেলীর কাছাকাছি ১৪টি গ্রামের বাঙালি মুসলমানদের পরিকল্পিতভাবে ঘিরে ফেলা হয়। তারপর হত্যা চলে। ঘটনার আগে উস্কানিমূলক গুজব শোনা গেছিল ওই অঞ্চলের উপজাতি শিশুদের মুসলমানরা তুলে নিয়ে মেরে ফেলেছে। আসল কারণ হয়তো অন্য। ১৪ তারিখে ভোট হয়েছিল। শোনা গিয়েছিল অঞ্চলের মুসলমানরা বড় সংখ্যায় ভোট দিয়েছে। এরকমও সন্দেহ করা হয় রাষ্ট্রীয় সয়ংসেবক সংঘের ক্যাডাররা আসুতে ঢুকে পড়েছিল, তাদের হাত থাকতে পারে। [1]

তবে অন্যান্য লোকজনের সাহায্য থাকা বিচিত্র নয়। ঘটনার তিনদিন আগে কাছের একটি থানা থেকে মেসেজ ওপরমহলে যায়, "one thousand Assamese villagers [are] getting ready to attack...with deadly weapons"। মেসেজটি উপেক্ষা করা হয়। মূলত, লালুং উপজাতির লোকেরা আক্রমণ চালায়, সাথে কিছু অসমিয়া ছিল। সরকারি হিসেবমতে মৃতের সংখ্যা ১৮১৯। অ-সরকারিমতে তিন হাজারের ওপর। হত্যার জন্য সাবেক হাতিয়ার তরোয়াল, বর্শা, দা, লাঠি, বন্দুক ব্যবহার করা হয়েছিল। মৃত ও আহতদের মধ্যে একটা বড় সংখ্যা শিশু আর মহিলাদের। যেন উদ্দেশ্য ছিল অবৈধ বিদেশি দের ভবিষ্যত প্রজন্ম নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে।

নেলীর জন্য আজ পর্যন্ত কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় নি, শাস্তি দূরস্থান। পুলিশ চার্জশীট বানিয়েছিল, পরে সেগুলো বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। ১৯৮৩ সালে তিওয়ারি কমিশন

1 http://twocircles.net/2009feb20/who_responsible_nellie_massacre.html

নিযুক্ত করা হয়। ১৯৮৪ সালে তার রিপোর্ট সরকারের কাছে দাখিল করা হয়। তাতে কী লেখা আছে পরের কোনো রাজ্য সরকার জানায়নি। গোপনীয়তার ঐতিহ্য আজ পর্যন্ত চলছে। ২০০৪ সালে এক জাপানী গবেষক গুয়াহাটির অমিয় কুমার দাস ইন্সটিটিউটে নেলীর ওপর পেপার পড়তে গেলে রাজ্য সরকার তাঁকে আটকে দেয়।

এই ছোট্ট বর্ণনার পর ১৯৮৩ ফেব্রুয়ারির আমাদের শহরে ফেরা যাক। নেলী ছাড়া অন্যান্য চাঞ্চল্যকর ঘটনা কানে আসছিল। এক রাতে এক পরিচিত কংগ্রেসি নেতাকে খুন করা হল। আরেক রাতে কলেজের ছাত্ররা শহরের বাইরের মুসলমান অঞ্চলে আক্রমণ চালাতে গেলে তাদের নেতা উলটে খুন হয়ে গেল। শহীদ বেদী, মূর্তি, স্মারক, দেওয়াল লিখনের সংখ্যা বাড়তে লাগল। ঘরবাড়ি দোকানপাটে আগুন দেওয়া চলল। সেই সময়ের একটি স্লোগান আমাদের ভারি প্রিয় হয়ে উঠেছিল, 'এই জুই জ্বলিছে, জ্বলিব জ্বলিছে। এই আগুন জ্বলছে, জ্বলবে জ্বলছে।' নামঘরের বাদ্যযন্ত্র সহকারে রাতে শহরের রাস্তা দিয়ে লম্বা মিছিলে বেরুত। বেশিরভাগ স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী, হাতে হাতে মশাল। আমাদের উত্তেজনায় আরো ইন্ধন যোগাতে বিএসএফের একটি পল্টন ইস্কুলে ক্যাম্প বানিয়ে বসে পড়ল। অনির্দিষ্টকালের জন্য ইস্কুল বন্ধ। দুঃখের বিষয়, বাবা-মা'রা সচরাচর এরকম রোমাঞ্চকর ঘটনাবলীর কদর বোঝেন না। বাড়িতে তালা মেরে আসাম ছেড়ে একটা লম্বা ভ্রমণে বেরিয়ে পড়তে হল। এরপর ৪০০০ মানুষের হত্যা হয়ে গেলে পরে রাজীব গান্ধী আন্দোলনের নেতাদের সাথে ১৯৮৫ সালে আসাম চুক্তিতে সই করবেন।

তো, নেলী আমাদের সাথেই আছে, অনেক দিন ধরে আছে। নেলী, মানে নেলী নামের অঞ্চলটি, আসামের আর পাঁচটা ছোট মফস্বলের মতই। ঘন সবুজ ধানখেত, দিগন্তে মেঘালয়ের কালো পাহাড় দেখা যাচ্ছে, দুএকটা জায়গায় সেগুনগাছ-ঝোপঝাড়, ব্যস্ত বাজার, দুর্গাপূজার মন্ডপ, আর জামাকাপড় থেকে বড়সড় মুসলমানদের জনসংখ্যা অনুমান করা গেল। ১৯৮৩-র দিনটিতে কী হয়েছিল তার কোনো স্মারকচিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেল না।

তবে এরকমই তো হওয়ার কথা ছিল। দিল্লী ১৯৮৪ বা গুজরাট ২০০২-হত্যাকান্ডকে রাষ্ট্র ন্যূনতম বিচারের মাধ্যমে জবাব দিয়েছে, তার কারণ তাদের প্রেতাত্মারা ফিরে ফিরে আসে। আর নেলী দেশের দূরের কথা, রাজ্যের রাজনীতিতেও এক বিস্মৃত অধ্যায়। গরিব, পাড়াগেঁয়ে মুসলমানরা মরেছে এরকম এক গণহত্যা কে মনে রাখে। দ্বিতীয়ত, যারা মরেছে মরেছিল অবৈধ বিদেশি দের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময়। ফলে তাদের সুবিচারের দাবি আরেকটু নড়বড়ে হয়ে যায় বইকি। দিল্লী বা গুজরাটের মৃতদের ঠিকঠাক ধর্ম ছিল না, কিন্তু তারা যে ভারতীয় নাগরিক, অনুপ্রবেশকারী নয় এই নিয়ে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ নেই। তৃতীয়ত, হত্যাকান্ড ঘটেছে এক প্রান্তিক প্রদেশে, ভারতীয় মূলভূমি থেকে অনেক দূরে। তাই আমাদের জাতীয় যৌথ বিস্মৃতি ঘণ হয়ে ওঠে। সংক্ষেপে, নেলীর কথা কেউ শোনে না। একটি হত্যাকান্ডের পরোক্ষ বৈধতার জন্য যখন আগের একটিকে খাড়া করা হয়, নেলীর নাম তখনো আসে না। কেননা নেলীর মধ্যে পরবর্তী কোনো হত্যাকান্ডকে বৈধতা দেওয়ার মূল্যটুকু নেই। দেশের যৌথ স্মৃতির কাছে নেলী ঘটেইনি।

কাউকে যদি নেলীর অশরীরীরা আজও জ্বালিয়ে থাকে তারা মনেহয় রাজ্যের বামমহল। নেলী তথা আসাম আন্দোলনের পরে রাজ্যে বামদলগুলো অবস্থা ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়েছে। একটি তথ্য দিলে ব্যাপারটা পরিস্কার হবে। ১৯৭৮ সালে বিধানসভা নির্বাচনে সিপিআই মোট ভোটের ৪.৩% পায়, ১২৬-র বিধানসভায় ৫টি আসন। সিপিএম পায় ৫.৬% ভোট, ১১টি আসন। বামদলগুলো ক্রমে শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। আসাম আন্দোলন শুরু হল ১৯৭৯ সালে। তারপর থেকে বামদলগুলোর ক্রমে শক্তিহানি হয়েছে। সাম্প্রতিকতম ২০১১-এর ভোটে সিপিআই ও সিপিএম পেয়েছে যথাক্রমে ০.৫২% ও ১.১৩% ভোট। যদি সাবেক বামদলগুলোর থেকে চোখ ফেরাই নতুন বাম দলগুলোর দিকে, তারাও দাঁত ফোটাতে পারছে না। শোনা যায় মাওবাদীরা উজানি আসামে বিশেষত চা উপজাতিদের মধ্যে সংগঠন তৈরি করছে। তবে এর মধ্যে কতটা সত্যতা আছে তা সন্দেহের। সম্প্রতি চারজন মাওবাদী ক্যাডারকে এনকাউন্টারে মারা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর মতে এতে প্রমাণ হয় মাওবাদীরা আসামে সক্রিয়। তবে ওই এনকাউন্টার আদৌ সত্যিকারের না ভুয়ো, লোকগুলো আদৌ মাওবাদী কিনা এইসব প্রশ্ন উঠেছে।[2]

১৯৮৩ সালে নেলীতে তথাকথিত বহিরাগতদের সাথে

2 http://sanhati.com/articles/5054/, http://sanhati.com/articles/5062/

আর কী ধ্বংস করা হয়েছিল? বামদলগুলো আগের মত জনসমর্থন আর কেন আকর্ষণ করতে পারছে না? যদি এই প্রশ্নের জবাব না পাওয়া যায় আসামে বাম আন্দোলন কখনো শক্ত জমি খুঁজে পাবে বলে মনে হয় না।

নেলীর মত ঘটনা কেন বিশ্লেষণ করা জটিল, ফলে চটজলদি রাজনৈতিক অবস্থান নেওয়া দুরূহ, তার উত্তর সম্ভবত এই যে বহু রাজনৈতিক, সামাজিক প্রবাহের তার এরকম ঘটনার সাথে জড়িয়ে থাকে। অনেকে মন্তব্য করেছেন জাতিসত্তার লড়াইয়ের ক্ষেত্রে সাবেক বামদলগুলোর অবস্থানে অস্পষ্টতা রয়েছে । অস্পষ্টতার কি কোনো বৈধ কারণ আছে? নেলীকে ভাবতে গেলে কী ধরনের জটিলতার সন্মুখীন হতে হয় এক এক করে খতিয়ে দেখে নেওয়া যাক।

প্রথমত, নেলীর হতাহতরা বেশিরভাগ চাষি বা খেতমজুর। সাধারণভাবে, এ বিষয়ে খুব সন্দেহ নেই যে আসাম আন্দোলনের বেশিরভাগ "বহিরাগত" হতাহতদের রোজগার তাদের শ্রমের থেকে আসত। মূলত অদক্ষ (unskilled) শ্রম। বাম রাজনীতির প্রথম নীতি বলছে যে এদের জীবন ও জীবিকার প্রতি সমর্থন থাকা উচিত।

দ্বিতীয়ত, হতে পারে নেলীর অনেকে বাংলাদেশ বা পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রব্রজন করেছিলেন । অর্থাৎ দেশের সীমা লঙ্ঘণ করেছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে বাম দলগুলোর দস্তাবেজে রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অখন্ডতা ও সীমাকে প্রধান গুরুত্ব দেওয়া হয়।[3] তাহলে কী দাঁড়াল? শ্রমজীবী মানুষের জীবন ও জীবিকার অধিকারের প্রতি সমর্থনের প্রশ্ন তাদের দেশের বৈধ নাগরিক হওয়ার প্রশ্নের সাথে মিশে সামান্য জটিল রূপ ধারণ করল।

তৃতীয়ত, আন্দোলনকারীদের বক্তব্য কী? তারা নিজেদের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করতে চাইছে। উত্তরপূর্বের বিভিন্ন জাতি উপজাতিগুলো যে বিভিন্ন ধরনের শোষণের শিকার এতে অনেকে একমত হবেন। অত্যাচার কখনো আর্থিক শোষণের রূপ নেয়, কখনো প্রাকৃতিক সম্পদ লুটের, কখনো রাষ্ট্রীয় দমনের। বামদলগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে প্রব্রজনী শ্রমিকের অধিকার রক্ষার প্রশ্ন আরো জটিলতা ধারণ করছে কেননা প্রব্রজন জাতীয়তাবাদী স্বার্থের প্রতিকূলে কাজ করে। কখনো স্থানীয় অধিবাসীরা ও প্রব্রজকরা একই প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর অধিকার কায়েম করতে চায়। সেরকম বিবাদের মীমাংসা সুদূরপরাহত মনে হতে পারে।

চতুর্থত, জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম অনেক সময় বিচ্ছিন্নতাবাদী রূপ নেয়। এই রাজনৈতিক ভাষ্যে সাম্রাজ্যবাদী ভারতীয় রাষ্ট্রের কাছে উত্তরপূর্ব একটি উপনিবেশ যার ভারতের কাছে উপযোগিতা আর্থিক বা সামরিক কারণে। স্থানীয় গোষ্ঠীগুলোর প্রকৃত আর্থিক বা সামাজিক উন্নয়ন হতে পারে তখনই যদি তারা ভারতের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এখন স্মরণ করুন যে সাবেক বাম দলগুলোর কাছে ভারতীয় রাষ্ট্রের সীমারেখা কিন্তু পাক। জাতিসত্তার অধিকার খুব ভাল কথা কিন্তু তাকে সাংবিধানিক পরিসীমার মধ্যে নমনীয় করে নিতে হবে। জাতিসত্তার অধিকারের আন্দোলনের দিক থেকে দেখলে বামপন্থীদের এই অবস্থান তাদের সন্দেহজনক করে তোলে। অনেক বামপন্থী সমর্থককে আসাম আন্দোলনের সময়ে ভারত সরকার চর হওয়ার অপবাদ সহ্য করতে হয়েছিল। এর একটা কারণ বামদলগুলো ১৯৮৩-র ভোটে অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু আরেকটি প্রচ্ছন্ন কারণ হয়তো এই যে বামপন্থীরা সেরকম জাতিসত্তা আন্দোলনের কল্পনা করতে অক্ষম, বা নারাজ, যা ম্যাপের গন্ডির ভেতরে বাঁধা থাকে না।

শেষ করার আগে এক জোড়া স্পষ্টীকরণ দিয়ে রাখি। প্রথমত, উত্তরপূর্বের রাজনীতির আবর্তের জটিলতা নিরশন করা এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল অন্তত কয়েকটি জটিলতা বোঝা। জটিলতাগুলোর মধ্যে আছে শ্রমজীবীদের আন্তর্জাতিক প্রব্রজন, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন , আত্মরক্ষার স্বার্থে রাষ্ট্রের ক্ষমতার খেলা, তার সাথে পুঁজির জোয়ার-ভাঁটা, ধর্ম, ভাষা, এথনিসিটির বিভিন্ন মাত্রা ইত্যাদি। প্রাথমিকভাবে মনে হয়, জাতিসত্তার লড়াইকে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের আতশ কাঁচ দিয়ে দেখা বামদলগুলোর পক্ষে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। দেশের সীমানাকে অলঙ্ঘনীয়তার মর্যাদা দিয়ে বামপন্থীরা নিজেদের জাতিসত্ত্বার লড়াই ও প্রব্রজক শ্রমিক দুই পক্ষ থেকেই দূরে সরিয়ে নিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, প্রবন্ধে প্রব্রজন ও উত্তরপূর্ব নিয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রব্রজন কিন্তু উত্তরপূর্বের সব রাজ্যে তত বড় বিষয় নয় যতটা আসামে। আসামেও দেখা যাচ্ছে গত কয়েক দশকে

3 আসামের পরিপ্রেক্ষিতে সাবেক বামদলগুলোর ব্যর্থতা অধ্যাপক হীরেন গোঁহাই এই সাক্ষাৎকারে আলোচনা করেছেন : http://sanhati.com/excerpted/2208/

জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার কমছে। বর্তমানে আসামের হার সারা ভারতের বৃদ্ধির হারের থেকে সামান্য কম। এর থেকে হয়তো বলা যায় প্রব্রজন কমে আসছে । তবে মনে রাখা ভাল যে ১৯৮০-র দশকের প্রথমার্ধে রাজ্য রাজনীতি একটা বড় পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গেছে যা বাম রাজনীতির কোমর ভেঙে দিয়েছে। যে সামাজিক-রাজনৈতিক ইস্যুগুলোকে ব্যবহার করা যেত রাষ্ট্রের শোষক চরিত্রকে তুলে ধরতে সেগুলো বিভিন্ন পরিচয়বাহী রাজনীতির (identity politics) দলগুলো কবজা করে নিয়েছে। নেলীর সেই হাজারকয়েক চাষি ও খেতমজুর, যাদের লাশ বাম রাজনৈতিক ভাষ্য এই তিরিশ বছরে ছোঁয়নি, আসামের সমাজকে নতুনভাবে ও সততার সাথে বোঝার চেষ্টা করে বামপন্থীরা তাদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে পারে।

(কৃতজ্ঞতা : অশোক প্রসাদের কয়েকটি প্রশ্নের জন্য ধন্যবাদ জানাই। প্রবন্ধটি প্রথমে ইংরিজিতে বেরিয়েছিল : http://sanhati.com/excerpted/5221/)

তথ্যসূত্র :

Anju Azad and Diganta Sharma (2009) "Nellie 1983" TwoCirclesNet, February 18, http://twocircles.net/special_reports/nellie_1983.html

Sanjib Baruah (1986) "Immigration, Ethnic Conflict, and Political Turmoil – Assam, 1979-1985," Asian Survey, Vol. 26, No. 11 (November, 1986), pp. 1184-1206.

Teresa Rehman (2006) "The Horror's Nagging Shadow" Tehelka, September 30 http://www.tehelka.com/story_main19.asp?filename=Ne093006the_horrors.asp

Myron Weiner (1983) "The Political Demography of Assam's Anti-Immigrant Movement," Population and Development Review, Vol. 9, No. 2 (June, 1983), pp. 279-292.

সংযোজন :

গত পাঁচ বছরে পরিস্থিতি আরো ঘোরালো হয়েছে। পনের বছর রাজত্বের পর দুর্নীতিগ্রস্থ কংগ্রেস সরকার বিদায় নিয়েছে। ভাজপা সরকার এসেছে। ভাজপা, অগপ, বোড়ো দলবিপিএফ, ইত্যাদি পরিচয়বাহী রাজনীতির দলগুলো এককাট্টা হয়ে লড়েছিল সেই নির্বাচন।বহিরাগত মুসলমান অর্থাৎ বাংলাদেশির জুজু দেখিয়ে এই চমকপ্রদ ঘটনা সম্ভব হয়েছে (লক্ষ্য করুন, বহিরাগত হিন্দু না)। আসাম আন্দোলনের হোতারা ভাজপার সাথে গাঁটছড়া বেঁধে দিশপুরের গদিতে চড়েছেন; এনারাইএকসময় ভারতীয়জাতীয়তাবাদের বিপ্রতীপে স্থানীয় এথনিসিটি-ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের কথা বলতেন, ভারত রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রের তত্ত্বরচনা করতেন। বেশি বুদ্ধিমানেরাকপালে টিকা লাগিয়ে গেরুয়া জামা পরে নিয়েছেন। বামদলগুলোর নির্বাচনী ফল আগের মতই করুণ। এর মধ্যে মহামহিম মোদি সরকার ঘোষণা করেছেন বাংলাদেশি হিন্দুরা ভারতে স্বাগত, মুসলমান হলেঅনুপ্রবেশকারী। তার সাথে যোগ হয়েছে এন আর সি (ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ সিটিজেনস) -- নিজেকে জায়েজ ভারতীয়, আসামবাসী প্রমাণ করার ঝকমারি। কে অসমীয়া, বহিরাগত কত পুরোনো হলে বহিরাগত থাকে না, কে বাংলাদেশি, হিন্দু বাংলাদেশি বলে কোনো পদার্থ হয় কিনা, এমন গুরুত্বপূর্ণ সব বিতর্কের তলায় নেলীর শবগুলো এখনো বিস্মৃত।

ইতিমধ্যে টুপি-লুঙ্গি-দাড়িওয়ালা বাংলাদেশির করাল ছায়া দীর্ঘতর হচ্ছে, রাজ্যজুড়ে আর এস এস-এর সংগঠন মজবুত হচ্ছে।

ভারতে আদিবাসী-সম্পর্ক

কুমার রাণা

"ঘর খালি। মুষলধারায় বৃষ্টির জল বয়ে যাচ্ছে ঘরের ভেতর। খড় দিয়ে কোনোরকমে ছাওয়া চালের সাধ্য কি যে সে জলের তোড় আটকায়? ভেতরে এক চিলতে এমন জায়গা নেই যেখানে সে মাথা বাঁচাতে পারে...তার মনে হল ঘর থেকে বেরিয়ে মেয়েগুলোকে বাড়ি নিয়ে আসা দরকার। কিন্তু, সে তাদের খাওয়াবে কী? তারা কীভাবে বাঁচবে? তাদের নিয়ে এসে সে কী করবে? যে অপার দুঃখ, আর অবিরাম জঠর দহন সে ভোগ করে আসছে তাদের কপালেও কি সে সেগুলোই লেখা থাকবে?...সে যা যা করতে চেয়েছে, একটু একটু করে গড়তে চেয়েছে, সব ধূলায় মিশে গেছে – কেন এমন হল, কেন এমন হয়?...সেতো নিয়মিত তাদের দেবতাদের কাছে বিনতি করে এসেছে, বলি দিয়ে এসেছে পায়রা, মোরগ আর পাঁঠা। হত্যে দিয়ে পড়ে থেকেছে তাদের থানে।...কিন্তু দেবতারা তার কথা শোনেনি, তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।... কাদা মেঝের ওপর সে কপাল ঠোকে, কান্নায় ভাঙ্গা গলায় সে দেবতাদের বলতে থাকে, 'হে ঠাকুর, এতটুকু দয়ামায়া নেই, তোমরা এতই নিষ্ঠুর!' নিষ্ফল তার আর্তি; তার করুণ প্রার্থনা ঢেকে দেয় বৃষ্টি আর ঝড়ের ক্রমাগত বেড়ে চলা সোঁ সোঁ আওয়াজ।"

জমিজায়গা যা ছিল, সব যায় মহাজনের দখলে। তার মেয়েরা খাটতে গেল বাইরে, নইলে খাবে কী? গোপীনাথ মহান্তি-র শুকরা জানি-র সৃষ্টি ১৯৪৫-এ, তাঁর পরজা উপন্যাসে। অথচ আজও সে কত জীবন্ত, কিম্ব বলা যায়, সে যেন আজকের দিনে আরো বেশি করে আদিবাসীদের প্রতিনিধি হইয়ে উঠেছে। ক'বছর আগে এ উপন্যাসের ভৌগোলিক এলাকাগুলো ঘুরে দেখার সুযোগ হয়। ওডিশার কোরাপুট-কলাহাণ্ডি অঞ্চলে শুকরার উত্তর-প্রজন্মের অবস্থা বদলেছে ঠিকই, কিন্তু সেটা খারাপের দিকে। জমি চলে গেছে। জীবন জীবিকার সাধনে যে অরণ্য ছিল সুরক্ষার প্রতিমূর্তি, সে বনভূমি আজ নষ্টপ্রায়। শুকরাদের জমি-জায়গা, স্থাবর-অস্থাবর সংস্থানগুলো লুঠ করত মহাজন; আজ তাদের জায়গা নিয়েছে কর্পোরেট পুঁজি – কিন্তু তার প্রকৃতি আরো নিষ্ঠুর। রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ মদতে কর্পোরেট পুঁজি ঝাঁপিয়ে পড়েছে আদিবাসীদের বিরুদ্ধে উগ্রতম আক্রমণে।

ভারতবর্ষ চারশোর অধিক আদিবাসীগোষ্ঠীর আবাস্থল, যাঁদের জনসংখ্যা সাড়ে আট কোটির কাছাকাছি। অন্যভাবে বলতে গেলে আদিবাসীরা মোট জনসংখ্যার ৮.২ শতাংশ। এঁদের প্রায় তিন চতুর্থাংশের বসত মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ছত্তিশগড়, রাজস্থান, ঝাড়খণ্ড, পাশ্চিমবঙ্গ, ওডিশা, গুজরাট, এবং বিহারে। অবশ্য, উত্তর-পূর্ব দিশার মিজোরাম (৯৪%), নাগাল্যাণ্ড (৮৯%), মেঘালয় (৮৬%), এবং অরুণাচল প্রদেশ (৬৪%)-এর মতো রাজ্যগুলোতে জনসংখ্যায় যে রকম আদিবাসী সংখ্যা গরিষ্ঠতা ভারতের আদিবাসীবহুল রাজ্যগুলোতে কিন্তু তা নয় – এ সব রাজ্যে আদিবাসীরা সংখ্যালঘু। সংখ্যায় তাঁরা বিরাট হলেও মোট এ রাজ্যগুলোতে জনসংখ্যা যেহেতু অনেক বেশি, তাঁদের আপেক্ষিক ঘনত্ব লঘু হয়ে যায়।

এই ব্যাপারটা ভারতে আদিবাসী প্রশ্ন নিয়ে আলোচনায় একটা জটিলতা যোগ করেছে। এ লেখায় প্রশ্নটাকে তার পূর্ণরূপে দেখার সুযোগ নেই। আমরা প্রধানত ভারতের তথাকথিত মূল ভূখণ্ডের আদিবাসী প্রশ্ন নিয়ে কিছুটা বিশ্লেষণের চেষ্টা করব। প্রসঙ্গক্রমে, ত্রিপুরা ও আসামের আদিবাসী বিষয়েও কিছুটা দৃষ্টিপাত করতে হবে, কারণ, এ রাজ্যগুলোতে আদিবাসী সম্পর্কগুলো তথাকথিত মূল ভূখণ্ডের মতোই – দক্ষিণ ভারত নিয়েও একই কথা।

সাধারণ বঞ্চনা

দেশের বেশির ভাগ রাজ্যেই যে আদিবাসীরা ভয়ানক সামাজিক বঞ্চনাআদ ও আর্থনীতিক আক্রমণের শিকার এটা নতুন কোনো কথা নয়। এমনকি কেরলের মতো উন্নয়নের ইতিহাস গড়া রাজ্যেও আদিবাসীদের শিক্ষাগত বঞ্চনা (সাক্ষরতার হার ৭৬%, যেখানে মোট সাক্ষরতার হার ৯৪%) তীব্রভাবে ধরা পড়ে। অন্য রাজ্যগুলোতে অবস্থা শোচনীয় – সাক্ষরতার হার ৫০% র সামান্য ওপরে।

স্বাস্থ্য, পুষ্টি ইত্যাদি উন্নয়ন-সূচকগুলোর দিকে দিয়ে

দেখলে যে ছবিটা পাওয়া যায়, তা এক কথায় অসহনীয়। ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে, ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে-র মতো প্রামাণ্য সমীক্ষাগুলো বছরের পর বছর ধরে আদিবাসীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের একপ্রকার নীরব হামলার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

আর্থনীতিক ক্ষেত্রটাতে আবার আদিবাসীরাই হচ্ছেন দরিদ্রদের মধ্যে দরিদ্রতর – তাঁদের প্রায় পুরোটাই জীবিকার জন্য দিনমজুরি বা সমপ্রকার কঠিন দৈহিক শ্রমের উপর নির্ভরশীল। মূল ভুখণ্ডের রাজ্যগুলোতে আদিবাসীদের ৮৪ শতাংশই হয় ক্ষেত মজুর বা স্ব-ঘোষিত চাষি। "স্ব-ঘোষিত" কথাটা ব্যাখ্যা দাবি করে : পশ্চিমবাংলা থেকে ছত্তিশগড়, ওডিশা থেকে মহারষ্ট্র – আদিবাসীরা নিজেদের কৃষক পরিচয় দিতেই পছন্দ করেন। এক কালে তাঁরা এমন এক স্বয়ম্ভর অর্থনীতির অংশ ছিলেন, যেখানে তাঁদের অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হতনা। কিন্তু, জমি বে-দখল হতে হতে, এবং লাগাতার দেশি-বিদেশি শাসক-শোষকদের অত্যাচারে, এক সময়কার আত্মনির্ভর আদিবাসী পরিণত হল দেহ-শ্রম বিক্রি করে জীবিকা অর্জন করা মজুরে। কিন্তু, এই মজুর সত্ত্বার বাস্তবতা ও অতীতের স্মৃতি যা আজ বদলে যাওয়া অবাস্তব-দুটোই আদিবাসী মনে বেঁচে থাকে। বস্তুত তার সাংস্কৃতিক জীবনের বেশির ভাগ জুড়েই সেই অতীতের কৃষি-কেন্দ্রিক স্বনির্ভর আর্থনীতিক সঞ্চলনের ছায়া। সেই একদা বাস্তবের জাগ্রত স্মৃতিতে আদিবাসী এখনো নিজের পরিচয় দেয় – আমি চাষি, তা সে যতই কেননা তার সংসার চালাতে তাকে বছরের ন'মাস ক্ষেতমজুরি করতে হোক।

বঞ্চনা ও শ্রেণি-সংযোগ

কেন এমনটা হচ্ছে? আদিবাসীদের দীর্ঘ বঞ্চনার ইতিহাসের একটা বড় যোগ আছে ঔপনিবেশিক শাসনের সংগে; কিন্তু সে শাসনের অবসানের পর এতদিন কেটে গেলেও ভারতের আদিবাসী-সম্পর্কটাতে কোনো পরিবর্তন হলনা কেন? শোষণমূলক এই সম্পর্কের নৃগোষ্ঠীগত, ভৌগোলিক, ইত্যাদি নানান সংযোগ আছে। কিন্তু, এর একটা প্রধান যোগসূত্র হচ্ছে শ্রেণি, যা আবার অন্যান্য উপাদানগুলোর সংগে অত্যন্ত জটিলভাবে ক্রিয়াশীল।

ভূমিবিচ্ছিন্নতা

আদিবাসীদের বঞ্চনা শুরু হচ্ছে তাঁদের ভূমিহীনে পরিণত হওয়ার মধ্য দিয়ে, যার সূচনা ঔপনিবেশিক শাসনে, ১৭৯৩-এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে। ঠিগত প্রমাণ থেকেই আমরা দেখতে পাই কীভাবে লক্ষ লক্ষ আদিবাসী ঔপনিবেশিক প্রভুদের দেশি য় সেবকদের কাছে তাঁদের জমি হারিয়েছেন। বিদেশি শাসকরা আদিবাসীদের মধ্যে খুঁজে পেল সস্তা শ্রমের বিরাট মজুদ, আর দেশি শোষকরা, শাসকীয় মদতে কেড়ে নিল তাদের জমি। ।

যে গ্রামে আমার জন্ম ও বড়ো হওয়া তার ৯০% লোক-ই আদিবাসী– সাঁওতাল ও মুন্ডা। সাঁওতালরা এ গ্রামের পত্তন করেন। মুণ্ডারা অন্য এক গ্রামে অ-আদিবাসীপ্রবঞ্চকদের কাছে সর্বস্ব হারিয়ে এ গ্রামে বন কেটে বসত গড়েন। কিন্তু, গ্রাম পত্তনের কিছুদিনের মধ্যেই অ-আদিবাসী — আদিবাসীদের ভাষায় দিকু- দের আগমন। গ্রামের পুরনো নথি ও মৌখিক ইতিহাস থেকে জানতে পারি সেখানকার সব জমিই ছিল আদিবাসীদের, কিন্তু আজ তার ৭৫% ই বেহাত। বর্তমান ঝাড়খণ্ডের সাঁওতাল পরগণার এক গ্রামে টানা এক বছর থাকার সুযোগ ঘটেছিল। সেখানেও এক ই কাহিনি – জমি তৈরি করেছিলেন সাঁওতালরা, কিন্তু ভোগ করছে দিকুরা – বীরভূম থেকে যাওয়া এক ব্রাহ্মণ প্রিবারের হাতে সে গ্রামের উর্বর জমিগুলোর প্রায় পুরোটাই। ওডিশার রায়গড়া জেলার কাশিপুর থানায় দেখলাম এক ব্রাহ্মণের হাতে এক হাজার একরেরও বেশি জমি – পুরোটাই পরজা ও খণ্ড আদিবাসীদের কাছ থেকে ঠকিয়ে নেওয়া। যে তিন জায়গার কথা বল্লাম, সব ক'টাতেই একশো বছরের ব্যবধানে স্ব-নির্ভর আদিবাসীরা হয়ে উঠেছেন মজুরি-শ্রমের উপর নির্ভরশীল, জীবন-জীবিকা অনিশ্চিত। অবশ্য, এগুলো জানবার জন্য ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রইয়োজন নেই – হাজার হাজার সরকারি নথি থেকেই এগুলো ভালভাবে জানা যায়।

জনবিন্যাসগত পরিবর্তন

ভূমিহীনতার একটা প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে জনবিন্যাসের ওপর। আদিবাসীদের স্ব-ভূমি ছেড়ে দূর বিভূঁইয়ে গিয়ে ঠিকানা নিতে হইয়েছে। সাঁওতাল পরগনা, ছোটনাগপুরের লক্ষ লক্ষ আদিবাসীকে গ্রাম-জংগল-ঝর্ণা ছেড়ে চলে

যেতে হল আসামে, উত্তরবঙ্গে। আবার জমির মালিকানা বদলের মধ্য দিয়ে আদিবাসী এলাকাগুলোতে এসে জড়ো হতে লাগল অ-আদিবাসীরা। ১৮৫৬ সনে কলাহাণ্ডির জনসংখ্যায় আদিবাসীরা ছিলেন ৬৩ ভাগ; আজ সেটা বদলে দাঁড়িয়েছে ৩৩-এ। ছোটনাগপুর-সাঁওতাল পরগণা-মেদিনীপুর-পুরুলিয়া-ময়ুরভঞ্জ সর্বত্র আদিবাসীদের নির্মম প্রান্তিকীকরণের অসহনীয় অভিজ্ঞান।

উচ্ছেদ

এর পর আসলো উন্নয়নের নাম করে সর্বনাশা উচ্ছেদ। ওয়াল্টার ফার্নান্ডেজ সহ অনেকেরই গবেষণায় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কীভাবে লক্ষ লক্ষ আদিবাসীকে তাঁদের বসত ভূমি থেকে জোর করে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে – কোথাও বাঁধ, কোথাও খনি, কোথাও বা পর্যটন বিলাসের মধ্য দিয়ে উন্নয়নের ছদ্মবেশে লুণ্ঠনের মহা আয়োজন। এ উন্নইয়নের যাঁতাকলে সব চেয়ে বেশি যাঁরা পিষ্ট হচ্ছেন, তাঁরা হচ্ছেন আদিবাসীরা। একটা সমীক্ষার হিসেবে, উন্নয়নের নামে উচ্ছেদ হওয়া মানুষদের ৪০% ই হচ্ছেন আদিবাসী – অথচ মোট জনসংখ্যায় তাঁদের অংশ মাত্র ৮ ভাগ!

১৯৫৬ সনে তৈরি হল ময়ূরাক্ষী নদীর ওপর বাঁধ – সাঁওতাল পরগনার ১৪৪ সুফলা মৌজাকে জলমগ্ন করে। সে সব গ্রামের আদিবাসীরা বাধ্য হয়ে বসত গড়লেন বীরভূম-দুমকা সীমান্তের ঊষর ভূভাগে। সম্বৎসর যাঁরা চাষের ধানে ভাত খেতেন তাঁরা রাতারাতি পরিণত হলেন অনাহারী, অর্ধাহারী দিনমজুরে। একই নিষ্পেষণের গাথা শুনতে পাওয়া যায়, কলাহান্ডির ইন্দ্রাবতী বাঁধের তলায় চাপা পড়া আদিবাসীদের স্বয়ম্ভর অর্থনীতির স্মৃতি-রোমন্থনে : "নুন আর কাপড় ছাড়া আমাদের কিছুই প্রায় কিনতে হতনা। ধান, ছোলা, মুগ, সব্জী-র অঢেল সম্ভার ছিল। আর ছিল গরু, শুয়োর, মুর্গীর পাল। আর আজ আমরা ভিখারি", ক্ষোভ উগ্রে দিচ্ছিলেন পাডেপাদরের শ্যাম ঝড়িয়া।

উন্নয়ন শুধু তাঁদের স্ব-গৃহ থেকে উৎখাতই করেনি; কেড়ে নিয়েছে তাঁদের অরণ্য, নদী, বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ। "জমি গেল, জংগলও গেল, মান-সম্মান গেল" শ্যামের আক্ষেপ শুধু পাডেপাদর নয়, শোনা যাবে ভারতের আদিবাসী কুটীরগুলোর প্রতিটি কোণে। কর্পোরেট লোভের কাছে তাঁদের বিসর্জন দিতে হইয়েছে জৈবিক নিরাপত্তা, মানবিক সম্মান।

ত্রিপুরার উদাহরণ দেখা যাক : একদা রাজ্যের জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ আদিবাসীরা আজ সেখানে সংখ্যালঘু; সেই সংগে তাঁরা হারিয়েছেন তাঁদের জমি ও সুফলা প্রকৃতি। আদিবাসীদের হারানো জমির পরিমাণ তিন লক্ষ একর।

আদিবাসীদের মধ্যে চাপিয়ে দেওয়া অপরত্বের আর এক নমুনা দেখা গেল পশ্চিমবাংলার বক্সাদুয়ারে : ১৯৯২ সালের এক ভোরে তাঁদের জীবনে অকস্মাত নেমে এল ঘোর অমানিশা : বনবিভাগের আদেশে পাহাড়ের সব কমলাবাগান কেটে ফেলা হল। কমলাবাগান থেকে পাওয়া আর্থিক স্বনির্ভরতা হারিয়ে ডুকপা আদিবাসীরা পরিণত হলেন মজুরে। কেন কাটা হল কমলাবাগান? এক ডুকপা-র কথায় : "সরকার আমাদের বলছিল নিচে নেমে এসে সবাইকে এক জায়গায় থাকতে। কিন্তু, তা কী করে হয়? আমরা জন্ম জন্ম ধরে এ-পাহাড়ে অ-পাহাড়ে বাস করে আসছি, আজ যদি বলা হয় তোমাদের রহন-সহন বদলে ফেলতে হবে, তা আমরা কী করে করব, কেনইবা করব? কিন্তু সরকার সর্বশক্তিমান – জোর খাটিয়ে আমাদের বাগে আনতে চাইল।"

দেশান্তরের চলমান ইতিহাস

এ সবের সংগে চলছে দেশান্তরের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ। দলে দলে আদিবাসী স্ব-গ্রাম, স্ব-গৃহ ছেড়ে কেবল ভাতের নিশ্চয়তার জন্য পাড়ি দেন দূর দেশের শষ্যক্ষেত্রে বা অন্যান্য কাজের জায়গায়। কঠিন সে যাত্রা, ভীড় বাসের ভিতর পিষ্ট হতে হতে কাজের জায়গায় পৌছোনো। বাসের মধ্যে আদিবাসীদের নারীদের নির্যাতনের এবং নির্যাতন সয়ে যাওয়ার সঞ্চিত অভিজ্ঞতা, কার্মক্ষেত্রেও একই উৎপীড়ন। বেশি দূরে যাওয়ার দরকার নেই : যে কোনো ধান রোয়া-কাটার মরসুমে বর্ধমান-হুগলি-র গ্রামগুলোতে, সে গ্রামে যাবার বাস-ট্রেন অন্যান্য যানবাহনগুলোতে দেখা যাবে মানুষী মর্যাদার অবমাননার ভয়ংকর ছবি।

মৌলিক অধিকার হনন

এর সংগে আছে মৌলিক অধিকার হনন। সারা দেশ জুড়ে আদিবাসীরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মনিয়োজনের অধিকাগুলো থেকে বঞ্চিততো হনই। এর চেয়ে বড়ো অধিকার হনন ঘটে তাঁদের সাংবিধানিক মর্যাদার বঞ্চনায়। যেমন আসামে : এখানকার

চা-বাগান, এখানকার শস্যক্ষেত্র, এবং আর্থনীতিক সমৃদ্ধিতে ঝাড়খণ্ড সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রা থেকে আসা আদিবাসীদের অবদান বিপুল। অথচ, এ রাজ্যে তাঁরা তফসিলি জনজাতি (এস-টি) মর্যাদা পাননা। কারণটা শ্রেণিগত – এ মর্যাদা পেলে সাংবিধানিক রক্ষাকবচগুলো ব্যবহার করে অন্তত একটা অংশের আদিবাসী নিজেদের জীবনযাত্রার মান বাড়াবার সুযোগ পাবেন, কিন্তু সেটা পেলে অবিশ্বাস্য সস্তা মজুরিতে চা-বাগানে কাজ করবে কে? সরকার, স্পষ্টত, অসমিয়া শাসকশ্রেণির পক্ষে, বা তাদেরই প্রতিভূ। এর উপর আছে কথায় কথায় ঝাড়খণ্ডি আদিবাসীদের উপর সরকারি মদতে আসামেরই বোডোদের মতো কিছু আদিবাসী গোষ্ঠীর অকল্পনীয় হিংসা – গত শতাব্দীর ভারতে আসামের কোকরাঝাড় জেলায় লক্ষ লক্ষ সাঁওতাল বোডো জঙ্গীদের হাতে প্রাণ হারান, গ্রামের পর গ্রাম উজাড় করে লোকেরা পালাতে বাধ্য হন শরণার্থী শিবিরে।

কী ভাবে দেখব

আদিবাসী প্রশ্নটাকে কীভাবে দেখব? সাধারণত আদিবাসী প্রশ্নটাকে যেভাবে দেখা হয়ে থাকে তাতে শোষণের বিরোধিতার কথা বললেও আসলে তা শাসকীয় অবস্থানটাকেই দৃঢ় করে। যেমন, অ-আদিবাসী বিদ্বান বা রাজনীতিক মহলে প্রায়ই আদিবাসীদের উন্নতির জন্য খুবই জোর দেওয়া হয়ে থাকে। সমস্যাটা হল, আদিবাসীদের উন্নতির কথাটা ভাবা হয়, তাঁদের প্রতি এক কৃপাবর্ষী মনোভাব থেকে : "ওদের জন্য কিছু করতে হবে"- এই অপরত্বের প্রভাব একদিকে যেমন দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে, তেমনি অন্যদিকে আদিবাসীদের সঙ্গে অন্যদের ঐতিহাসিকভাবে গড়ে ওঠা দূরত্বটাকে বাড়িয়ে তোলে। আদিবাসীরাতো অন্যদের সহ-নাগরিক; আধুনিক শিক্ষা, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য-পরিচর্যা, ইত্যাদি নানা ব্যাপারে তাঁরা যে অন্যদের চেয়ে পিছিয়ে আছেন তার কারণটা সুযোগবঞ্চনা – তাঁরা সেই সুযোগ পাননি। সে সুযোগের জন্য একযোগে-সহ-নাগরিকত্বের বোধে – লড়াই করাটা যেমন একটা কাজ, তেমনি আবার আদিবাসী বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা নানান সাংস্কৃতিক-দার্শনিক সমৃদ্ধি থেকে ভারতবর্ষ যে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত হয়ে রয়েছে, সেই আচ্ছন্ন-দৃষ্টি বঞ্চনা থেকে নিজেদের মুক্ত করাটাও একটা প্রধান কর্তব্য। মুণ্ডারি ভাষায় আছে ১৪ খণ্ডের এন্সিক্লোপেডিয়া, সাঁওতালি ভাষার অভিধান সংকলিত করে লেগেছে ৫টা খণ্ড, এ সব সমাজে গণতন্ত্র সম্পর্কে ধারণা সুউচ্চ দার্শনিক ভাবনা ও অনুশীলনের প্রতিফলন। আমরা শুধু তাঁদের দেব, নেবনা কিছুই এতে যেমন অশ্রদ্ধা আছে তেমনি আছে মূঢ় আত্ম-প্রবঞ্চনা। পারস্পরিকতার অনুশীলন ছাড়া আদিবাসীদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অবিচার-অত্যাচারগুলো যেমন দূর করা যাবেনা, তেমনি ভারতবর্ষকেও প্রকৃতপক্ষে মুক্ত-স্বাধীন এক দেশে উত্তীর্ণ করা যাবেনা। শুকরা জানি-র দেবতার তার প্রতি মুখ ফিরিয়ে নেওয়াটাতো আসলে ভারতবর্ষের এক মহাসংকটের চিহ্ন : সমানুভূতির অনস্তিত্ব। সে অনস্তিত্বে শুকরা জানি যতটা দুর্ভাগ্যের শিকার দেশের দুর্ভাগ্যও ঠিক ততটাই।

অপরের দর্শন —অন্যজনের নির্মাণ

জয়া মিত্রের ও অভিষেক সরকারের কথোপকথনের অনুলিখিত নির্যাস

সংখ্যালঘু আসলে খুব আপেক্ষিক একটা শব্দ- বস্তুত একটা নির্মাণ। অপর - সেখানে একটা সামগ্রিক দর্শন। খণ্ড বোধ সেখানে আরও কম। আরও ভালো হয় – অন্যজন – বললে।

ক্ষমতাতন্ত্র সবসময় যে সংখ্যা দিয়ে ভাবে এমনটা নয়। এইটা 'আমি' আর rest of the world হোলো 'অপর' – এই হোলো তার ভাবনাটা। তার আঁতের কথাটা। শুধু সংখ্যা দিয়ে নির্মিত দর্শনতত্ত্বে খণ্ডভাবটা অসুবিধাজনক। আগে থেকে যেন ঠিক করা হয়েছে যে এইরকমটা হবে। বাকিটা তাতে ফিট করানো। এতে স্বাভাবিকতা বিঘ্নিত হয়।

লেস্লি সিন্ধোর – Yellow Woman সিরিজ থেকে কিছু ভাবনা এসে দেখা দেয়। সেখানে বলা হয়েছিলো – আমরা বাঁচি বয়ে চলা গল্পের স্রোতের মধ্যে। Stories are what we have। আসলে যখন আমরা ভুলে যাই আমাদের প্রবহমান বাস্তবতা – ইতিহাস, বেঁচে থাকা তখন what stories we have ভুলে গিয়ে শিকড়ের উপাখ্যান থেকে সরে গিয়ে তখনই ক্ষমতাতন্ত্র আমাদের দিয়ে নতুন গল্প বানায়। আমরা সেটাই বলতে থাকি। এইটাই ক্ষমতা সব সময়ে চেষ্টা করে, নিজের একটা নতুন গল্প তৈরি করে। পুরোনো সতেজ, সহজ বহমানতাকে ভুলিয়ে দিয়ে। তার ওপরে স্টিমরোলার চালিয়ে দিয়ে। শান্ত ভাবে যেকোনো বড় লড়াই লড়তে গেলে প্রাকৃতিক উপকরণগুলো খুব দরকারি। সেইটা এই গল্পগুলো খুঁজে পাওয়া, বলতে এবং শুনতে পারার মধ্যে আছে। বলা বাহুল্য – ক্ষমতাতন্ত্রের কাছে সেটা গ্রহণযোগ্য নয়।

সংখ্যাগুরু- গণতন্ত্রের কাঠামোর অংশ- এবং একটা tool বিশেষ। ফ্রেমের মধ্যে থাকা অথবা না থাকা – এইদিয়েই একটা নির্মাণ প্রক্রিয়া। মৈথিলি নয় হিন্দি । মুসলমান নয় হিন্দু। এইভাবেই একটা প্রতিনির্মাণ এবং নির্মাণের একটা কুৎসিত এবং কৃত্রিম দ্বৈততা ফুটে ফুটে ওঠে।

শব্দের প্রাণ থাকে। নির্জীব পদার্থ নয় এরা। অথচ এই সংখ্যার লঘু এবং গুরু জাতীয় প্রয়োগে শব্দের একটা প্রাণহীনতা আবাহন করা হচ্ছে। ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স, নারী নির্যাতন জাতীয় শব্দেও এইটা হয়। সংখ্যাগুরু মানেই সংখ্যালঘু প্রস্তুত এবং চিহ্নিত, এবং উল্টোটাও। এই সব শব্দেরা বড় মৃত। ভালো লাগেনা এতো মৃত শব্দদের। এরা কিছু বোঝায় না। এরা আসলে পাওয়ারের ডিজাইনেরই একটা পার্ট।

জয়াদির লেখা –উন্নয়ন এবং ঘরের লক্ষ্মী, যশোদাদিদি জাতীয় গল্পেও উঠে আসছে অতিরেকহীন একটা অপরতন্ত্রের বাস্তবতা। দাগিয়ে দেওয়া লেবেল বহির্ভূত , অন্য আর এক উপস্থাপনা। সাহিত্যবোধের হাত ধরেই মানবিক মর্মবোধ জাগ্রত হওয়া সহজ। কোনো নিগূঢ় তত্ত্বের বিশাল চর্চার থেকেও এই বহমান সাহিত্যবোধ জয়াদির হাত ধরেছে অনেক সহজে। অনেক লড়াইয়ের রসদ জুটেছে সাহিত্যপরিক্রমার তপতপে শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়া গতিপথে।

অপরের থেকেও অন্যজন শব্দে এই একরৈখিক চিহ্নায়ণ যেন আরও উষ্ণ। আরও প্রাণময়। অধোগত এবং প্রান্তিক জাতীয় পরিভাষাতেও যেন তত্ত্ববিদ নিজে ফ্রেমের বাইরে। দূর থেকে দেখা , এবং একদমই নিপীড়িতের পাশে না থাকা। এতে তত্ত্ব হয়তো আড়ষ্টভাবে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু তাত্ত্বিক নিজে নিপীড়িতের থেকে চলে যান দূরে এবং ক্ষমতাতন্ত্রের সহজ লক্ষ হয়ে ওঠেন তিনি। নিজেরই অজান্তে ক্ষমতার ঘেরাটোপ গিলে খায় তাঁকেও। ফ্রেমের সীমারেখা তৈরি হওয়ার দিনেই শুরু হয় এই নিজেকে হারিয়েটাও।

Howard Fast এর The Large Ant গল্পেও দেখা যায় এই রকম এক ক্ষমতাতন্ত্রের নির্মাণের গতিপথ। শুধু অন্যরকম দেখতে বলেই মরে যেতে হোলো কিছু বড় বড় শান্ত এবং অক্ষতিকারক পিঁপড়েকে। তাদের অপরাধ ছিলো যে প্রচলিত পিঁপড়েদের সাথে তাদের সাদৃশ্য ছিলোনা। অচেনাকে দেখে মানুষের স্বাভাবিক প্রতিবর্তক্রিয়া তাদের খুন করতে বাধ্য করায়। ক্ষমতার যেকোনো রকমের আঘ্রাণ এই প্রতিবর্ত ক্রিয়াগুলোকেই তৈরি করে চলেছে গভীর নিপুণতায়। ক্ষমতা কোনো ভিন্নমতের ভাবুকদের পাশে চায়না। হয় কেউ ক্ষমতার সাথে বা বিপক্ষে।

নকশাল আন্দোলনের ইতিহাসেও সেটা দেখা যায়। কেউ

পাশে এসে কিশোর, কিশোরী, যুবক , যুবতীদের সাথে ডায়ালগ শুরু করেন নি যে তোমরা কী চাও? কি তোমাদের তত্ত্ব? শুধুই চলেছে তাঁদের বিরুদ্ধে ক্ষমতা তন্ত্রের ক্ষমতা প্রদর্শন। তথাকথিত সুশীল সমাজও চিনে নিয়েছে ক্ষমতা তন্ত্রের হাওয়াকে , সেই হাওয়ার চাহিদাকেও। মিশিয়ে নিয়েছে নিজেকে খুবই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সেই হাওয়ায়।

স্টেটের সাথে মিশে যেতে চাওয়ার প্রবণতা সর্বত্রপ্রশারী। দূর দূর সম্পর্কেও মানুষ খুঁজে চলে রাষ্ট্রীয় আমলা কিম্বা ক্ষমতাসীন কোনো ব্যক্তিত্বকে। এই কাঙালপনায় অপ্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে বাকি সবকিছু এবং বাকিরা। এবং এইখানেই অপর/অন্যজনের অস্তিত্ব চিহ্নিত হয়ে চলে। এই নির্মাণ আপাত এক স্বাভাবিকতার ছদ্মবেশ পড়ে নিতে শিখে যায় খুব তাড়াতাড়ি।

শুধু সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু তত্ত্বের পরিভাষায় ক্ষমতাতন্ত্রের এই অভিমুখ এবং গতিপথ সামগ্রিকভাবে , পরিপূর্ণ ভাবে বোঝা যায়না। আজ মোদী সরকারের মধ্যে নতুন ইতিহাস নির্মাণের যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, সেটাও কিছু নতুন বস্তু নয়। এই নির্মাণের ইতিহাসও ততটাই পুরোনাও যতটা পুরোনো আধুনিক রাষ্ট্রকেন্দ্রিক ক্ষমতার কাঠামোগুলো।

ক্ষমতার স্তরবিন্যাসের একটা দীর্ঘসূত্রিতা আছে। উৎপাদনের বিবিধ প্রক্রিয়া এর সাথে জড়িত। কৃষিভিত্তিক সমাজ এবং পশুপালক সমাজের সংঘাত এবং মিলনের মধ্যে দিয়েই স্তরে স্তরে আধুনিক ক্ষমতার বিন্যাস এবং পর্যায়গুলো তৈরি হয়েছে। আশা এইটাই যে হয়তো পৃথিবীব্যাপী এই ক্ষমতার স্তর বিন্যাস, তার আস্ফালন, তার হিংস্রতা এবং লোভ যেহেতু স্বাভাবিক নয় তাই এর স্বায়িত্ব নিশ্চয়ই প্রশ্নের মুখে পড়ে ভেঙ্গে পড়বে। ইউরোপের কলোনীতন্ত্রের পেষণে যেভাবে যা যা পৃথিবী জুড়ে বিপর্যস্ত হয়েছে তাতেও চিহ্নিত করা যায় এক অপর বা অন্যজনের নির্মাণ প্রক্রিয়াকে।

চা বাগানের শ্রমিক ,খাদান শ্রমিক,নীলচাষী এবং এমন হাজার হাজার 'অপরের' ঘামে-রক্তের ওপরেই 'সভ্যতার' বকলমে চলেছে ক্ষমতা তন্ত্রের রথ। হতাশ হতে হয় সেইভাবে ঋত্বিক ঘটক ছাড়া আর কোনো বাঙ্গালি স্রষ্টার হাত থেকে দেশভাগের বেদনা,বিষণ্ণতা,আক্রোশ এবং রাগের বহিঃপ্রকাশ হতে যে দেখা যায়না। এও সেই ক্ষমতাতন্ত্রের হাওয়ার ঝোঁক বটে। যাতে সহজেই মিশে যায় , যেতে থাকে সমাজের অংশগুলো। পঞ্চাশ ,ষাটের দশক জুড়ে সাহিত্যপথের নীরবতাও ভয়ানক মর্মস্পর্শী এক বেদনা। উদ্বাস্তু নামক এক ভয়াবহ বেদনাদায়ক শব্দেও ধরা আছে সেই 'অন্যজন'এর ধারণা।

ক্ষমতাতন্ত্র বিন্যাসের যে কাঠামোগুলো আজকে চালায় পৃথিবীকে যেমন রাষ্ট্র বা কর্পোরেটতন্ত্র তাদের ভালো করে বুঝে নিতে গেলে এবং অন্ধ-ভণ্ড-হিংস্র-ধূর্ত ক্ষমতার মুখোমুখি মহড়া দিতে গেলে যে বিপুল নিদিধ্যাসন এবং মানসিক শক্তি দরকার পড়বে তাতে প্রয়োজনীয় পাথেয় হয়ে দেখা দিতে পারে – গান্ধীজীর দর্শন। রাষ্ট্র নয় স্বদেশ। আমরা এবং অন্যজন নয় , মানবিক একত্ব খুঁজে পেতে গেলে গোপনীয়তাহীন এক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন আবশ্যক। এর প্রাকমডেল পাওয়া কঠিন। ইতিহাসে বিরল। তাই ভ্রান্তি এবং ভুল অনিবার্য। শুধু সেইটাতেই তাই ঠেকে গেলে চলবে না। ভুল থেকে শিখে নেওয়া যায়। পথের সন্ধানে এটা জরুরি অংশ।

গভীর সংকটে মন দিয়ে খুঁজলে পথের সন্ধান পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস রাখা চাই। পথের সন্ধান পাওয়া না গেলেও গভীর ভাবে ভাবাটা, ভেবে চলাটা জরুরি। পথ না পেলেও ভাবনার স্পষ্ট অবয়ব পাওয়াটাও একটা বিশেষ লাভ।

৬-ডিসেম্বর-২০১৭

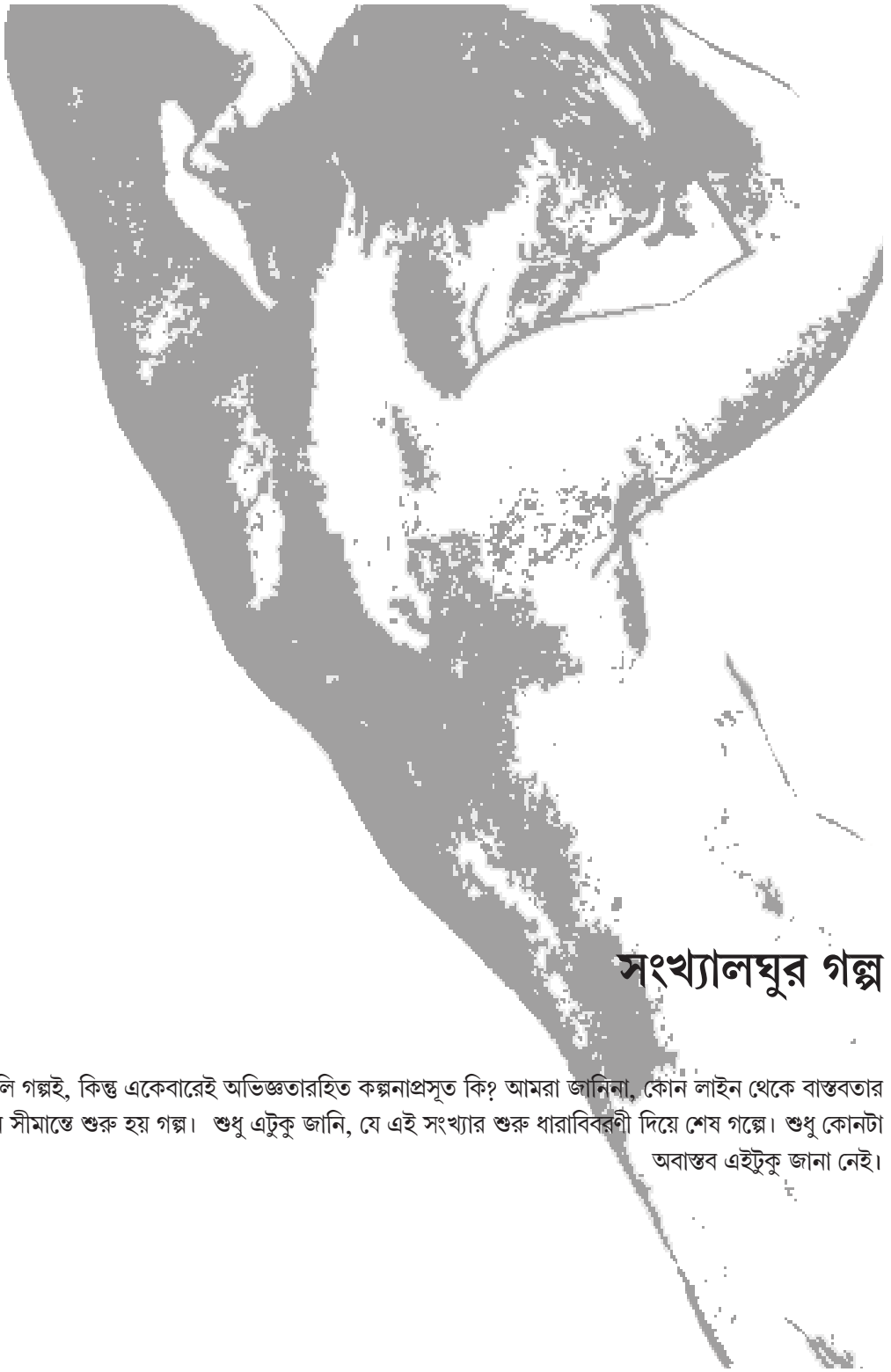

সংখ্যালঘুর গল্প

যদিও এই গল্পগুলি গল্পই, কিন্তু একেবারেই অভিজ্ঞতারহিত কল্পনাপ্রসূত কি? আমরা জানিনা, কোন লাইন থেকে বাস্তবতার শুরু কোন সীমান্তে শুরু হয় গল্প। শুধু এটুকু জানি, যে এই সংখ্যার শুরু ধারাবিবরণী দিয়ে শেষ গল্পে। শুধু কোনটা অবাস্তব এইটুকু জানা নেই।

মিহিকার জন্মদিন

মলয় রায়চৌধুরী

সবাই দাড়িটা কামিয়ে ফেলতে বলছে।

চাকরি করার সময়ে যখন অফিসের কাজে মুম্বাই থেকে সময়ে-অসময়ে পশ্চিমবঙ্গে যাতায়াত শুরু করলুম, তখন দাড়ি ছিল না। চাষি-তাঁতি-জেলেদের হাল ফেরাবার জন্যে কী-কী করা যায়, সে-সব খোঁজখবর নিতে তাদের কাছেকিছু জানতে চাইলে, বাংলাতেই জানতে চাইতুম, জবাব পাওয়া যেত না ঠিক মতন। জ্ঞান যোগাড় করব, তা নয় একেবারে বোকচন্দর হয়ে ফিরতুম।

অফিসে হাই-আমলারা সবাই খাপ্পা। সুব্রহ্মনিয়াম তামিল হবে তথ্য যোগাড় করছে, তারাপুরকর মারাঠি হয়ে সঠিক প্রতিবেদন বানাচ্ছে, খান্না পাঞ্জাবি হয়ে চাষআবাদের খাঁটি খবর আনছে, আর আমি বাঙালি হয়ে বাঙালিদের কাছ থেকে ঠিকমতন ব্যাপার-স্যাপার জেনে আসতে পারছি না। আমার নিজের বাপ-চোদ্দোপুরুষের সাকিন, অথচ সেখানেই গাড্ডুস মারছি। অন্য রাজ্যগুলোয় যখন যাই, সেখানে তো লোকে দিব্বি আমার হিন্দি-ইংরেজি খিচুড়ি বুঝে যায় আর হাত-পা নেড়ে, অঙ্গভঙ্গি করে, হাফহিন্দি-হাফমাতৃভাষায় যা-যা-বলে, প্যাডে টুকে নিয়ে যখন রিপোর্ট জমা দিই, এগ্যানেজিং ডায়রেক্টর আগেকার কালের ব্রাহ্মণদের মতন সাধু সাধু বলে শাবাশি দ্যান। অবশ্য, ইংরেজিতে।

পশ্চিমবঙ্গের অ্যাসাইনমেন্ট পেলে তাই এড়িয়ে যাই। যদিও পশ্চিমবাংলায় থাকা-খাওয়া সস্তা বলে টিএ-ডিএ থেকে অনেক টাকা বাঁচিয়ে আনা যায়। কিন্তু কী আর করা। অপদার্থের বদনাম থেকে পদার্থের লোকসান সোয়াটা বেটার।

—বাঙালিরা বোধয় তোমায় বিলিভ করে না। বলেছিল সুবিমল, মানে সুবিমল বসাক, ও বছর তিরিশেক আছে পশ্চিমবঙ্গে, ঘুলেমিলে গেছে।

—আরে দিনাজপুরে আর মুর্শিদাবাদের গ্রাম তো দেখেছি বিহারি-অধ্যুষিত। যখন পার্টির কাজ করতুম, ওসব অঞ্চলে অনেক ঘুরেছি। আপনি ওসব জায়গায় ট্যুর নিচ্ছেন না কেন? বিশ্বজিত সেন উপদেশ দিয়েছিল।

বিশ্বজিত কম্যুনিস্ট বলে সুবিধা করতে পেরেছিল। আমার তো কোনো ইষ্ট নেই।

ঠাকুমা ছোটবেলায় বলতেন, ইষ্ট দুরকম হয় রে, যা চাই তা যামন ইষ্ট, তেমনি যা চাই না, তাও ইষ্ট। নইলে ইঁটকে ইষ্টক বলবে কেন, হরিমটরকে ইষ্টমালা বলবে কেন, বল?

আমি তো এটাও জানি না যে কালী, শিবঠাকুর, গুরুঠাকুর, যার নামই লোকে জপুক, মালাটাকে কেন হরিমটর বলে।

আমি দেখেছি মাদুলিকেও বলে ইষ্ট। কলকাতা থেকে যেসব ক্লার্ক আর জুনিয়ার অফিসার ট্রান্সফার হয়ে আসত, তারা মাদুলি আর মার্কস সঙ্গে আনত। তারপর ভাল ইষ্ট-খারাপ ইষ্টর মাঝখানে চটকে যেত।

কলকাতায় অনেককে দেখেছিলুম, টেরি ঈগলটন দিয়ে, ফ্রেডরিক জেমিসন দিয়ে চটকে যাচ্ছে। ফ্রেডরিক জেমিসনটা ওদের সেভাবে চটকাচ্ছে, ঠিক যেমন জব চার্ণকটা ওদের বাপ হয়ে চটকেছিল। টেরি ঈগলটানটাও তো একটা গাধা। মোল্লা নাসিরুদ্দিনের গাধা।

মোল্লার কথা মনে পড়ায় দাড়ির আইডিয়াটা এসেছিল। সুরজিৎ সেন মোল্লা নাসিরুদ্দিন নিয়ে গবেষণা করছে।ঔ ও বলছিল, মোল্লা নাসিরুদ্দিন নামে আদপে কেউ ছিল কি না ডাউটফুল। গল্পগুলো তুর্কির লোকেরা বানিয়েছিল। তুর্কিরা আসলে মোঙ্গোলিয়া থেকে গিয়ে জায়গাটা দখল করেছিল বলে লোকে ভাবে মোল্লা নাসিরুদ্দিনের দাড়িতে শিবাজী বাঁড়ুজ্জের মতন দশবারো গাছা তুলনামূলক চুল ছিল। আসলে মোল্লা নাসিরুদ্দিনের গল্প চারিয়ে লোকে অটোমান সাম্রাজ্যের আগের চুটকি-দাড়ি খলিফাদের আক্রমণ করত। সরাসরি আক্রমণ করলে তো খলিফাদের পার্টি পোঁদে বাঁশ করে দেবে। তাই দাও ধোলাই গল্প দিয়ে।

দশবারো গাছা হলেও মোল্লা নাসিরুদ্দিনের দাড়ি নিশ্চই ছিল। আর তার ছিল একটা সুপার-ইন্টালিজেন্ট গাধা। সোভিয়েত দেশে ভ্যালেনতিনিভিচ প্লেখানভের পর ঝানভ নামে এক সুপার-ইন্টালিজেন্ট গাধা ছিল যেমন, ঠিক তেমনি, হুবহু, অবিকল ব্রিটেনের অমন গাধা টেরি ঈগলটন আর ইউরোপের অমন গাধা ফ্রেডরিক জেমিসন। বাদামি হোক

বা শাদা, গাধারা চিরকাল গাধাদের দলে টানে। একটা গাধা চ্যাভোঁ-চ্যাভোঁ করলে অন্য গাধারাও চ্যাভোঁ-চ্যাভোঁ আরম্ভ করে দেবে।

মোল্লা নাসিরুদ্দিনের নিশ্চই দাড়ি ছিল। লেনিন আর স্ট্যালিনের যদি অমনধারা দাড়ি থাকত, তাহলে আজকে প্রথিবীর এ-দশা হত না।

গোপাল ভাঁড়েরও দাড়ি ছিল, জানেন তো? ওর হাওড়ার গ্রামে মুড়ি-নারকোল খেতে-খেতে সেদিন অরবিন্দ প্রধান বলল। ওর মতে গোপাল আসলে নাপিত ছিলেন তো, তাই উচ্চবর্ণের লোকেরা ওনার নামে ভাঁড় জুড়ে দিয়েছে; সুকুমার সেন তো অস্তিত্বই নাকচ করে বলেছেন যে আসলে গল্পগুলো রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পাশ্বচর দেহরক্ষী বাগবিদগদ্ধ শংকরতরঙ্গ মহাশয়ের তৈরি। বুঝুন ঠ্যালা অ্যাগবার। যে-গল্পগুলো কৃষ্ণচন্দ্রের এসট্যাবলিশমেন্টকে তুলে আছাড় দিচ্ছে, তাকে বলে কিনা গ্রাম্য আর অশ্লীল। আরে বাবা, সাবঅলটার্ন কাউন্টার-ডিসকোর্স অমন হবে না তো কি শহুরে আর শেকড়হীন ভাড়াটের ন্যাকাচিত্তির ফ্যান্তাফ্যাচাং হবে?

সাবঅলটার্ন বলে অরবিন্দ গর্বে টইটুম্বুর। বলে, আমি হলুম মাহিষ্য, বুঝলেন তো?

তা ঠিক। আমার যখন দাড়ি ছিল না, পশ্চিমবাংলায় অফিসের কাজে গ্রামেগঞ্জে গিয়ে কি গোলোকধাঁধাতেই না পড়েছি। যেমন অনেকটা এরকম।

— আপনার নাম তো নিমাজ খাঁ, তাই না? সেনসাস রিপোর্টে দেখছি এ-গাঁয়ে সাতাশটা পরিবার। আর কাউকে দেখছি না গাঁয়ে। ঘরদালান সব ফাঁকা। সবাই কোথায় গেছে বলুন তো? হোসেন মন্ডলের তেল-নুনের দোকান বন্ধ, ওর সামনের মাঠে মসজিদ তালাবন্ধ! চাষআবাদের কিছু খবরাখবর জানতে চাইছিলুম।

—কোনো কথা বলবনি বাবু। আরবারে এক বাবুকে বলার পর তিলডাঙার বাবুরা খুব মেরেছেল। দ্যাখেন, হাতে-পায়ে কালশিটে পড়ে গেছে। জমিন নাই। দুরে খাটতে যাই। সে-যাওয়াও বন্ধ করে দেছে। রোগজাড়ি হলে হাসপাতালেও যেতে দ্যায় না।

বাবু সম্বোধনে বুঝে গিয়েছিলুম আমার কিছু একটা নেই, যার দরুণ আমি সুব্রহ্মনিয়াম, তারাপুরকর, খান্নার মতন সফল হতে পারছি না। তবু, আরেক গাঁয়ে গিয়ে ভাবলুম এক মহিলার সঙ্গে কথা বলে দেখি, যদি চাষআবাদের তথ্যটথ্য পাই।

—আপনি তো ফরিদা....

— না-না-না-না, আমি কোনো কতা কইবোনি বাবু। আমার মেয়ে ঝুরি খাতুনকে ওরা টেনে লিয়ে যেতে চেয়েছেল। আমি বঁটি লিয়ে তেড়ে যেতে ওরা পালায়। পরে এসে মেয়েকে বেদম মারে। সেদিনকেই আমার কোল থেকে এই ছোট্ট ছ্যানাকে কেড়ে লিয়ে যায় বাঁকুড়ার জাংগালে। আমার জায়েরা গিয়ে ছাড়িয়ে আনে। তিন দিন পর ওরা এসে বলে তোর সোয়ামি ঘরে অস্তর লুক্কে রেকেচে। বের করে দে। আমি দিতে পারিনি। শুধু চাষির ঘরের নাঙল, কাস্তে আর হাতুড়ি দিয়ে দি।

— কাস্তে-হাতুড়ি দিয়ে দিলেন?

— আর তো কিছু ছিলনে। ওরা বললে বন্দুক আচে।আমরা গরিব। বন্দুক কোতায় পাব? ওরা শুনলেনি। নজরুল ঘুমোচ্ছেল। মাটি থেকে ওকে হ্যাঁচকা মেরে টেনে লিয়ে গেল। এবার আমি জায়েদের সঙ্গে লিয়ে বনের ধারে বাবুদের আপিসে গিয়ে পায়ে পড়ে কেঁদে ছাড়িয়ে লিয়ে এলাম ছ্যানাকে। বাবুরা বলে ওর বাপ ওন্নো দল করে। বংশ রাখা যাবেনি। নুনুখান কেটে লিবে। তাই বাপের বাড়ি পাইলে এসেচি।

এখন এসব কথাবার্তা থেকে কি আমন ধানের ক্রপিং ইনটেনসিটি ক্যালকুলেট করা যায়? বিঘা প্রতি ইনটারনাল রেট অব রিটার্ন হিসাব করা যায়? অপটিমাম কস্ট বের করা যায়? ল্যাসপেয়ার্স ইনডেক্স কষা যায়? কস্ট-আউটপুট রেশিও বের করা যায়? অথচ ভারত সরকার, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, আই এম এফ জানতে চাইছে।

ভাল হল যে সর্বজনীন ভাইরাল ফিভারে আমিও আক্রান্ত হলুম। টানা ছুটি। দাড়ি গজিয়ে গেল। হাত বুলিয়ে দাড়ি আদর করি।

এই ফাঁকে, মুখে তো অফুরন্ত হাই, ছেলেমেয়েকে ওদের ছোটবেলায় যে জুনিয়ার এনসাইক্লোপিডিয়া কিনে দিয়েছিলুম, তার ছবি দেখে টাইমপাস। হাই তুলতে-তুলে দাড়ি খুঁজি। নানারকম জ্ঞানবিজ্ঞানের দাড়ি।

গুরু নানকের দাড়ি ছিল। শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা।

থিরুভাল্লুভারের দাড়ি ছিল। তামিল ভাষার সন্ত কবি।

ছত্রপতি শিবাজির দাড়ি ছিল। মারাঠা শক্তির স্হাপক।

সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির দাড়ি ছিল। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান অব ক্যালকাটার প্রতিষ্ঠাতা।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের দাড়ি ছিল। অমিত্রাক্ষর ছন্দের উদ্ভাবক।

দাদাভাই নওরোজির দাড়ি ছিল। ব্রটিশ পার্লামেন্টে নির্বাচিত প্রথম ভারতীয়।

বিনোবা ভাবের দাড়ি ছিল। ভূদান আন্দোলনের হোতা।

জামশেদজি টাটার দাড়ি ছিল। ভারতবর্ষে ইস্পাতশিল্পের দিগদর্শক।

রবীন্দ্রনাথের দাড়ি ছিল। বাংলা সাহিত্যে একমাত্র নোবেল পুরস্কার বিজেতা।

যিশুখ্রিস্টের দাড়ি ছিল। ঈশ্বরের পুত্র।

কার্ল মার্কসের দাড়ি ছিল। মার্কসবাদের জনক।

আর্কিমিডিসের দাড়ি ছিল। ঘনত্ব মাপার প্রথম বিজ্ঞানী।

লিওনার্দো দা ভিঞ্চির দাড়ি ছিল। মোনালিসার চিত্রকর।

সিগমুন্ড ফ্রয়েডের দাড়ি ছিল। আধুনিক মনস্তত্বের পথপ্রদর্শক। হেরোডোটাসের দাড়ি ছিল। মানুষের সবরকম আবেগের নাট্যকার।

টমাস কার্লাইলের দাড়ি ছিল। ফরাসি বিপ্লবের লিপিকার।

কনফুসিয়াসের দাড়ি ছিল। চিনের প্রথম ধার্মিক ভাবুক।

মোজেসের দাড়ি ছিল। ঈশ্বরের দশটা নির্দেশ পেয়ে ইহুদি আইন বানিয়েছিলেন।

ফ্রান্সিস অব আসিসির দাড়ি ছিল। ফ্রানসিসকান ব্রাদারহুডের প্রবর্তক।

সক্রেটিসের দাড়ি ছিল। যুবসমাজকে নষ্ট করার তত্বের অভিভাবক।

প্ল্যাটোর দাড়ি ছিল। যিনি বলেছিলেন যে যা শুভ তা-ই জীবন।

অ্যারিস্টটলের দাড়ি ছিল। আলেকজান্ডারের শিক্ষক।

ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের দাড়ি ছিল। কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টোর যুগ্মলেখক আর দাস ক্যাপিটাল বইটার সম্পাদক।

অগুস্তে রোঁদার দাড়ি ছিল। ভাস্কর্যে আলোছায়া ধরে রাখার আবিষ্কর্তা।

জিওভানি পালেস্ত্রিনার দাড়ি ছিল। ইউরোপীয় রেনেসঁসের সংগীতকার।

পিটার চাইকভস্কির দাড়ি ছিল। সিমফনি কবিতা আর ব্যালে সংগীতের বিখ্যাত রুশ কমপোজার।

বইটার রঙিন ছবিগুলো দেখা শেষ করে তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলুম। হঠাৎ মনে পড়ল, আরে, ফিদেল কাস্ত্রোর তো দাড়ি আছে। ফিদেল কাস্ত্রো, চে গ্বেভারা ওনারা প্রথমে বিপ্লব করে একনায়ক উৎখাত করেছিলেন। বিপ্লব করার সময়ে ওনারা মার্কসবাদী ছিলেন না। বিপ্লব সফল হবার পর উচিত সরকসরি কাঠামো খুঁজতে-খুঁজতে ওনারা সমাজবাদী কাঠামোটাকেই সবচে ভাল মনে করেছিলেন। আগে ওনাদের দাড়ি বড় হয়েছে। পরে বিপ্লব। তারপর মার্কসবাদ।

রানি প্রথম এলিজাবেথ আর পিটার দি গ্রেট দাড়ির ওপর ট্যাক্স বসিয়েছিলেন। তবু লোকে দাড়ি রাখত।

তাই ঠিক করলুম যে দাড়িটা বাড়ছে বাড়ুক, আর কামাব না, শুধু ছাঁটব।

ফল হাতে-নাতে পেলুম।

অফিসে পা দিতেই অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার মীরা বেণুগোপালন বললে, হাই হ্যান্ডসাম, ইউ লুক মারিকাটারি, কিপ ইট, ডোন্ট শেভ, ইউ স্মেল লাইক অ্যাব্রাহাম লিংকন।

নারীরা এরকম পুরুষের গন্ধ নিয়ে চিন্তা করে কেন? জিগ্যেস করেছিলুম সুদক্ষিণাকে। সুদক্ষিণা চট্টোপাধ্যায়। বলতে পারেনি। বোধয় ওর কোনো পুরুষ সঙ্গীর গন্ধহীনতার কথা ভাবছিল।

ট্যুরে পশ্চিমবাংলায় গিয়ে প্রথঞ দিনেই টের পেলুম আমার দাড়িনন্দিত অবস্হাটা, যখন জেলার সরকারি অফিসাররা আমার সঙ্গে ইংরেজি আর হিন্দিতে কথা শুরু করল। আমিও ইংরেজি আর হিন্দি চালিয়ে গেলুম।

এ যে দেখি গাছে-গাছে ক্যানারি পাখি।

মাঠা-ঘাটে জেলে-তাঁতি-চাষিদের সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলি। চাষআবাদ নিয়ে প্রশ্ন করি। ওরা ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে কথা বলে। কিন্তু যা-যা জানতে চাই ঠিক-ঠিক উত্তর পাই। এক্কেবারে বলবনি-বলবনি করে না।

হাঃ হাঃ, কেউ বুঝতে পারে না আমি বাঙালি। যদি জানত যে আমি বাঙালি, তাহলে চেপে যেত। ভাবত আমি এই দল কিংবা ওই দলের। এই নেতার ছায়াতলে কিংবা ওই নেতার পদতলে। এই ঝান্ডার ডান্ডাতাড়িত কিংবা ওই ঝান্ডার ডান্ডা কবলিত। এই দাদফার অ্যালসেশিয়ান কিংবা ওই কমরেডের পমেরানিয়ান।

লোকে মাতৃভাষাকে যে এত ভয় পায়, তা তো দাড়ির জন্যেই বুঝতে পেরেছিলুম। দাড়িটা আমার সঙ্গে পার্মানেন্টলি থেকে গেল। এখন দাড়িটা কামিয়ে ফেলতে বলছে সবাই। চাকরি থেকে অবসর নিয়েছি বলে নয়। অবসর নিয়েছি বেশ ক'য়ছর আগে। আহমেদাবাদ যাচ্ছি বলে। আহমেদাবাদে দাঙ্গা শুরু হয়েছে। সবাই বলছে স্টেশানে নামতেই মুসলমান ভেবে কচুকাটা করবে। অজিত ভৌমিক বললে, আপনি তো সিনিয়র সিটিজেন, কনসেশান পাবেন, দাড়ি কামিয়ে বাই এয়ার চলে যান, এয়ারপোর্টটা গোলমাল এরিয়া থেকে দুরে, সাবরমতী নদীর ওপারে।

আমার ভারিভরকম শালি পাপা ওর বোনকে ওসকায়, তোরা করছিস কি, এই দাঙ্গার মাঝে কেউ যায়? দাঙ্গা থামুক, তারপর জামাইবাবুকে দাড়ি কামিয়ে নিয়ে যাবি; তুইও বোকার মতন চুড়িদার পরে যাসনি যেন, তার ওপর তুই সিঁদুর পরা ছেড়ে দিয়েছিস, কতবার বললুম এটা তোর মুম্বাই নয়।

আচ্ছা ঝামেলা।

আমাকে মুসলমান অবাঙালির অভিনয় করে কাজ চালাতে হয়েছিল। এখন আমার স্ত্রীকে হিন্দু বাঙালির অভিনয় করে কাজ চালাতে হবে।

নাঃ, দাড়িটা কামানো যাবে না। অন্তত আহমেদাবাদ থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত। আহমেদাবাদে আমি আর আমার স্ত্রী যাচ্ছি নাতনি মিহিকার প্রথম জন্মদিন উদযাপন করতে। দাঙ্গা হোক বা পাঙ্গা, যেতে আমাদের হবেই। বিয়ের সাত বছর পর মেয়ের বাচ্চা হল। এখন নাতনির জন্মদিনে ওর সঙ্গে গিয়ে একটু খেলব। সেই পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে যখন ছেলে-মেয়ে ছোট ছিল তখন যা খেলেছি। কতকাল হয়ে গেল বাচ্চাদের সঙ্গে খেলিনি। মহা ফ্যাসাদে ফেলে দিয়েছে গুজরাতিগুলো। ওরা তো গাছপাতা খায়। আমরা তো মাছখোর। তাহলে ওরা খুনখারাপিতে নেবে গেল কেন! আজ পর্যন্ত কোনো গুজরাতিকে তো পরমবীর চক্র পেতে শুনিনি। খুনোখুনিকে জনপ্রিয় করে তুলল কী করে! মুখ্যমন্ত্রী বলল আর দলে-দলে লোক সারা গুজরাত জুড়ে মুসলমানদের কচুকাটা করতে লাগল, তা কখনও হয় নাকি, যদি না খুনেরা অনেকদিন থেকে আটঘাট বেঁধে ষড় করে তোড়জোড় করে রাখে? আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তো রোজই বলছেন, 'এখনই করুন এখনই করুন এখনই করুন', কিন্তু কেউ কি শুনছে? পঁচিশ বছর ধরে আটঘাট বেঁধে ষড় করেছে যে কুটোটি নাড়বে না। মুখ্যমন্ত্রীর কথা দুকান দিয়ে শুনে পোঁদ দিয়ে বের করে দেয়।

ছোটকাকার সঙ্গে কোতরঙে দেখা করতে গিয়েছিলুম। তা উনিও বললেন, এখুন যাসনে, এখুন বানাসকাঁথা, সুরেন্দ্রনগর, রাজকোট, জামনগর, জুনাগড়, ভাগনগর, কচ্ছ, গান্ধিনগর, বুলসর, চান্দিকময় খুনোখুনি চলছে। তোর আবার দাড়ি রেয়েছে। তোর বউও শাঁখা-সিঁদুর পরে না। পরে যাসখন। দ্বারকাটাও ঘুরে আসতে পারবি। আমার হয়ে পুজো দিয়ে দিস। আমি গিসলুম বছর পঞ্চাশেক আগে। সোমনাথ মন্দির, শত্রুঞ্জয় পাহাড়ে জৈনমন্দির, উদওয়াড়ায় পার্সিদের অগ্নিমন্দির, মধেরায় সূর্যমন্দির, কতো জায়গায় গিসলুম। এখুন তো বাতে কাহিল হয়ে বাইরেও বেরোতে পারি না। তোর কাকিমাই সব কচ্চে।

আমি বললুম, কী আর দেখব ঘোড়াড্ডিম, সারা জীবন দেখে-দেখে হাল্লাক হয়ে গেলুম। এখন যাচ্ছি নাতনিকে দেখতে। ওর প্রথম জন্মদিন। কবে পটল তুলব তার ঠিক নেই। ওর সঙ্গে একটু খেলব। বাচ্চার আগডুম-বাগডুম ভাষায় কথা কইব।

যাক, ছোটকাকা অন্তত দাড়িটা কামাতে বললেন না। ঠাকুর্দার দাড়ি ছিল। উনিশ-শতকি রেনেসঁসি দাড়ি। ঠাকুর্দার বাবার দাড়ি ছিল। সুলতানি দাড়ি। আমার দাড়িটা তো গ্রো অ্যাজ ইউ লাইক।

হাওড়া থেকে একটাই ট্রেন, ৮০৩৪ হাওড়া-আহমেদাবাদ এক্সপ্রেস, রাতে আটটা কুড়িতে ছাড়ে, চুয়াল্লিশ ঘন্টার জার্নি। সকাল পাঁচটাতেই চলে এসেছিলুম, ছটা থেকে মোড়ে-মোড়ে অবরোধ আর বুকনিবাজির ঝুঠঝামেলা এড়াতে; কী একটা গণপ্রতিবাদ আছে যেন। সেকেন্ড এসি প্রায় ফাঁকা। বাঙালি যাত্রী বলতে একটা এনজিও দল। আর তিনজন গোপ্পুড়ে ভুঁড়িদাস গুজরাতি। মহিলা বলতে এনজিও দলে তিনটি উতল-হাওয়া যুবতী। গুজরাতিগুলো যেতে-আসতে

আমাদের উদ্দেশ্যে কাঁচাপাকা ভুরু কোঁচকাচ্ছে। আমার স্ত্রী ওর জার্নি-ড্রেস কালোকালো ফুল-আঁকা চুড়িদারই পরেছে। ওর চিরকেলে আশঙ্কা রাতে ঘুমোবার সময় শাড়ি কোথায় উঠে যাবে ঠিক নেই। কলেজে হকি খেলার সময় থেকে ট্রেনে চুড়িদার পরছে। অথচ হকি খেলত হাফপ্যান্ট পরে।

স্টেশানে ছাড়তে এসে শতদল দত্ত বলেছিল, সোজা আহমেদাবাদ না গিয়ে এখান থেকে বম্বে, মানে মুম্বাই, তারপর দুচার দিন মুম্বাইতে কাটিয়ে ওখান থেকে আহমেদাবাদ যেতে পারতেন। সেরকম বুঝলে মুম্বাইতে দাড়িটা কামিয়ে তারপর রওনা দিতেন। আপনার ছেলে মুম্বাইতে আছে, অসুবিধার স্কোপ নেই। অবশ্য এই ট্রেনে যেতে-যেতেই তো হাওয়া বুঝতে পারবেন। রাস্তায় বোধয় গোধরা পড়ে। বেগতিক বুঝলে ট্রেনেই দাড়িটা কামিয়ে নেবেন। বউদিও সিঁদুর-টিদুর পরে নেবেন।

ওকে বলেছিলুম যে শেভিংসেট চাকরি করার টাইমে সান্টাক্রুজে ফেলে দিয়েছিলুম। আর সিঁদুর কারোর বাড়িতে কেউ পরিয়ে না দিলে তোমার বউদি পরে না।

শতদল বলেছিল, লিপ্সটিক আছে তো? তাই দিয়ে সিঁদুর পরে নেবেন।

গুজরাতে ট্রেন ঢুকতে, সুরাত ছাড়ার পর এনজিও দলের এক যুবতী আর এক প্রৌঢ় এলেন আমাদের সঙ্গে গপপো করতে। কোথায় থাকি, কেন যাচ্ছি, কোথায় চাকরি করি ইত্যাদি জানার পর মেয়েটি বলল, আংকল, আমাদের গাড়ি আসবে স্টেশানে, আপনি বলবেন, আমরা সেফলি পৌঁছে দেব, রায়ট অ্যাফেক্টেড এরিয়াগুলোর ম্যাপ আমাদের কাছে আছে।

বুঝলুম ওরা প্যাসেঞ্জার চার্টটায় চোখ বুলিয়ে আমাদের কাছে এসেছে। প্রত্যেক বারই দেখি প্যাসেঞ্জার চার্টে সলিলার নামটা ইংরেজি আর হিন্দিতে শাকিলা টাইপ করে দ্যায়। নামের সঙ্গে চেহারার মিল খুঁজে পেয়েছে।

ধন্যবাদ জানিয়ে বললুম যে আমার জামাই ওর গাড়ি নিয়ে স্টেশানে আসবে। সলিলা যে শাকিলা হয়ে গেছে সে ভুলটা ভাঙিয়ে ওদের লজ্জায় ফেলা অনুচিত মনে হল।

দুপুরে ভারুচে গপপো করতে এলেন তিন গুজরাতির একজন। আমার সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহের পর আমার মেয়ে-জামাইয়ের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করলেন। দুটো কার্ড দিলেন, ওনার দুটো দোকানের, একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, অন্যটা বাচ্চাদের পোশাকের । মালিকের নামে স্পষ্ট যে উনি সিন্ধি। দেশভাগে প্রচুর সিন্ধি গুজরাতে চলে এসেছিল। টাকা রোজগার ছাড়া ওরা আর কিছু ভাবার বিশেষ সময় পায় না।ইনি ট্রেনেতেও প্রসপেকটিভ খদ্দে খুঁজছেন।

একটু পরে আবার ফিরে এলেন, আধুলির মাপের ছোট্ট প্লাসটিক ডিবে নিয়ে। খুলে, আমি ব্যাপারটা বুঝে ওঠার আগেই, গুঁড়োটা দিয়ে আমার কপালে তেলক কেটে দিলেন। বললেন, এটা আনহার্মফুল রেড কালার। আপনার দাড়ির জন্যে গোলমাল ফেস করতে হতে পারে বলে লাগিয়ে দিলুম। দাড়ি-তিলক মানে শিবসেনা। আমার কাছে খদ্দেরের ধর্ম গুরুত্বহীন। দাড়ি থাকলে হিন্দু এরিয়ায় তেলক কেটে বেরোন আর মুসলমান এরিয়ায় মুছে ফেলুন, ব্যাস কৌটোটা রেখে নিন।

উনি যেতে সিটের নিচে রেখে দিলুম বস্তুটা।

চারটে নাগাদ আহমেদাবাদ পৌঁছোলুম। খিদে পেয়ে গিয়েছিল। যা খাবার সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিলুম সবই বরোদার আগে ফুরিয়ে গিয়েছিল। অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টির পরে বাইরের খাবার খাই না।

স্টেশানে নামতেই মেয়ে-জামাই ছুটে এল। মেয়ে অনুশ্রী বলল, কী করেছ কী, কপালে সিঁদুর লাগিয়ে ধর্মকর্ম শুরু করলে নাকি! ছিঃ।

মনে পড়তে পুঁছে ফেললুম রুমাল দিয়ে। ওদের বললুম ঘটনাটা। কার্ড দুটো নিয়ে জামাই প্রশান্ত বলল, আরে এরা তো মহাচোর, সব জিনিসের বেশি-বেশি দাম নেয়।

সলিলা খোঁজখবর করতে প্রশান্ত বলল, দাঙ্গার জন্যে মাছমাংস খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে আমাদের। সব তু মুসলিম এরিয়ায় পাওয়া যায়। ফলের মার্কেটও ওদিকে। মিহিকার বেশ অসুবিধা হচ্ছে। কলা খেতে শিখেছে। আপেল সেদ্ধ করে দিলে খায়। আমরা একেবারে ফোর্সড গুজরাতি লাইফ লিড করছি। এবলা ঘাসপাতা, ওবলা ঘাসপাতা।

অনুশ্রী বলল, যাক, দাড়িটা কামাওনি। আমার তো চিন্তা হচ্ছিল যে শেষে ভয়ে কামিয়েই ফেললে বুঝি। টেলিফোনে তোমায় বলেছিলুম তো যে মিহিকার চুল ঘাঁটতে খুব ভাল্লাগে। প্রথম জন্মদিনে দাদুর দাড়ি নিয়ে খেলতে না পারলে তো ওর মন খারাপ হয়ে যেত।

বসন্ত উৎসব

শাক্যজিৎ ভট্টাচার্য

ছেঁড়া মেঘের প্যাতপ্যাতে পাপড়িটা পূর্ণিমার চাঁদকে আড়াল করে দিলে গিরিরাজ আকাশের দিকে তাকিয়ে মুখ হাঁ করে নিঃশ্বাস নিল একবার। এই শালার গরম-- কাদার মত নোংরা জল শরীর বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে । জ্যোৎস্নায় নয়, যেন ঘামে ভিজে আছে সমগ্র চরাচর । কবরখানার পাশের ভুতুড়ে নিমগাছের গা থেকে টুপ করে এককোঁটা ঘাম ঝরে পড়ল, এবং গিরিরাজ দ্বিতীয়বার খাবি খাওয়ার মত করে নিঃশ্বাস নিল। অল্প বাতাসটুকু বড় অমূল্য এখন।

কেশব, সীতাপ্রসাদ আর ত্রিপাঠীজি একটু এগিয়ে গেছে। গিরিরাজ বাঁশের লাঠি ঠুকতে ঠুকতে পা চালাল। এই সময়টায় একটা দুটো করে সাপ বেরয়। শালারা বহুত হারামি। ঝোপঝাড় জঙ্গলের মধ্যে গা লুকিয়ে এমনভাবে ঘাপটি মেরে থাকবে যে রামজির বাপের সাধ্য নেই চার চোখ দিয়ে দেখতে পায়। কিন্তু একবার গায়ে পা পড়ুক, ছুবলিয়ে বিষ ছলকে দেবে মাথা অবদি। গোটা মগজে তখন সবুজ হলুদ গেরুয়া নেশা। ঘোর লেগে যাবে, ঘুম পাবে, লোপ পাবে বোধবুদ্ধি। গলার তালু শুকিয়ে কাঠ। সারা শরীরে সেই বিষ ছড়িয়ে যেতে খুব বেশি হলে আধবেলা।

ত্রিপাঠীজি পেছনে মুখ ঘুরিয়ে টর্চের আলো ফেলে হাঁক দিলেন "রাস্তায় খানা খন্দ আছে। দেখে ভাইলোগ"।

"একটু থামলে হত ত্রিপাঠীজি। একটা বিড়ি ধরিয়ে নিই। রাত তো গোটাটাই পড়ে আছে"। কেশব বলল।

ত্রিপাঠীজি এই চারজনের মধ্যে সবথেকে বয়স্ক। ব্রাহ্মণ, প্রাজ্ঞ, এবং একটু আধটু লেখাপড়া জানেন বলে স্বাভাবিক নেতৃত্ব তাঁকেই দিয়ে এসেছে বাকি তিনজন। এমনকি গত বছরের সেই সব রাতগুলোতেও গিরিরাজরা কাজ শুরু করবার আগে ত্রিপাঠীজিকে একবার করে প্রণাম ঠুকে নিত, "আপনার কৃপা গুরুজি"।

মোটা গোঁফে চাড় দিয়ে রাক্ষসের মত হা হা হেসে ত্রিপাঠীজি উত্তর দিতেন "মেরা নাহি, রামজিকা কৃপা হ্যায় বাচ্চে। কাজে লেগে পড়ো"।

পরিত্যক্ত কবরখানার ভাঙ্গা দেওয়ালে হেলান দিয়ে গিরিরাজ বিড়ি খেতে খেতে চারপাশটা জরিপ করে নিল একবার । আগের থেকে অনেক বেশি জরাজীর্ন লাগছে জায়গাটা। অবশ্য সেটা স্বাভাবিক। রক্ষণাবেক্ষণ তো আর হয়নি গত এক বছরে! চারিপাশে ছাতামাথা বন্য গাছের দল নুয়ে পড়েছে। জমাট বাঁধা অন্ধকারের মধ্যে গাছের দলকে আলাদা করে আর বোঝা যাচ্ছে না, বরং সবশুদ্ধ তালগোল পাকিয়ে একটা জগাখিচুড়ি লাগছে। পাঁচিল ফাটিয়ে উঠে এসেছে অশ্বত্থের চারা। লণ্ডভণ্ড কবরগুলোর ওপরে বুনোঝোপের আড্ডা। হাঁটতে গেলে জঙ্গুলে শেকড় পা জড়িয়ে ধরে। মেঘ কেটে চাঁদের আলো পিছলে গেলে মনে হবে ফ্যাটফ্যাটে সাদা জংগল সমগ্র জায়গাটার দখল নিয়ে নিচ্ছে। গিরিরাজের আচমকা মনে হল, জঙ্গল আস্তে আস্তে তাদেরও হয়ত ঘিরে ধরছে। আর এখান থেকে বেরোবার পথ নেই। দুম করে বুকটা একটু কেঁপে গেল। তারপর আত্মসচেতন হয়ে ফালতু চিন্তা ঝেড়ে ফেলবার জন্য বিড়িতে জোরে জোরে টান দিয়ে মাথা ঝাঁকাল কয়েকবার। আজকের রাতে মগজ স্থির রাখা খুব জরুরি।

কেশব মৃদু খোঁচা দিল সীতাপ্রসাদকে, "কী রে তুই এত চুপচাপ কেন আজ?"

সীতাপ্রসাদ এদের মধ্যে সবথেকে বাচ্চা। এখনো গোঁফের রেখা ফোটেনি ভাল করে। সে একটু অস্বস্তির সঙ্গে মাথা ঝাঁকাল, "সেই বাচ্চাটা, এখানেও ধাওয়া করছে।"

গিরিরাজ সচকিত হল, "কোথায়?"

"দক্ষিণের তেঁতুলগাছের নিচে তাকাও"।

আজ বেশ কিছুক্ষণ হল একটা কচি বাচ্চা তাদের পেছন পেছন আসছে। একটু দূরত্ব রেখে, কাছাকাছি ঘেঁষছে না। ওরা প্রথমে ভেবেছিল ভিক্ষে চায়। কেশব তাড়াও করেছিল বার দুয়েক। পালিয়ে গেছে তখন। কিন্তু একটু দূর থেকে পিছু নিয়েছে আবার। গিরিরাজ দেখল, একটা ছায়ার মত দাঁড়িয়ে আছে গাছের নিচে। নিস্পন্দ।

" ডুমারি গাঁও-এর রামদুলারির ছেলেটা না?" ত্রিপাঠীজি পোড়া বিড়িটা ছুঁড়ে দিয়ে প্রশ্ন করলেন।

"অন্ধকারে বুঝতে পারছি না ভাল। তবে এত ছোট বাচ্চা এত রাতে বাইরে কী করছে?"

"ছেড়ে দাও। পাত্তা দিও না বেশি। একটু পর নিজেই চলে যাবে। কাল রামদুলারির মরদটাকে গিয়ে কড়কে দিয়ে এসো। বাড়ির জেনানা-বালবাচ্চা-গরু-ছাগলদের হদিশ রাখবে না, রাতবিরেতে বাইরে ফেলে রাখবে, এরকম অলাইছত্র অবস্থায় সংসার চলবে? পরশুও রামদুলারিকে অনেক রাতের বেলা আমি মুদির দোকানে হেসে হেসে ঢলানিপনা করতে দেখেছি। শালি ঢেমনি মাগি! কোলের বাচ্চাটার পর্যন্ত খেয়াল রাখে না।"

কেশব জোরে শেষ টান দিয়ে মাটিতে ঘষে বিড়ি নেভাল, "ডুমারির ওই ওদের আর কয় ঘর বাকি আছে?"

"সত্তর মত ছিল। এখন পাঁচ ছয়খানা। সেগুলোও যাবে। বাকিরা সব টাউনের রিফিউজি ক্যাম্পে।"

ত্রিপাঠীজি অসন্তুষ্টভাবে মাথা নাড়লেন। "এখনো পাঁচ ছয় ঘর কীভাবে থাকে? ভোটার লিস্ট বার করে দেখো। কোথায় কী কী করা উচিত ছিল আর করা গেল না। পঞ্চায়েতের আগে প্রভুজিকে হিসেব দিতে হবে। কথা ছিল আশপাশের পাঁচখানা গাঁও থেকে ইঁদুর মারবার মত করে ফাঁকা করে দেওয়া হবে। এত দেরি হচ্ছে কেন?"

"আপনি জানেন ত্রিপাঠীজি। আমি জেলে ছিলাম। কেশব গোরখপুর পালিয়ে গেল। "গিরিরাজ কাঁধের গামছা দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। "নিউজপেপার, টিভি, অপোনেন্ট পার্টি, সব তখন আমাদের পেছনে। আপনি তো টাউনে ছিলেন। আমরা আর একা হাতে কত কী সামলাব?"

"এটা অজুহাত হল গিরিরাজ। আজ যদি এই কাজগুলো তোমরা ঠিকঠাক করে সেরে ফেলতে তাহলে আমাদের তিনখানা তাজা ছেলে এখনও বেঁচে থাকত। লোহা গরম ছিল, পিটিয়ে ঘা মারতে পারলে রাজেশ, শ্যাম আর হরিয়াকে এভাবে বেঘোরে প্রাণ দিতে হত না"।

"হরিয়া ডাকাত ছিল। ওর দলের লোকদের সঙ্গে বখরার গণ্ডগোল লেগেছিল"। কেশব বলল।

"বেশ, যদি হরিয়াকে মেরে থাকে ওর দলের লোকেরা, বাকিদের কী হল? এর থেকে তো ভাবা সহজ যে সকলকেই ওরাই খুন করেছে ।" একটু চুপ করে থেকে ত্রিপাঠীজি যোগ করলেন "না করলেও, এটা ভেবে নিলে তো অনেক ঝামেলার সমাধান হয়ে যায়!"

আকস্মিক এক ঝাপটা হাওয়া কোথা থেকে কয়েকটা শুকনো পাতা উড়িয়ে এনে ফেলল তাদের ওপর। এক ঝাঁক ধুলো চাবুকের মত আছড়ে পড়ল চোখে মুখে । গিরিরাজ কয়েকটা খিস্তি করে চোখ চুলকোতে লাগল। কেশব মাথা উঁচু করে দেখল, ছেঁড়াখোঁড়া চাদরের মধ্যে দিয়ে টুকরো টুকরো চাঁদ উঁকি মারছে, আর তার আলো আশেপাশের মেঘের সীমানার ওপর ঠিকরে পড়ে কেমন রহস্যময় লাগছে। সে হাতের শাবলখানা শক্ত করে চেপে ধরল। আজ যদি কেউ ধরা পড়ে, মাথা ফাঁক করে দেবে এক কোপে, ঠিক যেমন গত বছর মইদুলকে করেছিল।

একটুক্ষণ সকলে চুপচাপ হাঁটল। রাত আরো কিছুটা জমাট হচ্ছিল। লাঠি দিয়ে সীতাপ্রসাদ ছপাং ছপাং করে ঝোপের গায়ে মারল কয়েকবার। একটা ভ্যাবাচ্যাকা পাখি ঘুম ভেঙে উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে। কবরখানার পশ্চিম প্রান্তে এসে ত্রিপাঠীজি নীরবতা ভাংলেন, "এখানে বসা যাক। এখান থেকে গোটা জায়গাটা নজরে রাখা যাবে"।

গিরিরাজ বিড়ির প্যাকেট বার করে সকলকে দিল। কেউ বিশেষ কথা বলছিল না। একটা গরম ভাপ উঠে আসছিল আগাছা ঢাকা মাটির গা থেকে। সারি সারি পরিত্যক্ত কবরের ওপর একটা হালকা উষ্ণতার চাদর বিছিয়ে দিচ্ছিল সেই ভাপ। অন্ধকার ভেঙে হঠাৎ ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে বিশ্রি শব্দে একটা রাতপাখি ডেকে উঠল। আর তখন, একটু যেন কাঁপা গলাতেই সীতাপ্রসাদ বলে উঠল "আমার ভয় করছে"।

সকলে চমকে তাকাল তার দিকে। আসলে ভয় যে সবার করছিল, কিন্তু বলতে পারছিল না কেউ, সেই অনুভূতিটাকেই কেউ যেন দুম করে বাইরে এনে ফেলেছে। এবার সেটুকু অস্বস্তি চাপা দেবার জন্য প্রায় রূঢ়কণ্ঠে ত্রিপাঠীজি বলে উঠলেন "কীসের ভয়? মেয়েছেলের মত কথা বলছিস কেন?"

সীতাপ্রসাদ দুই হাত দিয়ে নিজের মুখ চাপা দিল। "দশ তারিখ গেল রাজেশ। বারো তারিখে হরিয়া। পনেরোতে শ্যাম। আমার ভয় করছে ত্রিপাঠীজি। এবার আমাদের পালা"।

"বাজে কথা বলিস না", এবার প্রায় জোর করেই ধমকে উঠল কেশব। "রাজেশদের বার বার বলা হয়েছে সাবধানে থাকতে। প্রভুজি পর্যন্ত খবর পাঠিয়েছেন যেন কয়েকদিন লুকিয়ে থাকে। তা না করে বুক ফুলিয়ে মন্দির, ক্লাব, পার্টি অফিস সব জায়গাতে ঘুরছে। থানাতে বসে বসে কনস্টেবলের সাথে খৈনি ডলছে। ওদের বাঁচাবে কে? মরেছে নিজের দোষে।"

সীতাপ্রসাদ একটু চুপ করে থাকল। তারপর আবার বলল "আর কীভাবে মরেছে? সেটা দেখবে না?"

"কীভাবে? তিনজনেই এখানে পড়ে ছিল। এই কবরখানায়। তাতে হলটা কী?"

"উঁহু, শুধু সেটাই নয়। রাজেশ পড়েছিল বেলঘাটের সেই লাশটার কবরের ওপর। সেই--মনে আছে? হরিয়াকে আমি দেখিনি, টাউন গেছিলাম। কিন্তু শ্যামকে আলবিনার কবরের ওপর শোয়ানো ছিল, নিজে দেখেছি"। সীতাপ্রসাদের গলা আবার কাঁপতে থাকল, "আমাদেরও ছাড়বে না ওরা। ত্রিপাঠীজি, আমরা সবাই মরব"।

ত্রিপাঠীজি শক্ত করে সীতাপ্রসাদের কাঁধ চেপে ধরলেন, "যারা মেরেছে তারা সব ওদের গুণ্ডা। এই কয়েক রাত নাইট-গার্ড দেওয়া কি এমনি এমনি নাকি? ওরা সব আশেপাশেই লুকিয়ে আছে। ধরা পড়বেই। টাউন পার্টি অফিসের অর্ডার আছে, যত জলদি পারা যায় ধরতে হবে। এবার আর ভুল করা চলবে না সীতাপ্রসাদ," ত্রিপাঠীজির গলার স্বর কঠিন হয়ে উঠল, মুখ শক্ত, কপালের ডান দিকে একটা শিরা দপদপ করছে, "সব কটা শুওরকে জ্বালিয়ে ফেলতে হবে। জিন্দা। যাতে আমাদের ছেলেদের গায়ে আর হাত তোলবার সাহসটুকু না করতে পারে"।

গিরিরাজ ভুরু কুঁচকে সীতাপ্রসাদের দিকে তাকাল। কিছু যেন বলতে চাইছে ছেলেটা, কিন্তু বলতে সাহস পাচ্ছে না। ভয় পেয়েছে বেশ বোঝা যাচ্ছে। বার বার ঢোঁক গিলছে, কপালের ঘাম মুছছে। কিন্তু শুধু ভয় না, কিছু একটা যেন লুকিয়ে আছে সীতাপ্রসাদের কথাগুলোর মধ্যে। মাথাটা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। "সীতা, এখানে চারজন জোয়ানমদ্দ লোক অস্ত্র হাতে বসে আছে। রাজেশদের খুনিরা এখানেই লুকিয়ে আছে আমরা সকলে জানি কারণ লাশগুলো এখানেই পাওয়া গিয়েছিল। তোর কী মনে হয় যে আমাদের চারজনকে একসঙ্গে কাবু করতে পারবে কেউ? এত ভয় পাচ্ছিস কেন?"

কেশব পাজামার কষি আলগা করে রামের পাইট বার করল। এক ঢোঁক নিজের গলায় ঢেলে বাড়িয়ে ধরল সীতাপ্রসাদের দিকে "নে, নিট মেরে দে। বুকে বল আসবে"।

সীতাপ্রসাদ একটা ঢোঁক খেয়ে মুখ বিকৃত করল। চোয়ালের কষ বেয়ে মদ গড়িয়ে পড়ছে। হাত দিয়ে মুছে পালটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল ত্রিপাঠীজির দিকে "রাজেশের গলা দেখেছিলেন গুরুজি? ছুরি দিয়ে কাটা নয়। ছুরি ভোজালি আমরাও চালিয়েছি। এরকম ছিঁড়ে খুঁড়ে যায় না । মনে হচ্ছিল, রাজেশ আর শ্যামের গলা কেউ যেন বাঘনখ দিয়ে ফালা ফালা করে দিয়েছে।"

ত্রিপাঠীজি চোখ সরু করলেন "তুমি বলতে চাইছটা কী?"

"ওদের কোনও ফালতু গুণ্ডা খুন করেনি গুরুজি। খুন করেছে এমন কেউ যে প্রতিশোধ নিয়েছে আমাদের ওপর । আমাদের গত বছরের কাজের জন্য। সেই কারণে ওদের বডিগুলো এখানে এই কবরের ওপর রাখা ছিল"।

চারজন একে ওপরের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল। যেন বুঝতে পারছে না কী বলবে। আর একখণ্ড কালো মেঘ এসে চাঁদটাকে তখন আড়াল করে দিল। অন্ধকারে ঢেকে গেল চরাচর। কেউ কারোর মুখ দেখতে পাচ্ছিল না কিন্তু বুঝতে পারছিল একটা অনির্দিষ্ট ভয় সকলকে আস্তে আস্তে ঘিরে ধরছে।

গিরিরাজ ফিসফিস করে বলল, "কারা?"

"জানি না", অস্থির সীতাপ্রসাদ মাথার চুল খামচে ধরল। "কিন্তু গত বছরের সব কটা ঘটনা পর পর খেয়াল করে দেখো। মে মাসে প্রভুজির হুকুম আসল। আমরা ত্রিশূল নিয়ে গ্রাম ঘুরে ঘুরে কবরখানায় হামলা চালালাম। এখানে, ঠিক এই জায়গাতে," সীতাপ্রসাদ এলোমেলো হাত চালাল চারপাশে, "এখানে আমাদের গোটা দল এসে কবরগুলো একটার পর একটা খুঁড়লাম। এমনকি পচে গলে যাওয়া বডিগুলোকেও ছাড়িনি । যেসব জেনানারা কংকাল হয়ে গিয়েছিল তাদের বাদ দিলাম শুধু। তারপর কাজ হয়ে গেলে লাশগুলো সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখলাম যাতে সকলে দেখতে পায়। পরদিন থেকে টেনশন শুরু হল। বলা হল ওরা অ্যাটাক করবে, তাই পার্টি অফিস থেকে রাত্রিবেলা তলোয়ার আর ত্রিশূল বিলি হল। আমরা হামলা চালালাম। খুনখামারি যা হবার তা তো হল, ওদের সবাই চলে গেল রিফিউজি ক্যাম্পে। সব কিছুই জুন মাসের মধ্যে মিটে গেছে। ভোটার লিস্ট চেক করে দেখো, যে কয়খানা ঘর এখনো টিকে আছে তাদের একটাতেও কোনো জোয়ান মদ্দ নেই। আগাছা সাফ করে দেবার মত উপড়ে ফেলেছি। তাহলে এতদিন বাদে এই মার্চ মাসে এমন কাজ করল কে? কে এমনভাবে খুন করল তিনজনকে? আশেপাশের গাঁও গুলোর কেউ নয় কারণ এই কাজ করবার জন্য গায়ের যা শক্তি লাগে তা ওই কয়েকঘর বুড়োহাবড়াদের মধ্যে নেই। আর এমনভাবে বডিগুলো

সাজিয়ে রাখল ঠিক যেভাবে আমরা ঐ লাশগুলোকে সাজিয়ে রেখেছিলাম।"

"তার মানে?" ত্রিপাঠীজি অধৈর্য স্বরে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন।

সীতাপ্রসাদ চুপ করে থাকে। গিরিরাজ এক ঢোঁক মদ খেল । গলা বুক জ্বলছে। তারপর সীতাপ্রসাদের দিকে স্থির দৃষ্টি মেলে কাটা কাটা স্বরে উত্তর দিল "মানে এটাই যে আমাদের ছেলেদের খুন করেছে এমন কেউ যে টাউন থেকে এসেছে। আর সে লুকিয়ে আছে এখানেই। সে প্রতিশোধ নিচ্ছে আমাদের আগের বছরের কাজের। একে একে আমাদের সকলের ওপর নেবে। কিন্তু তাকে আমরা চিনি না বলে ধরাটা এত সহজ নয়।"

ত্রিপাঠীজি মোটা গোঁফ চোমড়াতে থাকলেন। সীতাপ্রসাদের মুখ বুকের ওপর ঝুলে পড়েছে, যেন ঘুমোচ্ছে। কেশব অস্বস্তিভরে হাতের শাবলটা ঘোরাতে থাকল। ত্রিপাঠীজি একটু বাদে বলে উঠলেন "ভয় পেলে চলবে না। রামজি ভরসা। যদি সত্যিই এমন হয়ে থাকে, তাহলে আবার চিরুনি তল্লাশি চালাতে হবে ঘরে ঘরে। যে ঘরে লুকিয়ে থাকবে, সে হিন্দু হোক কি মুসলিম, কেটে ফেলতে হবে সবাইকে। ত্রিশূলকে যারা ভয় না পাবে, তাদের ছেড়ে রাখলে একদিন ওই ত্রিশূল নিয়েই আমাদের ওপর ঝাঁপাবে।"

কেশব মদের বোতল ঠক করে সামনের মাটির ওপর রেখে বলল "এভাবে রাত্রিবেলা নাইটগার্ড দিয়ে আসল লোককে ধরা যাবে না ত্রিপাঠীজি। আমাদের জোট বেঁধে থাকতে দেখে সে গা ঢাকা দিয়েছে এতক্ষণে। সীতার কথা সত্যি হলে আমাদের একা থাকার সময় হামলা করবে"।

গিরিরাজ হাত রাখল সীতার কাঁধে "তুই এত নিশ্চিত হয়ে বলছিস কী করে? দেখেছিস কাউকে?"

সীতা মুখ তুলে তাকাল, "আমাদের চোখে চোখে রাখছে। আরো একজন জড়ো হয়েছে।"

"অ্যাঁ? কী বলছিসটা কী?"

"এখন দুটো বাচ্চা। তেঁতুলগাছের দিকে তাকাও"।

সকলে ঘুরে দেখল, দুখানা ছায়ামুর্তি নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে আছে গাছের তলায়।

"ঝোপেঝাড়ে বাঘ দেখিস না সীতা। তিন চার বছরের দুটো বাচ্চা, তারা আমাদের ওপর নজর রাখবে? আর ওটা তো রামদুলারির ছানা!"

সীতাপ্রসাদ মনে হয় অনেকটা মদ খেয়ে নিয়েছিল। গোঙানো স্বরে বলল, "বাচ্চা? বাচ্চা তো হয়েছেটা কী, অ্যাঁ? প্রভুজি বলেনি, যে পেটের বাচ্চাকেও গেঁথে ফেলতে হবে? ওরা হল ইঁদুরের জাত, একবার ছেড়ে রাখলেই পিলপিল করে সমস্ত জায়গা ভরিয়ে দেবে। প্রভুজি বলেছে, যেখানে শুয়োরদের পাবে দশেরা করে দাও। বাচ্চা তো কী?"

গিরিরাজ হতাশভাবে ত্রিপাঠীজির দিকে তাকাল, "এ শালার নেশা হয়ে গেছে"।

ত্রিপাঠীজি হঠাৎ রেগে চেঁচিয়ে উঠলেন "চোপরাও ! অনেকক্ষণ থেকে শুনছি এই হয়েছে ওই হয়েছে। এত ভয় যখন তখন এসেছিল কেন সব? এরা সব রামজির সেনা হবে? মেয়েছেলের কলিজা নিয়ে ধর্মযুদ্ধে যাবে ভেবেছে?" বোতলটা নিয়ে গলার মধ্যে এক ঢোঁকে অনেকটা খেয়ে নিয়ে ধকধকে চোখে সবার দিকে তাকালেন। হিংস্র ভঙ্গি তে বললেন "কবর থেকে লাশ তুলে আমি রেপ করেছি সীতাপ্রসাদ। দাঙ্গার সময় পোয়াতি মেয়ের পেট চিরে শিশুকে বার করে এনেছি ত্রিশূলের ডগায়। কোনো শুয়োরের বাচ্চা আমার একটা চুলও বাঁকা করতে পারবে না। যারা ভয় পেয়ে দল ছেড়ে দিচ্ছে, তারা চলে যাক। আমি একাই সামলাব দশ শুয়োরকে।"

সীতাপ্রসাদ অদ্ভুতভাবে হাসল। তারপর বলল , "আপনার মনে আছে গুরুজি, আমরা কাকে কাকে রেপ করেছিলাম?"

ত্রিপাঠীজি উত্তর না দিয়ে হিংস্রভাবে গোঁফ পাকাতে থাকলেন।

"হরিজনপুরের একটা মেয়ের লাশ দুদিন আগে এখানে এসেছিল। তাকে নিয়েছিলাম আমি। যেহেতু আমি সবার থেকে বাচ্চা ছিলাম, আর সেটাই আমার প্রথমবার ছিল, আপনি আমাকে সবথেকে ভাল বডিটা দিয়েছিলেন। রাজেশ ছিল আমার পাশেই। ও নিয়েছিল বেলঘাটের মেয়েটার লাশ। লাশটার বডি পচে ঢোল হয়ে গিয়েছিল কিন্তু মুখটা জুঁই ফুলের মত টুলটুলে সুন্দর ছিল তখনো। মনে আছে কেশবভাই? তুমি সেটা নিয়ে মশকরা করেছিলে। শ্যাম নিল আলবিনাকে। আমাদের গাঁও-এর মেয়ে, জণ্ডিসে মরেছিল কিছুদিন আগে। গুরুজি, আপনি কাকে নিয়েছিলেন?"

ত্রিপাঠীজি ঠাস করে একটা চড় মারলেন সীতাপ্রসাদের গলায়। ভাঙা পুতুলের মত টলমল করে উঠল তার মাথা। চিবিয়ে চিবিয়ে ত্রিপাঠীজি হিসহিস করে উঠলেন "অনেকক্ষণ বেয়াদপি সহ্য করছি"।

"রাজেশ পড়েছিল বেলঘাটের কবরের ওপর। শ্যাম--আলবিনার ওপর। তাহলে হিসেব বলছে আমি থাকব হরিজনপুরের কবরের ওপর। আপনি কার ওপর থাকবেন গুরুজি?"

গিরিরাজ সীতাপ্রসাদের মুখ হাত দিয়ে চেপে ধরল " চুপ কর হারামজাদা! কাকে কী বলছিস?"

কেশব হঠাৎ হাত তুলে ভয়খাওয়া গলায় চেঁচিয়ে উঠল "আরো দুটো বাচ্চা!"

দুখানা নয়, আরো তিনজন বাচ্চা এসে জড়ো হয়েছে। রাত্রির অন্ধকারে এবং আবছা চাঁদের আলোর কাটাকুটি খেলায় তারা মাঝে মাঝে মিশে যাচ্ছে অন্ধকার গাছের গায়ে। আবার যখন মেঘ সরে যাচ্ছে তখন পাঁচখানা ছোট্ট মূর্তিকে দেখা যাচ্ছে । পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছে পাহারা দেবার ভঙ্গি তে। কিন্তু প্রাণ আছে সেটুকু বোঝা যায় কারণ তারা মাঝে মাঝে নড়ছে, জায়গা বদল করছে নিজেদের। আর একটু যেন এগিয়ে এসেছে। ঠিক গাছের নিচ থেকে সরে এসে কবরখানার পাঁচিলের ভাঙা অংশটার ধারে এসে দাঁড়িয়েছে।

ত্রিপাঠীজি হতভম্বভাবে চেঁচিয়ে উঠলেন "শালা হচ্ছেটা কী আজ? এত বাচ্চা আসছে কোথা থেকে? অ্যাই গিরিরাজ, তাড়িয়ে দাও ওদের! এই তো ইঁট, এই নাও। এটা ছুঁড়ে মারো।"

গিরিরাজ আস্তে করে ত্রিপাঠীজির বাহুতে হাত রাখল, "ফালতু বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে সময় নষ্ট করে লাভ নেই ত্রিপাঠীজি। বরং সীতার আগেকার বলা কথাগুলো একটু ভেবে দেখুন। যদি টাউন থেকে কেউ এসে খুন করে যায় পরপর, তাকে ধরব কীভাবে?"

"প্রভুজিকে খবর দেওয়া হোক", কেশব ভ্যাবাচ্যাকা গলায় বলল।

"প্রভুজি এখন মিনিস্ট্রি পেয়েছেন", খেঁকিয়ে উঠলেন ত্রিপাঠীজি, "চাইলেই নাগাল পাওয়া যাবে না। ওজন বুঝে কথা বলো কেশব। প্রভুজি আমাদের চাকর বাকর নন যে এসব ফালতু ঝুটঝামেলাতে ডাক দিলেই লোক-লশকর নিয়ে চলে আসবেন"।

সীতাপ্রসাদ উন্মাদের মত চেঁচিয়ে উঠল, "তোমরা কেউ বুঝছ না আমার কথা। রাজেশদের মেরেছে কোনো ইনসান নয়। এই পৃথিবীর কেউ নয় তারা।"

বাকি তিনজন ভূতগ্রস্তের মত সীতাপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। কারোর মুখে কথা যোগায় না কোনও। একটু বাদে তোতলাতে তোতলাতে কেশব বলে "মানে?"

সীতাপ্রসাদ বিকৃত স্বরে উত্তর দেয়, "মানে? এখনও জানো না মানেটা কী? শ্যাম পড়েছিল আলবিনার কবরের ওপর। তাহলে আমি থাকব হরিজনপুরে। ঠিক কি না?"

কেশব ঝাঁপিয়ে পড়ে সীতাপ্রসাদের গলা টিপে ধরে। "সত্যি করে বল, কে মেরেছে রাজেশদের? আজ জ্যান্তই পুঁতে দেব তোকে হারামি! কে খুন করেছে, বল শালা!"

গিরিরাজ কেশবকে ছাড়িয়ে আনে। সীতাপ্রসাদের চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এসেছিল, মুখ লাল। কাশতে থাকে খক খক করে। ত্রিপাঠীজি উত্তেজনার বশে হাঁপাচ্ছেন। কেশব চিৎকার করে ওঠে "জ্বালিয়ে দেব তোকে আজ ! বল আগে কে মেরেছে।"

সীতাপ্রসাদ কাশতে কাশতে লালা ঝরাতে থাকে। কুকুরের মত জিভ বার করে নিঃশ্বাস নেয়। সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে তার। চেরা গলাতে উত্তর দেয় "শ্যামকে মেরেছে আলবিনা । তোমাকে কে মারবে?"

ত্রিপাঠীজি হিংস্র চিৎকার করে ওঠেন "সব মিথ্যে! সব! আলবিনাকে ওরা পরের দিন নিজের হাতে আবার মাটি দিয়েছিল"।

সীতাপ্রসাদ পাগলের মত হেসে ওঠে। "গুরুজি, এই দেখুন ডানপাশের কবরটা। সায়িদা আছে এখানে। আপনি ওর বডিটা রেপ করেছিলেন না? সায়িদা আসবে গুরুজি। দেখুন"।

ত্রিপাঠীজি কেশবের হাত থেকে শাবল ছিনিয়ে নিলেন। "সায়িদাকেও পরের দিন আবার কবর দিয়েছিল ওরা। এই নয় মাসে ও কংকাল হয়ে গেছে"।

সীতাপ্রসাদ খি খি করে হাসে। কেশব ফিসফিস করে বলে ওঠে "কবরটা খুঁড়ুন গুরুজি"।

ত্রিপাঠীজি উন্মাদের মত শাবল চালালেন। একটা বড় খণ্ড মাটি ধসে পড়ল। কেশব আর গিরিরাজ পেছনে নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে। আবার শাবলের ঘা। ঝুরঝুর করে মাটি ভাংছে। পরের পর আঘাতে ছত্রখান হয়ে গেল জায়গাটুকু। ঘা মারতে মারতে ত্রিপাঠীজি এক সময় শাবলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে দুই হাত দিয়ে মাটি সরাতে লাগলেন।

আর তারপর হঠাৎ স্তম্ভিত বিস্ময়ে আর্ত চিৎকার দিয়ে ধপ করে বসে পড়লেন ।

টর্চের আলো ফেলে গিরিরাজ ও কেশব দেখল সায়িদার মৃতদেহ অবিকৃত শোয়ানো আছে। ঠিক যেন ঘুমোচ্ছে। পরনের শাড়িটা ছেঁড়াখোঁড়া, যে অবস্থায় মাটি দেওয়া হয়েছিল সেরকমই। শুধু সায়িদার পেটটা ডিমভরা কই মাছের মত ফুলে আছে।

কেশব ভাঙা গলায় বলল "এসবের মানে কী?"

হাহাকার করে এক ঝলক বাতাস বয়ে গেল । গিরিরাজ রুদ্ধ ভয়ে চাপা স্বরে বলল "সায়িদা পোয়াতি হল কবে?"

সীতাপ্রসাদ আচমকা আঙুল তুলল পেছনের দিকে "ওরা সবাই আসছে"।

তারা পেছন ফিরে দেখল, আর চার পাঁচজন নয়, দলে দলে শিশু এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। আর তখনই মেঘ কেটে গিয়ে স্পষ্টভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল চাঁদ। সেই আলোতে দেখা গেল, যাদের তিন চার বছরের শিশু ভাবা হয়েছিল তারা আসলে নবজাতক। সম্পূর্ণ উলঙ্গ, সরু কাঠির মত হাত পা, বেঢপ পেট, গায়ের চামড়া হলুদ রঙের, কিন্তু চোখের মণিটা নেই। সকলের চোখ সাদা, ফ্যাটফ্যাটে জলের মতন।

আতংকে চারজন চিৎকার করে উঠেছিল। অন্যদের কী অবস্থা সেটা দেখবার সময় গিরিরাজের ছিল না। সে পালানোর জন্যে পেছনে ঘুরতে গেল। কিন্তু একটা বাচ্চা হঠাৎ "আব্বা" বলে খলখল হেসে লাফিয়ে পড়ল তার বুকের ওপর, এবং গিরিরাজের গলার ওপর বসিয়ে দিল সদ্য গজানো কচি কিন্তু হিংস্র শ্বাপদের দাঁত।

প্রথম রক্তস্রোত ফিনকি দিয়ে বেরনোর সময়ে গিরিরাজ আবছাভাবে বাচ্চাটার মুখ দেখতে পেয়েছিল । রাবেয়ার মুখ অবিকল কেটে বসানো, যার মৃতদেহকে সে একবছর আগে এখানেই ত্রিশূলের ডগায় গেঁথে ফেলেছিল।

মণীশ রায়ের ভূত জোৎস্নায় ছাদের রেলিংয়ে শুয়ে আকাশের দিকে চেয়ে খুশিতে পা নাচায়...

সুষুপ্ত পাঠক

সিনেমায় পুরোনো আমলের হিন্দু বাড়ি যেরকম দেখায় সেরকম একটা দোতালা বাড়ি আমাদের। সত্যি সত্যি একবার একটা সিনেমার শুটিং হয়েছিল আমাদের বাড়িতে। আমি তখন খুব ছোট। ক্লাশ ফোরে পড়ি। সেই সিনেমাটাও ছিল একটা হিন্দু জমিদারকে নিয়ে। তখনো অবশ্য আমি জানতাম না, আমাদের বাড়িটা আসলেই একটা "হিন্দু বাড়ি"! আরো পরে জেনেছি, এই বাড়িতেই আমার মা এক সময় ঝিয়ের কাজ করতেন। আমার বাবা এ বাড়ির কেয়ারটেকারের ছিলেন। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের বছর আমাদের কপাল খুলে যায়। আমার বাবার মনিব শ্রী মণীশ কুমার রায় তার পুরো পরিবারকে ইন্ডিয়াতে পাঠিয়ে বিশ্বস্ত কেয়ারটেকার গোলাম রহমানকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি পাহাড়ায় থেকে যান। গোলাম রহমান আর তার সদ্য বিবাহিত স্ত্রী নিচতলার একটা ঘরে থাকত। সেই যুদ্ধের অনিশ্চিত দিনগুলোতে একদিন মণীশ বাবু হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যান। গোলাম রহমান কোত্থেকে শুনলেন কর্তাবাবু "রায়টে প্রাণ ত্যাগ করেছেন"! সেই ভরা পাকিস্তান আমলে গোলাম রহমানের তারপর থেকে দিন ফিরতে শুরু করে। ছয় বছর পর ফের যখন দুই পাকিস্তানে যুদ্ধ লেগে গেলো তখনি আসলে গোলাম রহমানের প্রকৃত দিন বদলের শুরু। আমার বাবা রাজাকার বা শান্তি কমিটির লোক ছিলেন না। যুদ্ধের বছর তিনি ব্যবসা করেছেন। হিন্দু বাড়িঘর দখল করেছেন।... না, এটাও ভুল বলা হলো, বাবা দখলদারদের কাছ থেকে জলের দামে সেটা কিনে নিয়েছেন শুধু। এসব করতে যেয়ে রাজাকার থেকে শুরু করে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার সবাইকেই বখরা দিয়েছেন। তিনি নিজে কোনদিন কোন বাড়ি-ঘর লুট করতে যাননি। কেউ এসে প্রস্তাব দিয়েছে একটা হিন্দু বাড়ি আছে, বাবা গিয়ে তার দখল নিয়েছেন। এর জন্য তাকে কত জায়গায় দেনদরবার করতে হয়েছে। একবার মুক্তিযোদ্ধাদের একটা দল বাবাকে ধরে পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল। কয়েক বস্তা চাল-ডাল আর আনাজপাতির বিনিময়ে বাবাকে ছেড়ে দেয়। বাবা হয়ত বুঝাতে পেরেছিলেন তিনি পাকিস্তানের পক্ষে না। কপালটা এত ভাল যে নভেম্বর মাসের দিকে বাবাকে রাজাকার ক্যাম্পেও ধরে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানেও ভাল কিছু বখরা দিয়ে ছাড়া পেয়েছিলেন। আজ যে বাবাকে স্বাধীনতা দিবসের দিনে আমাদের পাড়ার ক্লাবের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে নিয়ে যায় এটা রাজাকার ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যাবার জন্যই। যদি রাজাকাররা যুদ্ধে জিতে যেতো তাহলেও বাবাকে তাদের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে ডেকে নিয়ে যেতো মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যাবার ঘটনায়। বাবার কপালটা তাই ফাটাফাটি রকমের ভাল। যুদ্ধে যারাই জিতুক বাবা ঠিক তাদের সঙ্গে মিশে যেতে পারতো...।

বাবা-মার সঙ্গমের ফলে যে সন্তান জন্ম নেয়- এই সত্য জেনে বালক বয়েসে যেরকম ধাক্কা খেয়েছিলাম, বাবা-মার প্রতি ঘৃণা জন্মেছিল, ঠিক এক বর্ষার দুপুরে স্বপন আমার মনে প্রথম আমাদের সম্পর্কে একটা ঘৃণা জন্মে দিয়েছিল। আমার পিঠাপিঠি স্বপন, চিলেকোঠায় ওর গবেষণাগার। বাড়ির পুরোনো নষ্ট রেডিও, টর্চ লাইট, ছোট্ট খেলনা মটর, এগুলো দিয়ে স্বপন যন্ত্র বানানোর গবেষণা করতো। ছুটিরদিন দুপুরবেলা স্বপন চিলেকোঠায় চলে যেতো। আমি ছিলাম ওর এসিট্যান্ট। মেঘলা দিন, বাইরে টিপটিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে। উঠোনো জল জমেছে। স্বপন একটা লঞ্চ বানাবে, একটা ছোট মটরের মাথায় পাখা লাগানো থাকবে। পেনসিল ব্যাটারীতে জুড়ে দিলেই মটরের পিনে লাগানো টিনের পাখাটা ভন ভন করে ঘুরতে থাকে। এখন একটা পাতলা টিনের নৌকার মত কিছু বানাতে পারলে, আর মটরটা সেটার পিছনে কায়দা মত বসিয়ে দিতে পারলেই তো হয়ে গেলো ইঞ্জিনের নৌকা! পুরোনো একটা টাঙ্ক পড়েছিল চিলেকোঠায়। ভেতরে রাজ্যের পুরোনো বাতিল জিনিস। আমরা দুজন ডালাটা খুলে জিনিসপত্র ঘাটছি। স্বপন তখন হঠাৎ থেমে গিয়ে আমাকে ওর হাতে ধরা একটা পিতলের প্রদীপ দেখিয়ে বলল, এটা কি বলতো? স্বপনের মুখে মিটিমিটি হাসি। টাঙ্কের ভেতর থেকে স্বপন ছোট ছোট পেতলের খেলনা থালা-বাটি বের করে আনলো।

-এ দিয়ে তো মেয়েরা খেলে! বললাম আমি। এগুলো এখানে আসলো কোত্থেকে?

স্বপন বলল, এগুলো খেলনা না গাধা! এগুলো হিন্দুদের পূজায় লাগে।

-হিন্দুদের জিনিস আমাদের বাড়িতে কেন? ভুরু কুঁচকে গেলো আমার।

স্বপন আমার চেয়ে মাত্র এক বছরের বড় হলেও ও আমার চেয়ে অনেক বেশি জানে। ওর পেটে পেটে অনেক কথা। আমরা দুজনেই ক্লাশ এইটে পড়ি, অথচ ও এখনি দিব্যি সিগারেট ধরিয়ে টানতে টানতে স্কুলে যায়! কি অবলীলায় পানের দোকানে গিয়ে সিগারেট চায়! আমি কুঁকড়ে দূরে সরে যাই। আমার খালি ভয় বাড়ির কেউ যদি দেখে ফেলে? স্বপনের এসবে কোন ভ্রুক্ষেপই নেই। আমাদের মা নেই। বড় ভাই কলেজে উঠে নিজের জগত নিয়ে ব্যস্ত। আমাদের শাসন-টাসনে মন নেই। বাবার চোখ এড়াতে পারলেই হলো। ডানপিটে বলে বাবার কাছে প্রচুর মারও খায় স্বপন। বাবা একদিন বেল্ট দিয়ে এমন মারটা মারলো ওকে! কিন্তু দিনকে দিন স্বপন যেন কাউকেই আর পরোয়া করতে চায় না। আমাকে এখন পিতলের একটা ঘন্টা দেখিয়ে বলল, এটা আমাদের বাড়ি তোকে কে বলল? বলেই স্বপন বজ্জাতের মত হাসলো।

-আমাদের না? অবিশ্বাস নিয়ে তাকালাম ওর দিকে। স্বপনকে ঘৃণা হচ্ছিল আমার। আর খুব ভয় হচ্ছিল...

-তুই মণীশ রায়ের নাম শুনেছিস?

-না।

-এটা মণীশ রায়ের বাড়ি। বাবা ওদের দারোয়ান ছিল।

-তোকে এসব কে বলেছে?

-আহ-হা, আমি সব জানি!

হ্যা, এখন আমরা সব জানি। বাচ্চাদের একটা বয়স পর্যন্ত তাদের কাছ থেকে সব কিছু লুকিয়ে রাখা হয়। মনিশ রায়ও সেরকম একটা নাম ছিল। তবে পারিবারিকভাবে মণীশ ায়ের বিষয়টার একটা ব্যাখ্যা আমাদের আছে। বাবা মণীশ রায়ের কাছ থেকে এই বাড়িটা কিনে নিয়েছিলেন...। কিন্তু আমাদের প্রতিবেশী, এলাকাবাসী নিন্দুকরা আড়ালে বলেন, একটা হিন্দু বাড়ি দখল করেছিল বাবা...।

স্বপন মারা যাবার একমাস আগে অনেক চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। আর কি রকম পাগলের মত কথা বলত। একদিন আমাকে বলল- মণীশ জ্যাঠা এই বাড়িতেই আছেন-জানিস!

-এই বাড়িতে?

-হুঁ!

-কে বলল?

-রাতের বেলা ছাদে মণীশ জ্যাঠা খড়ম পায়ে পায়চারী করে! আমি নিজের কানে শুনেছি!

-ওটা যে মণীশ জ্যাঠা তোমাকে কে বলল?

-আমি ছাদে উঠে জ্যাঠাকে নিজের চোখে দেখেছি!

ভয়ে আমি ঢোগ গিললাম!

-তুমি মণীশ জ্যাঠার ভূত দেখেছো!

-কিন্তু মণীশ জ্যাঠার ভূতটা কেন এই বাড়ির মধ্যে ঘুরঘুর করবে বলতো? উনি তো রায়টের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। মুসলমানরা ওনাকে খুন করেছিল।

-তাহলে এই বাড়িতে কেন?

-সেটাই তো! আমাকে এটা বের করতেই হবে মণীশ জ্যাঠা ভূত হয়ে কেন এই বাড়ির মায়া ছাড়তে পারছেন না...

স্বপন বলার পর থেকে আমিও কোন কোন রাতে ছাদের উপর খড়মের শব্দ শুনতে পেতে শুরু করে দিলাম। যেন কেউ ধীর-শান্তভাবে ছাদের এ মাথা থেকে ও মাথা পায়চারি করছে। আমি ভয়ে কাঁথায় মাথা ঢেকে কুঁকড়ে যাই। স্বপন ওর ঘর থেকে দৌড়ে এসে বলে, ছাদে যাবি?

-নাহ্!

-চল, আড়াল থেকে মণীশ জ্যাঠাকে দেখবি।

-নাহ্!

আমরা তখন এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছি। আমাদের ছাদ থেকে বুড়িগঙ্গা দেখা যায়। অনেককাল আগে ছাদের মধ্যে যে তুলসি মঞ্চটা ছিল, এখন সেটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে আমাদের বসবার জায়গা হয়ে গেছে। স্বপন একটা ফটোগ্রাফ দেখালো আমাকে। হলদেটে সাদাকালো একটা ছবি। ধুতি-পাঞ্জাবি পরনে একজন বয়স্ক মানুষ ক্যামেরার দিকে অস্বস্তি নিয়ে চেয়ে আছেন। স্বপন বলল, মণীশ জ্যাঠা।

-তুমি তাকে জ্যাঠা বলো কেন?

-বাবা উনাকে দাদা বলতো যে!

-স্বপন তুমি এসব নিয়ে মাথা ঘামানো ছেড়ে দাও। কি লাভ?

-মাথার মধ্যে একটা রহস্য ঢুকে গেছেরে...। এর কূল-

কিনারা না করে আমি শান্তি পাবো না...।

-কিসের রহস্য?

-তোকে এখন কিছু বলবো না। সবটা আগে বের করি, তারপর...

স্বপন মারা যাবার এক সাপ্তাহ আগে চাপা একটা উত্তেজন নিয়ে আমাকে বলল, আমাদের একতলার কোণার ঘরটা সব সময় তালা মারা থাকে নারে?

-হ্যাঁ।

-বাবা ওঘরে একা একা দরজা দিয়ে বসে থাকে কেন?

-আমি কি জানি?

-বাবা যে পীর সাহেরের মুরিদ তিনি সেই ঘরে একদিন জিকির-টিকির করলেন খুব- মনে আছে?

-হুঁ।

-আমার মনে হয় বাবাও এ বাড়িতে মণীশ জ্যাঠাকে দেখতে পায়, শুধু আমরাই না।

মণীশ জ্যাঠাকে যে আমিও দেখতে শুরু করেছি সেটা স্বপন জানে। আমাদের বাড়ির পিছনের বুনো ঝোপঝাড়ে এক মেঘলা দিনের নীলচে সন্ধ্যায় প্রথম মণীশ জ্যাঠাকে দেখতে পাই আমি। যেন বুড়ো মানুষটা অনিচ্ছাকৃত আমার সামনে পড়ে গেছেন-এমনই একটা ভাব, বিব্রত একটা শারীরিক ভঙ্গি করে ঝোপের আড়ালে চলে গেলেন। আমি ভয়ে জমে গিয়েছিলাম। স্বপনকে ঘটনাটা বলতেই স্বপন বলল, জ্যাঠাকে ভয় পাস কেন, উনি কোন ক্ষতি করবেন না। আমি তো উনার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছি!

-তোমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে! একটা মৃত মানুষের সঙ্গে কথা বলবে?

-উনারকে জিজ্ঞেস করবো, বাবা তাকে খুন করে একতলার কোণার ঘরের মেঝেতে পুতে রাখার সময় আর কে কে সেখানে ছিল! আমার মা কি এসব ঘটনা জানতো? এ ঘটনার দ্বিতীয় সাক্ষি কে?

-বাবা মণীশ জ্যাঠাকে ঘরের মধ্যে খুন করে পুঁতে রেখেছে!

-হ্যাঁ, এই জন্যই মণীশ জ্যাঠা এ বাড়ির মায়া ছাড়তে পারছেন না।

-তোমাকে এসব কে বলল?

-আমি শুনেছি।

-কার কাছে?

-বাবা একতলার ঘরে দরজা বন্ধ করে কার সঙ্গে যেন কথা বলছিল। আমি কান পেতে শুনলাম...

-কার সাথে কথা বলছিল?

-মণীশ জ্যাঠার সাথে...

-তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে...

-বাবা গালাগালি করছিল...

-আমি বিশ্বাস করি না...

-বাবা দাঁতে দাঁত চেপে বলছিল, তোকে আবার পুঁতে রাখবো...কেন এই ঘর থেকে বের হলি... কি চাস তুই...

স্বপন আত্মহত্যা করল যেদিন সেদিন বাবা একটুও চোখের পানি ফেলল না। কিন্তু সেদিন থেকেই একদম বুড়ো হয়ে গেলো! সব কিছু থেকে নিজেকে একদম গুটিয়ে নিলেন। কারোর সঙ্গে প্রয়োজন ছাড়া কথা বলাই বন্ধ করে দিলো। স্বপন যে কিছু একটা করতে যাচ্ছে বুঝতে পারছিলাম। ওর চোখ দুটো অস্থিরভাবে সব সময় ঘুরতে দেখতাম। ওর চাউনির মধ্যে একটা বুনো-পাগলাটে দৃষ্টি এসে গিয়েছিল। কিন্তু কখনো আত্মহত্যা করতে পারে ভাবিনি। স্বপন এভাবে চলে যাবার পর আমার জীবনে বড় একটা পরিবর্তন আসে। আমি একদম নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ি। স্বপন আমার ভাই নয়, যেন বন্ধু ছিল। ওর এই অস্বাভাবিক মৃত্যু, এর সঙ্গে আমাদের পারিবারিক অতীতের একটা যোগসূত্র আছে- যা শুধু আমিই জানি- এসব আমাকে অন্যরকম এক বাস্তবতায় নিয়ে ফেলে। মণীশ জ্যাঠাকে সেদিন থেকে আমিও একদম ভয় পাই না। তার খড়মের শব্দ অনেক নির্ঘুম রাতে শুনতে শুনতে রাত ভোর করে দেই। বাড়ির পিছনের ঝোপছাড়ে আজো মণীশ জ্যাঠার বিব্রত চাউনি, মিলিয়ে যাওয়া এখন আর কোন গা ছমছমে বিষয় নয়। বরং সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে প্রায় শুনি বাবা চেঁচাচ্ছেন, শুয়োরের বাচ্চা! একদম একশ হাত মাটির নিচে পুঁতে রাখবো! আর বের হতে পারবি না!...

বাবা একদিন মরে পরে রইলেন চেয়ার মধ্যে। যে কাঠের চেয়ারটায় রোজ বসে থাকতেন বারান্দা, একদিন দেখা গেলো মাথাটা হেলে আছে চেয়ারের কাধে, মুখ দিয়ে ফেনা গড়াচ্ছে...। খুব বড় আয়োজন করে বাবার কুলখানি করলেন বড় ভাই। আমাদের ডালডা আর তেলের কারখানাটা

বড় ভাইই চালান। ভাবী আমাদের এখানে থাকতে চান না বলে উত্তরায় ফ্ল্যাট কিনে ভাই-ভাবী সেখানেই থাকেন। এই বাড়িতে এখন আমি একা। পুরো একটা বাড়িতে একা থাকতে আমার একটুও একা লাগে না। কেন লাগে না জানি না। স্বপন যে ঘরটাতে ফাঁস দিয়েছিল সেঘরটা তালা দেয়া থাকে। মাঝে মাঝে খুলে ভেতরে ঢুকি। চেষ্টা করি স্বপনের কোন অস্তিত্ব অনুভব করতে। আজ ২২ বছর স্বপন নেই! মণীশ জ্যাঠার যেমন বয়স আটকে আছে মহাকালের ফ্রেমে, স্বপনও সদ্য যৌবনের চেহারা নিয়ে এ্যালবামে আটকে আছে। কি অদ্ভূত, মণীশ জ্যাঠা এ বাড়ির মায়া আজো কাটাতে পারলেন না কিন্তু স্বপনকে কতদিন প্রত্যাশা করেছি শুধু একবার দেখবো...। কিন্তু স্বপন যে দূর কোন দেশের অধিবাসী। স্বপন চলে গিয়ে আর ফিরে আসেনি...।

এক ছুটিরদিন বিকেলে বড় ভাই এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। ওর লাল ট্যাক্সিটা গেইটের বাইরে হর্ন দিচ্ছিল। কাজের লোকটা গেইট খুলে দিলো। আমি দোতালার বারান্দায় রেলিংয়ে ভর দিয়ে ওকে আসতে দেখলাম। বারান্দাতে দুজন বসলাম। ও আমার শরীর-স্বাস্থ্যের খবর নিলো। গেল মাসেই হাসপাতাল থেকে ফিরে এসেছি ও সেটা জানে। এটা-সেটা আবল-তাবল নিয়ে আমার কথা বললাম। চা খেলাম। তারপর দুজনেই হাই তুলতে লাগলাম। চলে যাবার আগে হঠাৎ মনে পড়ে গেছে এরকম একটা ভাব করে বড় ভাই বলল, বুঝলি, বাড়িটা একটা কোম্পানিকে দিয়ে দিলাম। ওরা এপার্টমেন্ট করবে এটাকে...।

-কোন বাড়িটা?

-এটাকে। ওদের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে আমরা দুটো করে ফ্ল্যাট পাবো আর...

-এই বাড়ি ভেঙ্গে ফেলবে?

-হ্যা, ভেঙ্গে একদম নতুন আধুনিক ফ্ল্যাটবাড়ি হবে!

-না...

-কি, না?

-এ বাড়ি ভাঙ্গা যাবে না...

-বুড়োদের মত কথা বলছিস দেখি...

-যেমন আছে তেমন থাকতে দাও।

-তুই বললেই হলো!...জানিস কত লাভ হবে আমাদের?

-পুরো বাড়িটাই খুড়ে ফেলবে ওরা?

-তোর কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!

আমার মাথার মধ্যে কেউ যেন খড়ম পায়ে অস্থির পায়চারী করছে। মাথার দু'পাশটা টিপে ধরলাম।

-তোর শরীর খারাপ লাগছে? ডাক্তার ডাকবো?

-না, আমি ঠিক আছি। তুমি যাও।

-তুই একটা ফ্ল্যাট পাবি। আর...

-আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি যাও।

-আসল কথা বলতেই ভুলে গিয়েছিলাম...

-কিছু বলার লাগবে না। তুমি যা বলবে তাই হবে সে তো আমি জানিই।

-আরে তুই আমাকে দোষ দিচ্ছি নাকি? কি ভাবছিস, ঠকাচ্ছি তোকে? একটা ফ্ল্যাট পাবি আর নগদ...

-প্লিজ ভাইয়া তুমি যাও।

-ঠিক আছে যাচ্ছি, শোন, সামনের মাসে ওরা কাজে হাত দিবে। ততদিন তুই উত্তরায় আমার কাছে গিয়ে থাকবি। যদি যেতে না চাস, তাহলে কাছেই কোথাও বাসা ভাড়া করে দিবো। যতদিন ফ্ল্যাট না হচ্ছে ততদিন সেখানেই থাকবি...।

লোভীটা ভাবছে শুধু এইসব...। আমি জানি আমার কোন রকম আপত্তি আর টিকবে না। আমি আধপাগলা, নেশাটেশা করি...। সবাই ওর কথাই মানবে।

বড় ভাই চলে গেলো। বিকেল পড়ে আসছে। চারদিক ফের নিঃস্তব্ধ। বারান্দায় বসে বসে ভাবছি, এভাবে এই বাড়িতে এই হয়ত শেষবার...।

যে রাতে আমার ঘুম হয় না সেসব রাতে মণীশ জ্যাঠার খড়মের শব্দ ছাদে শোনা যায়। কিন্তু আজ কি হলো? মণীশ জ্যাঠার কোন সাড়াশব্দ নেই! বিছানায় শুয়ে শুয়ে পিঠ ব্যথা হয়ে গেলো। পায়ে সেন্ডেল গলিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠলাম। সাদা জোৎস্নায় পৃথিবী ভেসে যাচ্ছে। এখন আর ছাদ থেকে বুড়িগঙ্গা দেখা যায় না। কিন্তু ঐদিকের ছাদের রেলিংয়ে বিপদজনকভাবে মণীশ জ্যাঠা শুয়ে আকাশের দিকে চেয়ে আছেন। ওর পা নাচছে। বুড়ো আজ খুব খুশি।...

আমি বাংলাদেশে কুলদা রায়। আর ভারতে কলিমুদ্দিন শেখ।

কুলদা রায়

মোদীকে আমি চিনি না। চেনার দরকারও নাই। পৃথিবীতে সকল মানুষকে চেনা যায় না। আর আমি বরিশালের মনু। যেখানে বরিশালের সবারেই চিনি না—সেখানে ভারত নামের একটা রাষ্ট্রের গুজরাতের নরেন্দ্র মোদিকে চিনতে যাব কোন দূঃখে।

তবে আমার পাড়ার নরেন মুদিকে চিনতাম। বেচারা নরেন মুদি। তার মুদি খানায় বিস্তর কেনাবেচা হত। হিন্দুদের চেয়ে মুসলমান খদ্দের ছিল বেশি। তারা বিশ্বাস করেন নরেন মোদি নামের এই হিন্দু লোকটা মালে ভেজাল দেবে না। আর দাম লাগাম ছাড়া নেবে না। আমাদের পাড়ার সৈয়াদুল হক চাচা এই ব্যাপারে বড় করে ঘোষণা দিয়েছিলেন, নরেন লোকটা হিন্দু হৈলেও খারাপ না।

নরেন মুদির মাইজা ঠাকুরদা সাত চল্লিশে ইন্ডিয়া যান নাই। তাদের প্রতিবেশি দুলাল চন্দ্র ভট্টাচার্য চলে গিয়েছিলেন। তবে ১৯৫০ সালে খবর এসেছিল—বরিশালের ফজলুল হকে সাহেবের ভাতিজা না ভাগ্নেকে কোলকাতায় ছুরি মেরে মেরে ফেলা হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকাসহ পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় মেরে ফেলা হয় ৯ দিনে দশ হাজার হিন্দুকে। বরিশালে মেরে ফেলা হয়েছিল ২৫০০ হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষকে। পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল বাড়িঘর। লুটপাট করা হয়েছিল সহায়-সম্পদ। ধর্ষণের শিকার হয়েছিল অসংখ্য নারী। দখল করা হয়েছিল অনেকের জমিজমা। তখন নরেন মুদির মূলাদীস্থ মামাবাড়ির লোকজনের রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল নদী। মাধব পাশার পিসে মশাই ছিলেন জমিদার বাড়ির সরকার বাবুর ব্যাগ-টানা লোক। সে সময় মাধব পাশায় একদিনে যে ২০০ মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল—তার মধ্যে নরেণ মুদির ব্যাগ-টানা পিসে মশাই ছিলেন। যে সরকার বাবুর ব্যাগ টানতে টানতে তিনি নিহত হলেন—সেই সরকার বাবুর সঙ্গে জীবৎকালে তার পংক্তি-ভোজনের সুযোগ ক ঘটেনি। নমোশুদ্রের সঙ্গে এক পাতে খেলে ধর্ম থাকে! পিসে মশাইয়ের যে সামান্য জমি-জমা ছিল—সেটা ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় শত্রু সম্পত্তি।

নরেন মুদীর মাসির বাড়ি মোড়েলগঞ্জে। পানগুছি নদীর পশ্চিম পাড়ে সন্যাসী গ্রামে। ১৯৬৪ সালে কাশ্মিরে হজরত বাল মসজিদ থেকে মহানবী হযরত মুহাম্মদের চুল চুরি গেছে বলে খবর হল। মেসোমশাই গিয়েছিলেন পিরোজপুরের কদম তলার হাটে শুপারী বেঁচতে। হাঁটের মধ্যেই তাকে ধরা হল। গলায় কিরিচের পোচ দিতে দিতে জুজখোলার রহিম মাওলানা চেঁচিয়ে বললেন, নমুর পো, কাশ্মীর থেইকা আমাগো নবীকরিমের চুল চুরি করছোস। তোরে আজ রেহাই নাই।

পিসেমশাই মরার আগে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কাশ্মীরডা আবার কোন জাগায়! এখবর পাওয়ার পরে মাসি তার ছেলেপিলে নিয়ে বর্ডার পার হয়ে গেলেন। মেসো মশায়ের বন্ধু আব্দুল করিম তাদেরকে বর্ডার পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলেন। হাত ধরে বলেছিলেন, বৌদি গো, আমরা সবাই রহিম মাওলানা না। দোষ নিয়েন না।

দোষ নেওয়ার সুযোগ ছিল না। মাসি ততক্ষণে শেয়ালদা স্টেশনে পৌছে গেছেন। সেখান থেকে দণ্ডকারণ্যে। এরপর খবর নাই। পৃথিবী থেকে ছাপা। এটা নিয়ে নরেণ মোদি একদিন দূঃখ করে বলেছিলেন, বুজলা বাবা, একাত্তরে বাবারে হারাইছি। দেশ ছাড়ছি। আবার স্বাধীন হইলে ফির্যা আইছি। ফির্যা না আইসা করব কী? পৃথিবীর কোনো জায়গায়ই আমাগো বাঁচন নাই।

এই নরেন মুদিকে চিনি। খাতা-পত্রে লেখা নরেন্দ্র ওরফে নরেন মুদী। ইলেকশন আসলে নরেন মুদির পরিবার পোটলা পুটলি বেঁধে রাখতেন। আর গলায় সরিষার তেল। জানেন—আওয়ামী লীগ আর বিএনপি বা জাতীয় পার্টিই আর জামায়াত- জিতুক বা হারুক, তাতে কিছু যায় আসে না। নরেন মুদির উপর কোপ পড়বেই। চান্স পাইলে পলান মারবেন। আর পলাতে না পারলে গালটা বাড়িয়ে দেবেন। কী আর করা! মানব জীবন ধারণ করলে তার পেরসানীও সহ্য করণ ছাড়া উপায় নাই।

২.

২০০২ সালে ভারতের গোধরা নামে একটি জায়গায় ট্রেনে আগুন লেগেছে। ৫৮ জন যাত্রী মারা গেছে। সেই যাত্রীরা অযোদ্ধায় গিয়েছিল তীর্থ করতে। তারা হিন্দু। রটানো হল—মুসলমানরা হিন্দুদেরকে মেরে ফেলেছে। ফলে সেখানে দাঙ্গা লেগে গেল। এরপর সাতদিন ধরে আহমেদাবাদে। এই দাঙ্গায় মারা গেলো ৭৯০ জন মুসলমান। আর হিন্দু ২৫৪ জন। মারাত্মকভাবে আহত হল ২৫০০ জন মানুষ। ২২৩ জনের কোনো খোঁজ নেই। আরেকটি সুত্রে জানা গেলো—গুজরাতের এই দাঙ্গায় ২০০০ মুসলমান মানুষকে মেরে ফেলা হয়েছিল। ধর্ষণ করা হয়েছিল অসংখ্য নারীকে। মাসুম শিশু ওরফে শিশু গোপালকে জ্যান্ত আগুনে ছুড়ে ফেলা হয়েছিল।

ঘটনাচক্রে সে সময়ে আমাদের নরেণ মুদি নেত্রকোণা গিয়েছিলেন। সেখান থেকে গৌরীপুর। আমাদের পাড়ার শফিদ্দিন খাঁর মরমর অবস্থা। তিনি এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি। তার চেয়েও বড় কথা তিনি সন্যাসী গ্রামের মেসো মশায়ের মন্ধু আব্দুল করিমের ফুফা লাগে। শেষ অবস্থায় ডাক্তার বললেন, আপনার কী খেতে ইচ্ছে করে? খাঁ সাহেবের কথা বলার বিশেষ অবস্থা ছিল না। তবুও কষ্টে—সৃষ্টে বললেন, তিনি মহাশৈল মাছের কথা শুনেছিলেন বাল্যকালে এলাকার বিশিষ্ট কবিরাজ রসরঞ্জন মিত্তিরের কাছে। এই মাছ খেলে নাকি আশা পূর্ণ হয়।

মহাশৈল মাছ পাওয়া যায় গৌরীপুরে। শঙ্খ নদীতে মাঝে মাঝে আসে গারো পাহাড় থেকে নেমে। শুনে নরেণ মুদি রওনা হয়েছেন মহাশৈল আনতে। খাঁ সাহেবের আখেরী হাউস পূর্ণ করতে সাধ জেগেছে। মাছটি তার একাত্তরে শহীদ বাবাও খেতে ইচ্ছে করতেন। এর মধ্যে গুজরাতে কী হল তার কিছুই জানেন না নরেন মুদি। অনেক কষ্টে মহাশৈল মাছ পেলেন। ঢাকায় আসতে আসতে দেখলেন শাখারী পট্টিতে দোকান-পাটে লুটপাঠ চলছে। বেশ কয়েকজন তাকে মাছ হাতে আসতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, নাম কী?

তিনি বললেন, নরেন মোদী।

আর যায় কোথায়। তারা রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে চেপে ধরল। কে একজন চেঁচিয়ে বলল, ওরে ইলিয়াস, গুজরাতের দাঙ্গার নেতা নরেন্দ্র মোদীকে পাওয়া গেছে। সেইদিন তারা নরেন্দ্র মোদীকে খুঁজে পেলেও আমরা বরিশালের লোকজন নরেণ মুদীকে আর খুঁজে পাইনি। তিনি নাই হয়ে গেছেন।

খাঁ সাহেব মহাশৈল মাছ খেতে পারেননি। তবে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে গলার আওয়াজ একবার ফিরে পেয়েছিলেন। চেঁচিয়ে বলেছিলেন, কন তো ডাক্তার, এই গুজরাতের নরেণ মোদীর লগে পুরাণ ঢাকায় ইলিয়াস আলীর ফারাকটা কোথায়?

৩.

আমাদের নরেন মুদিকে যে ইলিয়াস আলী নাই করে দিল, আর যে নরেন্দ্র মোদী গুজরাতের ফতিমার দুলহাকে খুন করতে বুলন্দ আওয়াজ দিল-এরা দুজনেই কিন্তু দুটো ধর্মের লোক। দুজনই তারা তাদের ধর্মে নিষ্ঠ। শুধু নিষ্ঠ হলে বিপদ ছিল না। কিন্তু বিপদ হতে শুরু করল যখন তাদের ধর্মকেই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে মনে করল। মনে করার মধ্যেও ঝামেলা কম। শুধু এই শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণার মধ্যে দিয়ে অন্য ধর্মকে শত্রু ঘোষণা করল, অন্য ধর্মের অস্তিত্বকে নিজেদের ধর্মের জন্য বিপজ্জনক বলে ঘোষণা করল। নিজের ধর্ম রক্ষার জন্য অন্য ধর্মের মানুষজনদের উপর ঝাপিয়ে পড়ল। হত্যা করল। ধর্ষণ করল। সহায় সম্পত্তি কেড়ে নিল। দেশ ছাড়া করল। এটাই বিপদের জায়গা। এতোকাল যাদের মধ্যে ধর্ম এই অন্ধত্ব ঢুকিয়ে দিয়েছে—তারাই মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধী হয়ে দাড়িয়েছে। ধর্ম মানুষের লজিক কেড়ে নেয়। বিচার-বোধ হারা করে। হিংসা আর প্রতিহিংসার বীজ মাথার ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়। এই ধর্ম-অন্ধ নিয়ে আমরা কী করবো?

মনে করুন আমার এক পিসে মশাই। বরিশালের মঠবাড়িয়ার এক গ্রামে বাড়ি। মানবেন্দ্রনাথের গান আর দিলীপকুমারের অভিনয়ের পাগল। তার দিনদুনিয়াতে আর কিছু ছিল না। একাত্তর সালে তাকে মুসলমান হতে হয়েছিল। নাম হয়েছিল শাহজাহান। আর আমার পিসিমা মমতাজ। পিসাতো ভাইগুলোর নাম দারাশুকো, সুজা, আলমগীর। বোনটির নাম জাহানারা। রেগুলার মসজিদে যেতে হত। তাদের পালের গরু জবাই করেও খেতে হয়েছে। মুখে রাখতে হয়েছে দাড়ি। কপালে দাগ পড়ে গিয়েছিল। একাত্তরের পরে আমাদের বাড়ি এসে সেই দাড়ি কেটেছিলেন। আর হাহাকার করছিলেন। সেদিনই ঢোল-করতাল সহযোগে হিন্দু হয়ে গিয়েছিলেন। তাতে তার সমস্যা হয়নি।

কিন্তু সমস্যা হয়েছিল—এর পরে তিনি অতিরিক্ত হিন্দু হয়ে গিয়েছিলেন। সব সময় মুসলমানদের পতন দেখতে চাইতেন। আমাদের মুসলমান বন্ধুদের দেখলে আড়ালে ডেকে নিয়ে আমাদেরকে চড় থাপ্পড়ও দিতেন। বলতেন, বিধর্মী গো লগে মেসো, সাহস তো কম না! তার মেয়েটি একটি মুসলমান ছেলেকে বিয়ে করলে তাকে ত্যাজ্য করেছিলেন। আছড়ে পিছড়ে কান্নাকাটি করেছিলেন—মেয়েটি তাদের অনন্ত নরকে ঠেলে দিল। অদ্ভুদ।

আরেকজন পিসেমশাই চিরকাল শিক্ষা-দীক্ষা ছিলেন। নিজের ছেলে-সন্তানদের কেউ কেউ দেশবিদেশের শিক্ষক, চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার। বিএনপি ক্ষমতায় এলে তার মন খারাপ হয়ে যায়। সেই পিসে-মশাই আমাকে বলেছিলেন, বোজলা বাবা, কৃষ্ণ ঠাকুর পুরুষোত্তম। বিএনপি-জামাতকে ধ্বংস করতে শ্রীকৃষ্ণ নতুন অবতার হয়ে আসবেন। চিন্তা করবা না। গীতায় এই কথা লেখসে। যিনি রাম--তিনিই কৃষ্ণ। তাদের একজন রামায়ণের পাতা থেকে ফাল দিয়ে পড়বেন। আরেকজন মহাভারতের পাতা থেকে সুদর্শন চক্র নিয়ে আসবেন। এসে বিধর্মীদের কচু কাটা কাটা করবেন।

নতুন অবতারের খবর নেওয়ার জন্য আমার গীতা পড়ার দরকার নাই। বাল ঠ্যাকরে নামের এক লোক যখন হুংকার দিলেন—বাবরি মসজিদ ভেঙ্গে ফেলা হলা হবে। সেখানে আবার রামের নামের মন্দির গড়া হবে, তখনই বুঝলাম শ্রীঅবতার এসে গেছেন। তার সাঙ্গোপাঙ্গোর নাম শিবসেনা। এরা মানুষ হলেও পাছায় ল্যাজ আছে। এদের নবীন নেতা নরেন্দ্র মোদী। তিনি রামরাজ্য চান। রামরাজ্যে অন্য ধর্মের লোকের কোনো চান্স নাই। সোজা পুশব্যাক করে দাও। আফগানিস্তান-পাকিস্তানের তালিবানরা এই কাজটি করছে। বাংলাদেশের জামায়াতে ইসলামিরা এই কাজটি করে চলেছে। তাদের রাজ্যে মুসলমান ছাড়া অন্য ধর্মের লোকদের থাকতে দেবে না। যারা থাকতে চাইবে তাদের সোজা গুলি করে মারবে। এরা একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।

এই সাম্প্রদায়িকতা একটা ছোঁয়াচে অসুখ। মানুষকে পাঠা করে তোলে। সে সব সময়ই অন্য মানুষকে শিং উচিয়ে তাড়া করে।

কেউ ধর্ম পালন করে শান্তি লাভ করুক—আমার আপত্তি নাই। কেউ ধর্ম পালন না করেও শান্তি লাভ করুক তাতেও আমার আপত্তি নাই। তাদের ব্যক্তি জীবনে ধর্মে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করার অধিকার দুই-ই আছে। আধুনিক রাষ্ট্র তাদের সেই অধিকারকে নিশ্চিত করে। কিন্তু মওদুদীর জামায়াতে ইসলামি বা মোদীর বিজেপি সেই অধিকারকে কেড়ে নেওয়ার দুঃসাহস দেখায়। এইখানেই জামায়াতে ইসলামির উত্থান দেখলে আমি কেঁপে উঠি। মোদীর বিজেপির উত্থানেও আতঙ্কিত হই। এরা কোনো রাষ্ট্র মানে না। নাগরিক বোঝে না। বোঝে-- জগতে মোদীর কাছে হিন্দু আছে। জামায়াতের কাছে মুসলমান আছে। আর কেউ থাকতে পারে না।

আমরা ঠেকে শিখেছি — যে কোনো ধর্ম বা মত যখন শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করে হুঙ্কার ছাড়ে, সেটা তখন আর মত থাকে না--হিংসার অস্ত্র হয়ে ওঠে। এই হিংসার কাছে আমি তো আসলে কেউ নই। আমি বাংলাদেশে কুলদা রায়। আর ভারতে কলিমুদ্দিন শেখ।